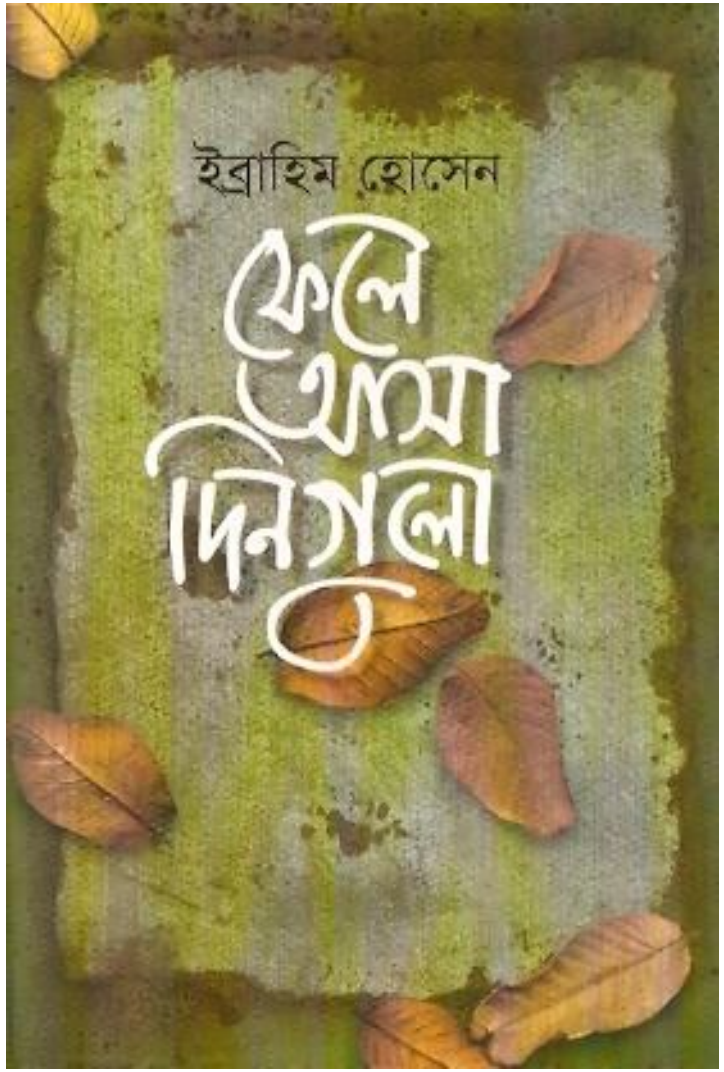

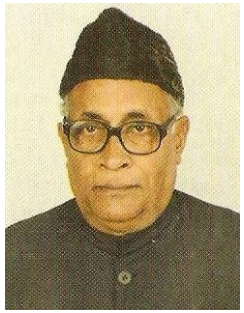

ইব্রাহিম হোসেন এক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও, নিরন্তর চেষ্টা-সাধনা-সংগ্রাম করেই তিনি নিজেকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর পিতা খান সাহেব মীর হোসেন যখন কোলকাতা আলীপূর কোর্টে ম্যাজিষ্ট্রেট, তখন তিনি ভর্তি হন সেন্ট বার্নাবাস স্কুলে। সেখানে তিনি প্রথম প্রত্যক্ষ করেন হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার ভয়াল-বীভৎস রূপ। হিন্দু-বৃটিশ ষড়যন্ত্রের শিকার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মুক্তির জন্য তার বালকমন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাই আমলার ছেলে হওয়া সত্ত্বেও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিতে ইব্রাহিম হোসেনের কোনো দ্বিধা-সংকোচ বা অসুবিধা হয়নি। ছাত্র জীবনেই তিনি নিজেকে কওমের খেদমতে উৎসর্গ করেন। পাকিস্তান আন্দোলনে তরুণ ইব্রাহিম হোসেন নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। ‘৪৭ পরবর্তীতে শূন্য থেকে হয়েছিলো দেশ গঠনের কাজ। এ কাজেও ইব্রাহিম হোসেন যথোপযুক্ত ভূমিকা পালন করেন। জাতির পিতা কায়েদে আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ যখন পূর্ব পাকিস্তান আগমন করেন তখন রিসেপশন কমিটির সেক্রেটারির দায়িত্ব অর্পন করা হয় তাঁর ওপর। তিনি এক সময় ঢাকা সিটি মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যও ছিলেন। নির্বাচিত হয়েছিলেন পাকিস্তান ন্যাশনাল এসেম্বলির মেম্বার।

তবে রাজনীতি ও ক্ষমতা কখনোই তাঁকে সমাজ সেবার মহান ব্রত থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। কারণ তাঁর রাজনীতি ছিলো মানুষের কল্যাণের জন্য। সেজন্যই আজীবন সমাজ সেবার সাথে যুক্ত বহু প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদে তিনি সমাসীন। আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের ব্যবস্থাপনা পরিষদের সিনিয়র সহ সভাপতি তিনি।

রাজনীতি ও সমাজ সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য বিভিন্ন সময়ে পেয়েছেন ব পদক ও সনদ। পাকিস্তান আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করার স্বীকৃতি স্বরূপ পাকিস্তান সরকার ১৯৯২ সালে তাঁকে স্বর্ণপদক প্রদান করে।

ফেলে আসা দিনগুলো
ইব্রাহিম হোসেন

প্রকাশক
নতুন সফর প্রকাশনীর পক্ষে
মুহম্মদ আশরাফ হোসেন

প্রথম প্রকাশ
১১ সেপ্টেম্বর ২০০৩
১৩ রজব ১৪২৪
২৭ ভাদ্র ১৪১০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

কম্পিউটার কম্পোজ-
আবুল কালাম আজাদ
ডেস্কটপ কালার গ্রাফিক

প্রচ্ছদঃ হামিদুল ইসলাম

মুদ্রণেঃ
বাংলাদেশ কো- অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ
ঢাকা।

Fele Asha Dingulo written by Ibrahim Hossain
Published by M Ashraf Hussain, Notun Safar Prakashani
44, Purana Paltan (1st Floor), Dhaka-1000.

‘সে ছিল দিল্লীর শের শক্তিমান এই দুনিয়ায়,
তর্জনী সংকেতে যাঁর কেঁপেছে হিমালা।’

কায়েদে আযম মুহম্মদ
আলী জিন্নাহ’র অমর
স্মৃতির উদ্দেশ্যে

সূচী

অধ্যায়	পৃষ্ঠা
১	৩
২	১০
৩	১৯
৪	২৭
৫	৩৬
৬	৫১
৭	৫৬
৮	৬২
৯	৬৬
১০	৭৫
১১	৮৪
১২	৯৪
১৩	১০১
১৪	১০৯
১৫	১২০
১৬	১৩১
১৭	১৩৫
১৮	১৫৮
১৯	১৬৬
২০	১৮৫
২১	১৯৬

প্রসঙ্গ কথা

বছর কয়েক আগে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের কর্মকর্তাদের এক সভায় সাবেক আইজিপি, এমব্যাসেডর ও কেয়ারটেকার সরকারের মন্ত্রী এ. বি. এম. কিবরিয়া একটা ইংরেজী বই আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'পড়েছেন? আপনার জেল জীবনের অনেক কথা এতে আছে।' আগ্রহভরে তাঁর কাছ থেকে সেটা নিয়ে দেখলাম বইটার নাম The Waste of Time- লেখক ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন। ড. হোসায়েনকে আগে থেকেই জানতাম। কিন্তু কখনও তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তবে জেলের ভিতর তাঁর একান্ত সাহচর্যে আসতে পেরেছিলাম।

এ ঘটনার কয়েকদিন পর আঞ্জুমানের সিইও প্রাক্তন ডিভিশনাল কমিশনার সাইদুর রহমান সহ The Waste of Time- এর প্রকাশকের অফিস ৪৪ পুরানা পল্টনে যাই বইটা সংগ্রহ করতে। প্রকাশক মুহম্মদ আশরাফ হোসাইনের সাথে দেখা হয়। প্রথম দিনেই অনেক কথা তাঁর সাথে। তিনি আমাকে আমার জীবনের ফেলে আসা দিনগুলো নিয়ে লেখার অনুরোধ করেন। ভদ্রলোক নতুন সফর নামে একটা মাসিক পত্রিকাও বের করেন। তিনি বললেন আপনার মত ঘটনাবহুল জীবনের অধিকারী ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণমূলক লেখা আমরা উৎসাহের সাথে প্রকাশ করি। আমরা মনে করি এতে আমাদের দিক- দিশাহীন নতুন জেনারেশন কিছুটা হলেও তাদের ইতিহাস- ঐতিহ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবে।

তাঁর কথায় আমি প্রভাবিত হলাম, অনুপ্রাণিত হলাম। এরপর শুরু হল লেখার পালা। কিন্তু আমি লেখক নই। লেখার অভ্যাসও নেই। পড়লাম মহাবিপদে। কি করি কি করি যখন ভাবছি তখন আশরাফ সাহেবের অনুরোধে এগিয়ে এলন তরুণ প্রতিশ্রুতিশীল লেখক ফাহমিদ- উর- রহমান। আমি বলতাম- তিনি লিখতেন। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতেন। খেই হারিয়ে ফেললে তা ধরিয়ে দিতেন। এভাবে তাঁর অদম্য চেষ্টা ও উৎসাহে ফেলে আসা দিনগুলো একটা অবয়ব পায়। আমি অকুণ্ঠচিত্তে বলতে চাই ফাহমিদ- উর- রহমান এ বইয়ের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছেন। তার নিঃস্বার্থ সহযোগিতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা না থাকলে সম্ভবত এ বইটি আলোর মুখ দেখতে পারত না।

আমাদের এ কাজে একজন মাদ্রাসা পড়ুয়া তরুণ দারুণ উৎসাহ যুগিয়েছে, আন্তরিক সহযোগিতা করেছে। তার নাম মুহম্মদ আনোয়ার হোসেন। ফেলে আসা দিনগুলো সম্পাদনার গুরু- দায়িত্ব পালন করেছেন কবি সাংবাদিক

আহমদ আখতার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর দক্ষ হাতের ছোঁয়ায় এ বইয়ে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে।

আমার পরিবারের যারা আমাকে এ বই লেখার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে তাদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় আমার স্ত্রী জাহানারা হোসেনের। আমার বড় মেয়ে লায়লা খায়রুন নাহার ও তার স্বামী খাজা মাঈনুদ্দীন, দ্বিতীয় মেয়ে মুনমুন শামসুন নাহার, তৃতীয় মেয়ে বিলকিস নাহার; ছেলে শওকত হোসেন এবং সুজায়েত হোসেনও নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছে।

নওয়াব সলিমুল্লাহ একাডেমীর সভাপতি মুহম্মদ আব্দুল জব্বার আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ যুগিয়েছেন। ফেলে আসা দিনগুলোর সাথে জড়িত সবাই আমার অতি আপনজন। এদের দু'জাহানের কল্যাণ কামনা করি।

(ফেলে আসা দিনগুলো মাসিক নতুন সফর পত্রিকায় ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ থেকে ডিসেম্বর ২০০২ সময়কালে প্রকাশিত হয়।)

ইব্রাহিম হোসেন
ঢাকা
১১ সেপ্টেম্বর ২০০৩

১

জন্মেছিলাম আমলার ঘরে। কিন্তু আমলার ঘরের সন্তানদের সাধারণত যেসব বদ অভ্যাস থাকে, আল্লাহর মেহেরবানীতে, আমি ছিলাম সেসব থেকে মুক্ত। সব সময় আম- জনতার পাশে থাকতাম। রাজনীতির কারণে সব শ্রেণীর লোকের সাথে মিশতে হত। জীবনের একটা বিরাট অংশ রাজনীতিতে কাটিয়েছি। কি পেলাম আর না পেলাম সেটা কখনই আমার কাছে ছিল না। মানুষের খেদমত করতে পেরেছি কিনা সেটাই ছিল আমার প্রধান বিবেচ্য। সে জন্যই রাজনীতির দাবা খেলায় আমি কখনও ভাল প্লেয়ার হতে পারিনি। অবশ্য সে জন্য আমার কোন আফসোস নেই।

আব্বা চাইতেন না রাজনীতি করি। রাজনীতি করলে ছেলেপেলে মানুষ হয় না। হয়ত এই ছিল তার ধারণা। তাছাড়া আমলাসুলভ দ্বিধা- সংকোচ তো ছিলই। ১৯৩৪ সাল। আব্বা তখন ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সময়টা ছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের যুগ। মিছিল- মিটিং- এ প্রায়ই নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবর ধ্বনি উচ্চারিত হত। মন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত। তখন আমি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জর্জ স্কুলে ক্লাস ফাইভের ছাত্র। একবার হঠাৎ করেই এমনি একটি মিছিলে চলে গিয়েছিলাম। তখনও বুঝতাম না কাদের মিছিল, কিসের মিছিল। মিছিল শেষে বাড়ি ফিরে আসার পর আব্বা একথা শুনে খুব ক্ষেপে গিয়েছিলেন। তখন থেকেই বোধ হয় মনের মধ্যে রাজনীতির জন্য একটা স্থান তৈরী হয়ে গিয়েছিল।

৯ ভাই- বোনের মধ্যে আমি দ্বিতীয়। ফেনীতে আমাদের গ্রামের বাড়ী। ছাগলনাইয়া থানায় পানুয়া গ্রামে আমার জন্ম ১৯২৪ সালে। কিন্তু কখনও সেখানে আমার থাকা হয়নি। আব্বার বদলির চাকরিতে সারা দেশ ঘুরে বেড়িয়েছি। আব্বা যখন কলকাতার আলীপুর কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেট তখন আমি ভর্তি হই সেন্ট বার্নাবাস স্কুলে। এটা ছিল খ্রিষ্টানদের পরিচালনাধীন। ক্লাস শুরু হত বাইবেল থেকে কিছু অংশ পাঠ করে। অধিকাংশ শিক্ষকই ছিলেন খ্রিষ্টান। এ স্কুলে বসেই প্রথম টের পাই সাম্প্রদায়িকতা কি জিনিস। আমার ক্লাসে মুসলমান ছাত্র ছিল গোটা আস্টেক। হিন্দুরা আমাদের বলত 'মোচলমান'; কেউ কেউ ভেংচিয়ে বলত 'মোছলা', 'নেড়ে'। কিন্তু হিন্দুরা পরিচিত ছিল বাঙ্গালী বলে। খ্রিষ্টানরা ছিল এসব বিবাদের বাইরে। তাদের খ্রিষ্টান ছাড়া অন্য কিছু বলা হত না। এই পার্থক্যটা সেকালে আরও বোঝা যেত খেলার মাঠে বিশেষ কোন ক্লাবের সাপোর্টারের ভিত্তিতে। যারা

মোহনবাগান সাপোর্ট করত তারা বাঙ্গালী। যারা মোহামেডানের পক্ষে তারা মুসলমান। আর ক্যালকাটা স্পোর্টিং ক্লাব ছিল ইংরেজদের। সুতরাং তাদের সাপোর্ট করত খ্রিষ্টানরা।

হিন্দুরা ইচ্ছে করেই মুসলমান নামগুলোকে বিকৃত করত। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত নেতাকে তারা বলত 'সুরাবর্দী'। আর আকরাম খাঁকে বলত 'আক্রমণ খাঁ'।

কলকাতা থেকে আব্বা ডি এম হিসেবে মালদায় বদলী হন। মালদা ছিল সুস্বাদু আমের জায়গা। সুলতানী বাংলার রাজধানী গৌড় ছিল মালদা শহর থেকে ৭ মাইল দূরে। মুসলিম সুলতানদের অসংখ্য কীর্তি গৌড় শহরে দেখেছি। শহরটা ছিল চারদিক থেকে গড় দিয়ে ঘেরা। গড় মানে হচ্ছে পরিখা। এখানে ছিল পানিপূর্ণ খাদ। সামরিক নিরাপত্তার জন্য কৃত্রিমভাবে এই গড় তৈরী করা হয়েছিল। গড় থেকেই গৌড় শব্দটা এসেছে।

বখতিয়ার খলজী যখন নদীয়া আক্রমণ করে বাংলাদেশ অধিকারের সূচনা করেন তখন তিনি এই গৌড়েই প্রথম রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন মুসলমান সুলতানদের রাজধানী ছিল গৌড়। গৌড়ের ফিরোজ মিনার তৈরী করেছিলেন সুলতান ফিরোজ শাহ। প্রায় ২৫০ ফুট উঁচু এ মিনারটি ব্যবহৃত হত রাজধানীর নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে। এখানে উঠে নিরাপত্তা রক্ষীরা চারিদিকে নজর রাখত। মালদার অদূরে আদিনা মসজিদটি ছিল খুবই বড়। বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের এটা ছিল অত্যুজ্বল নিদর্শন। এটা তৈরী করেছিলেন রাজা গণেশের ছেলে যদু। গণেশ ছিলেন একজন হিন্দু জমিদার। তিনি একবার সুলতানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই বিদ্রোহ দমন করতে জৌনপুর থেকে সুলতান ইব্রাহিম শার্কী আসেন। তাঁকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিলেন সোনারগাঁর বিখ্যাত আলেম নূর কুতুবুল আলম। বিদ্রোহ দমনের পর গণেশ ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান এবং তাঁর ছেলে যদু মুসলমান হয়ে যান। তিনি তখন এই মসজিদটি তৈরী করেন। আমি বন্ধু- বান্ধব- আত্মীয়- স্বজনের সাথে বহুবার মুসলিম সুলতানদের এসব কীর্তি দেখে বেড়িয়েছি। তখন থেকেই বোধ হয় ঐতিহ্য সম্পর্কে আমার একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল। আমি তখন ক্লাস টেনের ছাত্র। স্কুলের বার্ষিক স্পোর্টসে দৌড় প্রতিযোগিতায় সাত মাইল দৌড়ে আমি একবার গৌড় গিয়েছিলাম। তখন আমি বেশ খেলাধুলা করতাম।

মালদা শহরটার মাঝখান দিয়ে মহানন্দা নদী বয়ে গেছে। এরই একপারে নতুন মালদা শহর গড়ে উঠেছে। অপর পারে সুলতানী বাংলার মালদা। সেখানে

আছে বহু দিনের পুরনো মসজিদ আর মাযার। এই মাযারে একটা টিয়া পাখির কবরও ছিল। শোনা যায় টিয়াটি ছিল কোরাআনে হাফেজ। প্রতিদিন শত শত লোক এই মাযারে আসতেন।

মালদার খুব কাছেই ছিল বিহারের সীমানা। পলাশীর বিপর্যয়ের পর মহানন্দা নদী দিয়ে নৌকাযোগে এ পথ দিয়েই সিরাজদ্দৌলাহ বিহারের উদ্দেশ্যে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। শোনা যায় মেয়ে আমিনার খুব ক্ষিধে পেয়েছিল। তাকে খাওয়ানোর জন্য তিনি উপরে উঠেছিলেন। সেখানে ছিল এক ফকিরের আস্তানা। ফকিরই সিরাজদ্দৌলাহকে পুরস্কারের লোভে ধরিয়ে দেয়। সিরাজদ্দৌলাহর পায়ের জুতো দেখে সে তাকে চিনে ফেলে। এই জাতিদ্রোহী ফকিরের আস্তানা দেখতে আমি তখন বহুবার সেখানে গিয়েছি। মুসলমানরা গেলেই সেই ফকিরের আস্তানায় থুথু নিক্ষেপ করে নিজেদের ঘৃণা প্রকাশ করে থাকে। সেই ঘৃণায় আমি যে কতবার শরীক হয়েছি তার ইয়ত্তা নেই।

একবার মালদায় একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। আমরা স্কুলের পক্ষ থেকে ইন্টার স্কুল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগীতায় অংশ নেয়ার জন্য রংপুর গিয়েছিলাম। খেলা শেষে রংপুর থেকে যখন মালদায় ফিরে আসি তখন প্রায় রাত ১১টা। আমার সাথে এম এইচ খানও ছিলেন। তিনি পরে বাংলাদেশের নৌ-বাহিনী প্রধান হয়েছিলেন। তার আব্বা মোয়াজ্জেম হোসেন খান ছিলেন তখন মালদার এসপি।

আমাদের সবারই খুব ক্ষিধে পেয়েছিল। ভাবলাম যার যার বাড়ী যাওয়ার আগে একটু মিষ্টি খেয়ে যাই। সবাই মিলে আমরা যখন একটা হিন্দু মিষ্টির দোকানে ঢুকতে গেছি অমনি বাঁধা। হাত বাড়িয়ে মালিক বেশ উঁচু গলায় জানতে চাইলেন হিন্দু না মুসলমান? আমাদের তখন তরুণ বয়স। তাঁর কথায় আমাদের মাথায় আগুন উঠে গেল। আমরা সবাই তখন তাঁকে গালি দিয়ে তাঁর দোকানে ঢুকে পড়ি। ইচ্ছামত মিষ্টি খেয়ে বাকি সব মিষ্টির পাত্র রাস্তায় নিক্ষেপ করি। দোকানের মালিক এ ঘটনা দেখে পালিয়ে যান। পরে শুনছি তিনি আমাদের বিরুদ্ধে মামলা দেয়ার ফন্দি এঁটেছিলেন কিন্তু তিনি যখন শুনতে পান ঘটনার সাথে ডিএমও, এসপি সাহেবের ছেলেরা জড়িত তখন একেবারে চুপসে যান। এ ঘটনা নিয়ে অবশ্য মালদা শহরে সে সময়ে খুব হৈচৈ হয়। কিন্তু পরে আর কিছু হয়নি। তবে একটা পরিবর্তন এসেছিল বোধ হয়। এরপর থেকে হিন্দুরা আর কোনদিন মিষ্টির দোকানে মুসলমানদের সাথে দুর্ব্যবহার করেনি।

এসময় আমার আব্বা মালদার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচনে জহুর আহমদ চৌধুরীকে সহযোগিতা করেছিলেন। জহুর সাহেব ছিলেন যুক্ত বঙ্গ পরিষদের চীফ হুইপ। তখন ফজলুল হক মুসলিম লীগের সাথে মিলে মন্ত্রীসভা তৈরী করেছিলেন। পরে যখন তিনি শ্যামা- হক মন্ত্রীসভা গঠন করেন তখন জহুর সাহেব মুসলিম লীগেই থেকে যান এবং মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে নির্বাচনে দাঁড়ান। জহুর আহমদ চৌধুরীকে নির্বাচনে সহযোগিতা করার জন্য আমার পিতা শ্যামা- হক মন্ত্রীসভার রোষানলে পড়েন এবং চাকরীতে তাঁর পদাবনতি হয়। তিনি মালদার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট থেকে ঢাকা সদরের এসডিও হিসেবে বদলী হন। ইতিমধ্যে আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস করে আইএতে ভর্তি হবার প্রস্তুতি নিচ্ছি। তখন ঢাকা কলেজ ছিল আজকের পুরাতন হাইকোর্ট বিল্ডিংয়ে। ১৯৪১ সালে আমি আইএতে ভর্তি হলাম। এসময় আমার ক্লাসমেটদের মধ্যে পরবর্তীতে আইজি আব্দুর রহীম, (অর্থ সচিব) কফিলুদ্দিন মাহমুদের নাম মনে পড়েছে। তখন এই হাইকোর্ট বিল্ডিং নিয়ে অনেক কাহিনী শুনতে পেতাম। এই বিল্ডিং তৈরী হয়েছিল বঙ্গ বিভাগ উত্তরকালে নতুন প্রদেশের গভর্নরের বাসভবন হিসেবে। এখানে ইংরেজ সাহেব- সুবারা গভীর রাত পর্যন্ত নাচ- গান ও পানাহার নিয়ে আসর গুলজার করত। বিল্ডিং সংলগ্ন যে মাযার বর্তমানে যা হাইকোর্ট মাযার নামে সুপরিচিত সেখান থেকে এক রাতে কেউ বেরিয়ে আসেন। তিনি অসামাজিক কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হয়ে গভীর রাতে খাট- পালংকসহ সমস্ত ইংরেজকে বাইরে নিক্ষেপ করেন। ফলে তারা ভীত হয়ে পালিয়ে যায়। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। মিত্র বাহিনীর সৈন্যরা পুরো ঢাকা শহর ছেয়ে ফেলেছে। একদিন শুনতে পেলাম মিত্র বাহিনীর হেড কোয়ার্টার হিসেবে আমাদের কলেজ বিল্ডিংটি রিকুইজিশন করা হবে। সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন কলেজটি হিন্দু অধ্যুষিত ফরাশগঞ্জ এলাকার একটি পরিত্যক্ত জমিদার বাড়িতে স্থানান্তর করা হবে। তখন ঢাকা কলেজের অধিকাংশ ছাত্রই ছিল মুসলমান। এরা মনে করেছিল হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় কলেজ করতে গেলে তাদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। আর তাছাড়া ঢাকায় তখন অহরহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছিল। আমার বিশ্বাস, এ সমস্ত দাঙ্গায় শ্যামা- হক মন্ত্রীসভার সুস্পষ্ট ইন্ধন ছিল। তখন আমি ঢাকা কলেজের নির্বাচিত জি.এস। কলেজ স্থানান্তরের প্রতিবাদে আমরা মুসলমান ছাত্ররা সংগঠিত হতে শুরু করি। আমাদের এ প্রতিবাদ আন্দোলনে প্রখ্যাত ছাত্রনেতা শহীদ নজির, ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র, হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বিএ সিদ্দিকী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভিসি ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন অনেক সহযোগিতা করেছিলেন।

প্রতিবাদের মুখে সরকার কলেজ স্থানান্তর স্থগিত রাখে। এখানে বলে রাখা ভাল, সেদিন শহীদ নজিরের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ঢাকায় পাকিস্তান আন্দোলন তীব্র গতি অর্জন করে। ঢাকাবাসীর মধ্যে শহীদ নজিরের অসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখেছি। মহল্লায় মহল্লায় গিয়ে পাকিস্তানী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা এই তরুণ ছাত্রনেতা ব্যাখ্যা করেছেন। তখন ঢাকার নওয়াব হাবিবুল্লাহ মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে শ্যামা- হক মন্ত্রীসভায় যোগ দেন। ঢাকার নওয়াব পরিবারের বরাবরই একটি প্রতিপত্তি ছিল। সুতরাং মন্ত্রীসভায় তাঁর যোগদান পাকিস্তান আন্দোলনের জন্য একটি বড় আঘাত বলে আমাদের কাছে মনে হয়েছিল।

নওয়াবের বিরুদ্ধে শহীদ নজিরের নেতৃত্বে ঢাকার মানুষ তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। তিনি ঢাকায় এলে ফুলবাড়ীয়া ষ্টেশনে শহীদ নজিরের নেতৃত্বে নওয়াবকে কাল পতাকা দেখান হয়েছিল। সেদিন নওয়াবের সফর সঙ্গী ছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক। ষ্টেশনে শহীদ নজিরের সাথে আমরা ছাড়াও স্বয়ং নওয়াব বাহাদুরের ছোট ভাই নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ, সৈয়দ আব্দুস সেলিম এবং পুরাতন ঢাকার উল্লেখযোগ্য কয়েকজন সর্দারও ছিলেন। এঁদের মধ্যে ইলিয়াস সর্দার, মতি সর্দার, আহসানুল্লাহ সর্দারের নাম মনে পড়ছে। ষ্টেশনে নওয়াবের কিছু ভাড়াটিয়া লোকজন আমাদের প্রতিরোধের চেষ্টা করলেও সকলের দৃঢ়তার মুখে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

এরপর একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। ইউনিভার্সিটির কার্জন হলে একটি মিটিং এ হায়দ্রাবাদের একজন কংগ্রেসী মুসলমান বক্তৃতা করতে আসেন। শহীদ নজিরের নেতৃত্বে মুসলমান ছাত্ররা এ অনুষ্ঠান বর্জন করেন। কংগ্রেসী বিশেষতঃ হিন্দু ছাত্ররা এ ঘটনায় মারমুখী হয়ে ওঠে এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত করে। সেদিন আমি আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতার অনুষ্ঠানস্থলে ছিলাম। খেলা চলাকালীন সময়ে দাঙ্গার খবর শুনতে পাই। তাড়াতাড়ি করে কিছু মুসলমান ছাত্রকে সাথে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছি। জায়গাটা ছিল বর্তমান মেডিকেল কলেজের আউটডোর বরাবর। তখন এ জায়গায় বিরাট নর্দমা ছিল। আমি এসে দেখি নর্দমার পারেই হিন্দু ও মুসলমান দুই পক্ষ সাজ সাজ রবে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়ায়ে আছে। নজির কোন পক্ষে না গিয়ে সরাসরি উভয় পক্ষের মাঝামাঝি এসে দাঙ্গা থামানোর চেষ্টা করতে থাকেন। আমি নজিরের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। চোখের নিমিষে কোন কিছু বুঝতে না বুঝতেই একটি হিন্দু ছেলে আচমকা নজিরের পৃষ্ঠদেশে ধারাল ছোরা বসিয়ে দেয়। সাথে সাথে নজির মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্পষ্ট মনে আছে ঐ অবস্থায়ও ছোরাটি তাঁর

পিঠে বিদ্ধ ছিল। পরক্ষনে চারদিকে হৈচৈ শুরু হয়ে যায়। সবাই প্রাণ ভয়ে এদিকে সেদিকে ছুটতে থাকে। আমরা নজিরকে ধরাধরি করে ঘোড়ার গাড়িতে করে মিডফোর্ট হাসপাতালে নিয়ে যাই। শহীদ নজিরের আহত হবার ঘটনা শুনে ড. আব্দুল্লাহ, ড. নুরুর রহমান, ড. আবিদ উদ্দীনসহ প্রায় দু'হাজার মুসলমান ছুটে আসেন। যখন নজিরের পিঠ থেকে ছুরি টেনে বের করা হয় তখন ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণেই নজির ইন্তেকাল করেন। সরাসরি পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি ছিলেন প্রথম শহীদ। পরে শুনেছি নজিরকে যে আঘাত করেছিল সে ছিল একজন পেশাদার খুনী। তাই তার আঘাত মোটেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি।

নজিরের অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা ও বাগ্মিতা প্রতিপক্ষের কাছে ছিল রীতিমত ভীতির কারণ। মুসলমানদের নেতৃত্বহীন করবার জন্য হিন্দুরা সেদিন তাঁকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়।

নজির ইন্তেকালের পর ঢাকায় এক অভূতপূর্ব অবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারী করে। প্রশাসনিক বাধা সত্ত্বেও ঢাকার জনসাধারণ প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসে এবং তাঁর লাশ বহন করে আজিমপুর গোরস্তানে দাফন করা হয়।

নজিরের মৃত্যু ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের জন্য একটি বিরাট ক্ষতি। দীর্ঘদিন ঢাকার জনসাধারণ এ দুঃখ- বেদনা বহন করে নিয়ে বেড়িয়েছে। নজিরের মৃত্যুর ভিতর দিয়ে তৎকালীন মুসলিম রাজনীতির একটি দিক নির্দেশনা রচিত হয়। হিন্দুদের সাথে মুসলমানদের যে সমন্বয়ের রাজনীতি আর সম্ভব নয় সেদিন সাধারণ মুসলমানের মাঝে এ অনুভূতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শহীদ নজির প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আবদুল গণি হাজারীর একটা উদ্ধৃতি না দিয়ে পারছি নাঃ

'এখন নজিরকে শহীদ বলে অভিহিত করতে হলে অন্ততঃ দুটি বিষয় আমাদের স্পষ্টভাবে দেখতে হবেঃ একটি হচ্ছে যে আন্দোলনের সংগে নজির জড়িত ছিল, তাকে সত্যি জেহাদ বলা চলে কি না; আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে তার মৃত্যু ঠিক এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল কিনা- এই জেহাদের অঙ্গীভূত ছিল কিনা। প্রথম প্রশ্নের জবাব এই ক্ষেত্রে না দিলেও চলবে। কেননা, পাকিস্তান আন্দোলন যে ভারতীয় মুসলিম জাতির- তথা ইসলামের অস্তিত্বকে ভারতে অক্ষুন্ন রাখবার একটি প্রচেষ্টা, সে বিষয়ে আজ আর কারও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ইসলামের ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শকে ব্রিটিশ ও হিন্দুর লোলুপ গ্রাস থেকে

বাঁচিয়ে ভারতে তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার প্রচেষ্টার অন্য নামই হচ্ছে পাকিস্তান আন্দোলন এবং এই আন্দোলনের পথে যে সব বাধা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে, তাকে জয় করে অগ্রসর হবার চেষ্টাকে জেহাদ বলে অভিহিত করলে একটুও বেশী বলা হবে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তান আন্দোলনকে জেহাদ বলায় এতটুকুও আতিশয্য হয় না। এই আন্দোলনের সঙ্গে নজির ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। পাকিস্তানই যে ছিল তার জীবনের ধ্যান ও ধারণা, ইসলামের অস্তিত্বকে সগৌরবে বজায় রাখবার চেষ্টাই যে ছিল জীবনের একমাত্র কর্ম, তা'তার জীবনের কথা থেকেই আমরা নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করতে পারি।

শহীদ নজির কি ভাবতেন, তাঁর চিন্তা চেতনা কেমন ছিল ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনের লেখায় আমরা তার পরিচয় পাইঃ

'সেদিন ফিরবার পথে অনেক কথা হল 'পাকিস্তান' সম্পর্কে। নজির জিজ্ঞাসা করলেন, শেষ পর্যন্ত আমরা তাঁর সাহচর্যে কাজ করতে স্বীকৃত হব কিনা। বললাম, এ প্রশ্ন অত্যন্ত অহেতুক মনে হচ্ছে। এর উত্তরে নজির যে কথা বলেছিলেন, সে আমার আজও স্পষ্ট মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন যে, পাকিস্তান কথাটিকে তিনি একটা রাজনৈতিক বুলি হিসেবে গ্রহণ করেননি। পাকিস্তান আনতে হলে একটা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিপ্লবের প্রয়োজন হবে। আমরা মৌখিকভাবে ইসলামের আনুগত্য স্বীকার করলেও আমাদের সমাজনীতি ও অর্থনীতি দুটোই ইসলামী আদর্শ থেকে বিচ্যুতে হয়ে পড়েছে। ধনতন্ত্রবাদের সমর্থন কি ইসলামের কোথাও আছে? যদি সত্য সত্যই পাকিস্তানে আমাদের আস্থা থাকে, তবে এ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আমরা সে জন্য সত্যই প্রস্তুত হয়ে রয়েছি কি? তাঁর সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। আজও পারবনা। কিন্তু একথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পারি যে, নজিরের সে প্রশ্নের উত্তর যতদিন বাংলার তরুণ সমাজ দিতে না পারছে, ততদিন পাকিস্তানের স্বপ্ন অবাস্তব থেকে যাবে।'

২

১৯৭১ সালে আমরা যখন ঢাকায় এলাম তখন এটি ছিল একটি ছোট্ট জেলা শহর। সেদিনের ঢাকার সাথে আজকের ঢাকার কোন তুলনাই চলে না। আজকের কমলাপুর রেল ষ্টেশন ছিল ফুলবাড়ীয়ায়। রেল লাইনের ওপারে ছিল মাঠ। শুধুমাত্র পুরানো পল্টন এলাকায় কয়েক ঘর হিন্দু বাস করত। মতিঝিল ও দিলকুশা এলাকা ছিল নওয়াবদের বাগানবাড়ী। নওয়াব সলিমুল্লাহর দ্বিতীয় পু নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ এখানে বাস করতেন। তাঁর বৃহদায়তন প্রাসাদটি ছিল বর্তমানের ডিআইটি বিল্ডিং-এর ঠিক পিছনেই। সরকার পরবর্তীকালে এসব এলাকা রিকুইজিশন করে নেয়।

ঢাকার মুসলমানদের সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি তেমন একটা ছিল না বললেই চলে। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরী-বাকরী প্রায় সব কিছুতেই ছিল হিন্দুদের একাধিপত্য। শুধুমাত্র বই-এর ব্যবসাটা দু'জন নেতৃস্থানীয় মুসলমান ব্যবসায়ীর হাতে ছিল দেখেছি। এঁদের একজন কাজী আব্দুর রশীদ। পরবর্তীকালে এঁর এক ছেলে কাজী বশীর ওরফে হুমায়ুন ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হন। আর একজন আব্দুস সোবহান। ধানমন্ডির সোবহানবাগ এলাকা এক সময় তিনি কিনে নিয়েছিলেন। সোবহানবাগ নামটি তাঁরই স্মৃতি বহন করছে। সেকালের গরীব মুসলমানরা বংশাল, নাজিরাবাজার, বেগমবাজার, নওয়াবগঞ্জ, রায় সাহেব বাজার, রোকনপুর, কলতাবাজার প্রভৃতি এলাকায় বসবাস করত। এরা মূলত ওস্তাগরি করত, ঘোড়ার গাড়ি চালাত। সে আমলে ওয়ারী ছিল অভিজাত এলাকা। উচ্চবিত্ত হিন্দু পরিবার এ এলাকায় বাস করত। বলধার জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর বাস ছিল ওয়ারীতে। তাঁর ছিল বিরল প্রজাতির গাছ সংরক্ষণ করার সখ। বলধা গার্ডেন তাঁর নিজের তত্ত্বাবধানেই করা। রবীন্দ্রনাথ একবার নরেন্দ্র নারায়ণের বাড়িতে এসে উঠেছিলেন। তাঁর ক্যামেলিয়া কবিতাটি এখানে বসেই লেখা। এ এলাকায় মুসলমানদের কোন প্রবেশাধিকার ছিল না। যদি কেউ ভুলক্রমে ঢুকেও পড়ত তবে সে এলাকা বুড়িগঙ্গার জলে ধুয়ে ফেলা হত। তখনকার দিনে মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের এই ছিল সাধারণ আচরণ। এ এলাকার পাশ দিয়ে তখন ঢাকা নারায়ণগঞ্জ রেল লাইন ছিল। একবার রেলগাড়ি থামিয়ে হিন্দুরা ১৯ জন নিরীহ মুসলমানকে জবাই করে ফেলে। তখনকার দিনে নওয়াব পরিবারের সদস্য ছাড়া ঢাকায় কয়েকজন প্রভাবশালী মুসলমানের কথা মনে পড়ছে। এঁদের মধ্যে সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর, শেফাউল মুলক হাকিম হাবিবুর রহমান,

আখুনজাদা, আবুল হাসানাৎ, সৈয়দ রেজাউল করিম, বাদামতলীর সৈয়দ মোহাম্মদ আলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর ও হাকিম হাবিবুর রহমান ঢাকার ইতিহাস লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। এছাড়া হাবিবুর রহমান হেকিম হিসেবে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। শুনেছি রোগীর গলার আওয়াজ শুনে তিনি রোগ ধরে ফেলতে পারতেন। দিল্লীর হাকিম আজমল খাঁনের মতই তাঁর হাতযশ ছিল। নওয়াব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে যখন মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন হাকিম সাহেব বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৪৪ সালে আইএ পাশ করে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই। অনার্সে আমার সাবজেক্ট ছিল হিস্ট্রি। ইউনিভার্সিটিতে তখন আজকের মত রাজনীতি এত শিকড় গাড়েনি। ছাত্ররা রাজনীতির চেয়ে লেখাপড়াকেই বেশী অগ্রাধিকার দিত। কোন কোন বড় ইস্যুতে কেবলমাত্র ছাত্রদের অংশগ্রহনণটা ব্যাপক হয়ে উঠত। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কও আজকের মত ছিল না। শিক্ষকদের মধ্যে ছিল না দলবাজি। তখনকার দিনে ঢাকা ইউনিভার্সিটির অধিকাংশ শিক্ষকই ছিলেন হিন্দু। মুসলমান শিক্ষকদের মধ্যে ড. শহীদুল্লাহ, ড. মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, ফজলুর রহমানের নাম মনে পড়ছে। তখন আমাদের ভিসি ছিলেন ড. মাহমুদ হাসান। তাঁর মত এমন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আজকের দিনের শিক্ষকদের মধ্যে খুব একটা দেখা যায় না।

আমার ক্লাসমেটদের মধ্যে আবু সালেক, সুলতান হোসেন খান, খোরশেদ আলম চৌধুরী, আফতাব উদ্দীন আহমদ, কাজী আউলাদ হোসেন, এটি সাদী, শামসুজ্জোহার নাম মনে পড়ছে। ইউনিভার্সিটিতে মৌলভী ফরিদ আহমদ, শাহ আজিজুর রহমান, মোহাম্মদ তোয়াহা, শফিউল আযম আমার সিনিয়র ছিলেন।

তখন পাকিস্তান আন্দোলন কেবল দানা বাঁধতে শুরু করেছে। আমরা ইউনিভার্সিটির তরুণ মুসলিম ছাত্ররা মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি অর্জনের জন্য উন্মুখ হয়েছিলাম। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর আহ্বান আমাদের প্রাণে নবজীবনের তরঙ্গ এনে দিয়েছিল।

তখন মুসলিম ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় অফিস ছিল কলকাতার ১৪/২ চাঁদনী চকে। বশিরহাটের আনোয়ার হোসেন ছিলেন ছাত্রলীগের সভাপতি। তিনি ছিলেন খুবই উঁচু মানের সংগঠক। বাংলার তরুণ মুসলমানদের মধ্যে পাকিস্তানের বাণী ছড়িয়ে দেবার জন্য তিনি দিবারাত্রি পরিশ্রম করতেন এবং রাত কাটাতেন পার্টি অফিসেই। আনোয়ার হোসেনের সাথে বরিশালের মহিউদ্দীন আহমেদ, আব্দুর রহমান চৌধুরী, নুরুদ্দীন আহমদ, আব্দুর রশীদ, বাহাউদ্দীন আহমদ, বীরভূমের

মোশাররফ হোসেন, চাঁটগাঁর কাজী নাজমুল হক, রুহুল আমিন নিজামী, মুজাহারুল কুদ্দুস, ফরিদপুরের লুৎফর রহমান, শেখ মুজিবুর রহমান, খুলনার আফিলুদ্দীন, একরামুলক হক, মাকসুমুল হাকীম, রাজশাহীর এমরান আলী সরকার, এমএ ফারুক, আব্বাস তৈয়ব, আব্দুস সবুর, রংপুরের মশিউর রহমান, সাইদুর রহমান, আতাউর রহমান, মোমেন শাহীর আবু সাঈদ চৌধুরী, ঢাকার আব্দুল আউয়াল, আলমাস হোসেন, শামসুল হক, শামসুদ্দীন, আলাউদ্দীন আহমেদ, কুমিল্লার মুজিবুর রহমান, শফিকুর রহমান, শফিকুল ইসলাম, বগুড়ার আব্দুল হামিদ খান, ফজলুল বারী, বিএম ইলিয়াস প্রমুখ পাকিস্তান আন্দোলনের জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করতেন। এর মধ্যে বরিশালের মহিউদ্দীন আহমদ ছিলেন আমার খুবই ঘনিষ্ঠ। কলকাতার বৈঠকখানা রোডের জিন্নাহ হলে আমরা দু'জন একসাথে বহুদিন কাটিয়েছি। তিনি খুব উঁচুদরের সংগঠক ছিলেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনের জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করতেন। তিনি এক সময় এত ভারত বিরোধী ছিলেন যে, রেডিওতে ভারতীয় সংবাদ শুনতেন না এবং কাউকে শুনতে দেখলে সে রেডিও পর্যন্ত ছুঁড়ে মারতেন। মহিউদ্দীন ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে পুরো বরিশালের জনগণকে সংগঠিত করবার জন্য অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এ সময় বরিশালের নদীপথে লঞ্চে করে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে মহিউদ্দীন, আব্দুর রহমান চৌধুরী ও আমি রাতদিন পাকিস্তানের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছি।

পাকিস্তান হওয়ার পর একবার পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে বরিশালে তার প্রতিক্রিয়া হয়। বরিশালের দাঙ্গার পিছনে মহিউদ্দীনের হাত ছিল বলে অনেকে সে সময় অভিযোগ করেছিল। বরিশালের ডিসি ফারুকী তাঁকে দীর্ঘদিন জেলে রাখেন। জেলে গিয়েই তাঁর চিন্তাভাবনা পাল্টে যায়। সেখানে কিছু কমিউনিস্ট নেতার সংস্পর্শে এসে তিনি বামপন্থী বনে যান। এভাবেই একজন পাকিস্তানপন্থী নিবেদিত প্রাণ রাজনীতিবিদ পাকিস্তান বিরোধী শিবিরে যোগ দেন। আমরা মহিউদ্দীনকে জেল থেকে মুক্ত করার জন্য শাহ আজিজুর রহমানসহ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতারা লিয়াকত আলী খানকে অনুরোধ করি। কিন্তু ডিসি ফারুকীর অনমনীয়তার মুখে সেটি আর সম্ভব হয়নি।

উজিরে আযম লিয়াকত আলী খান মহিউদ্দীনকে ছেড়ে দেয়ার কথা বললে ডিসি উত্তর দিয়েছিলেন Sir, Please do not request me. So long I am the D.M of Barisal, I will not allow him to go out of jail. সেকালের

আইসিএসডিএম- দের ব্যক্তিত্বের সামনে ঝানু রাজনীতিবিদরাও নাকানি- চুবানি খেতেন।

১৯৪৫ সালে আমরা মুসলিম ছাত্রলীগের কুষ্টিয়া সম্মেলনে যোগ দেই। এই সম্মেলনে ছাত্রলীগের একটি সাংগঠনিক কমিটি খাড়া করা হয়। শামসুল হুদা চৌধুরী সভাপতি ও শাহ আজিজুর রহমান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। আমি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হই। এই সম্মেলনে আমরা বাংলার সর্বত্র ছাত্রলীগকে সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেই এবং সম্মেলন শেষে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ি। আমরা দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে দলকে সংগঠিত করবার জন্য চেষ্টা চালাই। শাহ আজিজ ছিলেন আমাদের দলে। তিনি ছিলেন খুবই শক্তিশালী বক্তা। আরবী, উর্দূ, ইংরেজী, বাংলা যখন যেটির প্রয়োজন বোধ করতেন তিনি তাই ব্যবহার করতেন। ইসলামের উপর ছিল তাঁর অগাধ পড়াশোনা। ইসলামের নানা প্রসঙ্গ অবতারণা করে তিনি যে কোন সময় জনতাকে মাতিয়ে দিতে পারতেন। সে সময় কয়েকজনের এক একটি দল করে আমরা এমনিভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বুঝানোর জন্য ছড়িয়ে পড়েছিলাম।

এ সময় লেডী ব্রাবোর্ন কলেজের কিছু ছাত্রী মুসলিম ছাত্রলীগের মহিলা শাখা গড়ে তোলেন। এঁদের মধ্যে হাজেরা খাতুন, মেহেরুন্নেসা, সৈয়দা রোকেয়া মুসলমান মহিলাদের মধ্যে পাকিস্তানের বাণী ছড়িয়ে দেয়ার জন্য খুবই পরিশ্রম করেছেন।

পরবর্তীকালে মেহেরুন্নেসা ওকালতি পাস করেন। মুসলমান মেয়েদের মধ্যে তিনিই প্রথম উকিল হিসেবে আদালতে হাজিরা দেন। তিনি ছিলেন নোয়াখালীর প্রখ্যাত মুসলিম লীগ নেতা ও যুক্তবঙ্গের শেষ মন্ত্রীসভার সদস্য খান বাহাদুর আব্দুল গোফরানের মেয়ে। মেহেরুন্নেসা মোমেনশাহী থেকে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদ সদস্য হয়েছিলেন। হাজেরা খাতুনের বিয়ে হয় সিলেটের মাহমুদ আলীর সাথে। মাহমুদ আলী সিলেট রেফারেন্ডামের সময় আমাদের সাথে কাজ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী হন। আসামের মুসলমানদের আন্দোলন নিয়ে তিনি Insurgent Assam নামে একটি তথ্যপূর্ণ বই লিখেছিলেন। রোকেয়ার বিয়ে হয় আমাদের এক সময়ের মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেনের সাথে। তিনিও পরবর্তীকালে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য হন। র‍্যাংকিন ষ্ট্রিটের সিলভার ডেল হাইস্কুল তাঁরই প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে। ১৯৪৬- এর নির্বাচনের আগে কায়েদে আযম কলকাতায় আসেন। কলকাতায়

এলে তিনি ৫, হ্যারিংটন ষ্ট্রিটে ইসপাহানীর বাড়িতে উঠতেন। আমরা সেদিন অনেকে হ্যারিংটন ষ্ট্রিটে কায়েদে আযমকে দেখতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি সমগ্র এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে আছে। বাড়ির সামনে বারান্দায় তখন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, খাজা নাজিমুদ্দীন, মওলানা আকরাম খাঁ, হবিবুল্লাহ বাহার, ফজলুর রহমান, হামিদুল হক চৌধুরী, খাজা শাহাবুদ্দীন প্রমুখ ঘোরাফিরা করছিলেন। কায়েদে আযমের ব্যক্তিত্বের প্রখরতা এত বেশী ছিল যে, তাঁর সামনে বাংলার মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ প্রায় সবাই নিস্প্রভ হয়ে যেতেন। মানুষকে পর্যবেক্ষণ করে ত্বড়িৎ বুঝে ফেলার এত অদ্ভুত যাদুমন্ত্র তাঁর হাতে ছিল। বাংলার কোন মুসলিম লীগ নেতা জাতির জন্য রাজনীতি করেছেন, কে উপরে ওঠার চেষ্টা চালাচ্ছেন, কে সম্পদ বানানোর অভিপ্রায়ে রাজনীতিতে এসেছেন তা তিনি কিছুক্ষণ কথা বলেই বুঝে ফেলতেন।

গিয়ে দেখি শেখ মুজিবের নেতৃত্বে জহিরুদ্দীন, নুরুল হুদা, আবু সালেহ, নুরুদ্দীন, আজমিরী প্রমূখ ঐ ভীড়ের মধ্য থেকেই কায়েদে আযম জিন্দাবাদ, মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ বলে শ্লোগান দিচ্ছেন। এঁরা কয়েকজন মুসলিম ছাত্রলীগের জন্য কাজ করতেন কিন্তু আমাদের থেকে পৃথকভাবে। তাঁরা কোন কমিটির সদস্য ছিলেন না। এঁরা সোহরাওয়ার্দী সাহেবের গ্রুপ বলে পরিচিত ছিলেন। এঁরা তখন কলকাতায় মুসলিম ছাত্রলীগের উদ্যোগে একটি সম্মেলনের চেষ্টা চালান। কলকাতা নগর মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি সিলেটের মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন এঁদের সাথে। কিন্তু কায়েদে আযম তাঁদের উদ্যোগকে সমর্থন দেননি।

আমরা নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে কায়েদে আযমের সাথে দেখা করতে যাই। খাজা নাজিমুদ্দীন ও মওলানা আকরাম খাঁ আমাদের সাথে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমরা তাকে আমাদের কাজকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করি। তিনি আমাদের সম্মেলনে বক্তৃতা করতে রাজী হন।

ইসপাহানীর বাড়ীর সামনে দাঁড়ানো অজস্র মানুষের সামনে তিনি মাত্র একবার দেখা দিয়েছিলেন। তাঁর চলন, বলন ও ভঙ্গির মধ্যে ছিল বিশেষ ধরণের আভিজাত্য, যা অন্য দশজনের মত ছিল না। আমার এখনও চোখে ভাসে তিনি শান্ত, ধীর পায়ে বেরিয়ে এসে জনতার সামনে হাত উঁচু করে ধরতেই সবাই যেন নিশ্চুপ বনে গেল। তিনি তাঁর বিশেষ স্টাইলে মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, My young friends, from morning till now I am very much busy; Please let me have some rest. এই কথা বলে তিনি ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ করেছেন এমন সময় কে যেন জনতার মধ্য থেকে চিৎকার করে বলল, Sir how long you are

remaining in Calcutta. তিনি তাঁর বিশেষ ভঙ্গিমায়ই উত্তর দিয়েছিলেন, As long as I feel necessary.

আমাদের সম্মেলন হয়েছিল কলকাতার বিখ্যাত গড়ের মাঠে। সেদিনও কায়েদে আযম লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে এক অসাধারণ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সারা বাংলাদেশ থেকে আমাদের প্রতিনিধিরা এখানে হাজির হয়েছিল। তাছাড়া কলকাতার মুসলমানরা সেদিন গড়ের মাঠে ভেঙ্গে পড়েছিল। কায়েদে আযম ইসপাহানীকে নিয়ে যখন গাড়ীতে করে সম্মেলন স্থলে পৌঁছলেন তখন এক অভূতপূর্ব অবস্থার সৃষ্টি হয়। চারদিক নারায়ে তকবীর আল্লাহু আকবর, কায়েদে আজম জিন্দাবাদ, মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। আমার মনে হচ্ছিল পুরো কলকাতা শহর বুঝি থরথর করে কাঁপছে।

আমরা তাঁকে অভ্যর্থনা করে স্টেজে নিয়ে বসাই। ছাত্রলীগ মহিলা শাখার নেত্রী রোকেয়া হাতের কাজ করা পুরো ভারতবর্ষের ম্যাপ যার মধ্যে চিহ্নিত হয়েছিল সম্ভাব্য পাকিস্তান এলাকা এবং নীচে ইংরেজীতে লেখা হয়েছিল Two Nation Theory কায়েদে আযমকে উপহার দেন।
রোকেয়া খুব ভাল সূঁচের কাজ জানতেন।
কায়েদে আযম বক্তৃতায় যা বলেছিলেন আমি তার প্রায় পুরোটাই মুখস্ত করে ফেলেছিলাম। এখনও তার দু'একটি মূল্যবান লাইন মনে আছেঃ We maintain and hold that Hindus and Muslims are two Major Nations by any definition. We are a nation of ten crores by our distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, legal laws and moral codes, Customs and calendars, history and traditions, aptitude and ambitions. In short, we have our distinctive outlook on life and of life; by all canons of international law we Muslims are a nation. You see, after victory in the last Great War, Mr. Churchill showed two fingers as sign of victory. But my victory is this (Quid-e-Azam showed one finger.) If you Muslims are united, there is no power on earth, which can stop you from achieving Pakistan.

শাহ আজিজ এই বক্তৃতার বাংলা ও উর্দু অনুবাদ করে শুনিয়েছিলেন। তিনি এই সম্মেলনে সভাপতিত্বও করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি একবার আমাদের বলেছিলেন কায়েদে আযমের উপস্থিতিতে ঐ সভায় সভাপতিত্ব করাই ছিল তাঁর জীবনের সেরা ঘটনা।

কলকাতার মুসলমান ছাত্রদের বেশী আনাগোনা ছিল ইসলামীয়া কলেজ, আলীয়া মাদ্রাসা আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল ও বেকার হোস্টেলে এবং মীর্জাপুরের জিন্নাহ হলে। কলকাতায় গেলে আমি জিন্নাহ হলেই আস্তানা গাড়তাম। আত্মীয়- স্বজনের বাসায় না উঠে এখানে থাকার আমার কিছু সুবিধা ছিল। অবাধ রাজনীতি চর্চা ও আন্দোলনে আমার কেউ বাধা হয়ে উঠত না। জিন্নাহ হলের খাটগুলোতে এত ছারপোকার প্রকোপ ছিল যে আমাদের পিঠ তখন কারোরই অক্ষত ছিল না।

একবার কলকাতায় থাকতে রশীদ আলী দিবস পালিত হয়। রশীদ আলী ছিলেন সুভাষ বসুর বিপ্লবী বাহিনী INA- এর সদস্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর INA নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে দিল্লীর লালকেল্লার অভ্যন্তরে ইংরেজরা বিচার করতে শুরু করে। রশীদ আলীর বিচারের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কলকাতার রাস্তায় মুসলিম ছাত্রলীগের ছেলেরা মিছিল করে, গণজমায়েত করে ইংরেজদের অপকর্মের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির প্রয়াস চালায়। তখন পুলিশ লাঠিচার্জ করে, টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে। একপর্যায়ে গুলিও চালায়। এতে আমাদের বহু কর্মী আহত হয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়। বেশ কিছু কর্মীকে গ্রেফতার করে সরকার আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে ঢুকিয়ে দেয়।

আমরা আহতদের চিকিৎসা ও পথ্যের জন্য রাস্তায় রাস্তায় চাঁদা তুলেছিলাম। আমাদের মুখে তখন একটাই ভাষা ছিল 'শহীদ ও জখমীকো মদদ করনে কে লিয়ে কুচ দিজিয়ে।' কলকাতার সাধারণ মানুষ আমাদের পথযাত্রায় দারুণ সাড়া দিয়েছিল। আমরা বিপুল তথ্য, ফল- ফলাদি নিয়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ভর্তি করে ফেলেছিলাম। মনে আছে কলকাতার খ্রিষ্টানরা আমাদের বিছিলে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। এঁরা কলকাতার তালতলা এলাকায় থাকতেন। আসলে সেকালে ভারতীয় খ্রিষ্টানরা কখনোই চাইত না আমরা আজাদীর আন্দোলন গড়ে তুলি।

এসময় সারা ভারতবর্ষ জুড়েই বিরাজ করছিল এক আস্থাহীন পরিবেশ। কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সবকিছু বিষয়ে তুলেছিল। এর প্রত্যুত্তরে সেকালের মুসলিম রাজনীতিও মারদাঙ্গা হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ, হিন্দু মহাসভা, শিবসেনা প্রভৃতির সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। তাঁরা তখন সিদ্ধান্ত নেন মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড প্রতিষ্ঠার। বাংলায় ন্যাশনাল গার্ড গড়ে তোলার পিছনে হোসেন

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বিশাল ভূমিকা রেখেছিলেন। আসলে বাংলায় পাকিস্তান আন্দোলন জনপ্রিয় করার পিছনে তাঁরই ভূমিকাটা ছিল অনন্য।

মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের সালারে সুবা নির্বাচিত হয়েছিলেন আইএইচ মুহাজীর। নায়বে সালারে সুবা হন জহিরুদ্দীন। জহিরুদ্দীন পরে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছিলেন এবং কেন্দ্রের মন্ত্রীও হয়েছিলেন। তিনি সোহরাওয়ার্দীর গুণমুগ্ধ ছিলেন।

১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের টিকেটে জহিরুদ্দীন এমএনএ হন কিন্তু পরবর্তীতে তিনি আওয়ামী লীগের বাংলাদেশ আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেননি। ১৯৭১ সালে বিশৃঙ্খলার মধ্যে তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কন্যা বেগম আখতার সোলায়মানের সাথে পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেন। এজন্য তাঁকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছিল। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর তাঁকে মুক্তিযোদ্ধারা মেরে ফেলার জন্য ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর রহমতে তাঁর প্রাণটা কোনক্রমে রক্ষা পায় তবে মুক্তিদের হাতে তাঁর লাঞ্ছনার শেষ ছিল না। পরবর্তীকালে তাঁকে পাকিস্তানে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল।

দেখতে দেখতে ১৯৪৬ সালের নির্বাচন ঘনিয়ে আসে। এ নির্বাচনকে কায়েদে আযম পাকিস্তান ইস্যুর নির্বাচন হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব জাগরণ সৃষ্টি হয়। এতকাল মুসলমানরা শুধু ইংরেজ ও হিন্দুদের যৌথ শোষণ ও নির্যাতনে জর্জরিত ও পীড়িত হয়ে আসছিল। ১৭৫৭ সালে বাংলায় মুসলিম শাসন অবসানের পর মুসলমানরা হান্টার সাহেবের ভাষায় 'ভিস্তিওয়ালা ও কাঠুরিয়া' জাতিতে পরিণত হয়েছিল। দু'শ বছরের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের শেষে এই প্রথমবারের মত তাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সুযোগ এল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের অত্যাচার তখন চরমে পৌঁছেছিল।

সে আমলে হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের বাড়ির সামনে দিয়ে কোন মুসলমান ছাতা মাথায় দিয়ে যেতে পারত না। জুতা পায় এমন কি হাঁটুর নীচে কাপড় পরে তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে গেলে রীতিমত শাস্তি পেতে হত। বরিশালে আমার আব্বা এ ডি এম ছিলেন। তখন সেখানেও দেখেছি বাজারে কোন গরুর গোশত পাওয়া যেত না। গরু জবাই দূরে থাক, সকালে ফজলুল হকের মত শক্তিশালী মুসলিম নেতা পরিশালের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও অবস্থার তেমন একটা পরিবর্তন হয়নি। মিষ্টির দোকানে মুসলমানদের ভিতরে গিয়ে বসে মিষ্টি খঅওয়ার কথা চিন্তাই করা যেত না। মিষ্টি খাওয়ার পর উপর থেকে পানি ঢেলে দেয়া হত

আর তাই আজলা ভরে খেতে হত। স্কুলে মুসলমান ছেলেরা বসতো পিছনের সারিতে। মুখে পেঁয়াজের গন্ধোর অভিযোগ তুলে তাদের দূর দূর করে সরিয়ে দিত হিন্দু সতীর্থরা।

মুসলমান ছাত্রদের বাধ্য করা হতো সরস্বতী পূজায় ভোগ দেয়ার জন্য। নিজের চোখেই দেখেছি দোলযাত্রায় মুসলমানরা অংশ গ্রহণ করত। এগুলো সম্ভব হয়েছিল এ কারণে, সাংস্কৃতিকভাবে মুসলমানদের প্রায় পর্যুদস্ত করে দেয়া হয়েছিল।

৩

বরিশাল থেকে আমার আব্বা খুলনায় বদলি হয়ে এলে আমি খুলনা জেলা স্কুলে ভর্তি হই। কবি ফররুখ আহমদও এই স্কুলের কৃতী ছাত্র ছিলেন। খুব সুন্দর করে কবিতা আবৃত্তি করতেন আমাদের স্কুলে। তখন চাটগাঁ থেকে আব্দুর রহমান নামে একজন তেজস্বী মুসলিম হেডমাস্টার বদলী হয়ে আসেন। মুসলমান ছাত্ররা ধুতি পরে স্কুলে আসুক এটা তাঁর পছন্দ হয়নি। তিনি নিয়ম করলেন মুসলমান ছাত্ররা ধুতি পরতে পারবে না মাথায় টুপি দিতে হবে। নামাজ অবশ্যই পড়তে হবে। এটার ব্যতিক্রম হলে তিনি মুসলমান ছাত্রদের তিরস্কার করতেন; কখনও কখনও শাস্তিও দিতেন। মুসলমান হেড মাস্টারের এসব কান্ডকারখানায় হিন্দু ছাত্ররা সে সময় খুব রুষ্ট হয়েছিল।

আসলে এই শতকের চল্লিশের দশকটা ছিল বাঙ্গালী মুসলমানদের জন্য একটা রূপান্তরের সময়। বহু বছরের গ্লানি ও নির্জীবতা থেকে তারা তখন কেবল চোখ মেলতে শুরু করেছিল।

খুলনার মুসলমান নেতাদের মধ্যে তখন আব্দুল হাকিম ছিলেন খুব বিখ্যাত লোক। সবুর খান তখনও রাজনীতির ময়দানে স্থায়ী জায়গা করতে পারেননি। তিনি তখন খুব ভাল ফুটবল খেলতেন।

পাকিস্তান আন্দোলনের বাণীকে বাংলার মুসলমানদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার জন্য দৈনিক আজাদ সে সময় এক তুলনাহীন ভূমিকা রেখেছিল। কংগ্রেস সমর্থিত পত্রিকা যুগান্তর, বসুমতী, আনন্দবাজার, অমৃতবাজার প্রভৃতির মিথ্যা অপপ্রচার খন্ডাতে মওলানা আকরাম খাঁর আজাদ ছিল একমাত্র এবং যথার্থ অবলম্বন।

দৈনিক আজাদের সম্পাদক ছিলেন স্বনামধন্য সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন। দৈনিক আজাদ, মোহামেডান স্পোটিং ক্লাব, আব্বাস উদ্দীনের গান আর জনসেবায় আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম ছিল মুসলমানদের গর্বের বিষয়। সে সময় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব তারুণ্যের প্রতীক হিসেবে আমাদের সামনে স্থান করে নিয়েছিল। জুম্মা খাঁ, হাফেজ রশীদ শাফী, উসমান, রহীম, শাহজাহান প্রমুখ খেলোয়াড়ের ক্রীড়া নৈপুণ্যে উজ্জীবিত হয়ে উঠত সবাই। এক একবার মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব শিরোপা লাভ করত। তখন মনে হত সারা বাংলার মুসলমানরাই যেন এক উৎসবে মেতে উঠেছে। কবি গোলাম মোস্তফা একবার মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের শিরোপা অর্জনের ওপর সুন্দর একটা কবিতা

লিখেছিলেন। কবিতাটির শিরোনাম ছিল 'লীগ বিজয় না দিগ বিজয়'। খেলার মাঠে হাফেজ রশীদ একবার আহত হন। মনে আছে তাঁর আরোগ্য কামনায় মসজিদে মসজিদে দোয়া হয়েছিল। তাঁর অবস্থা জানার জন্য কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হাজার হাজার লোক ছুটে গিয়েছিল আর তাঁদের নিয়ে যাওয়া পথ্য সামগ্রীতে সেদিন মেডিকেল কলেজের ওয়ার্ড এক রকম উপচে পড়েছিল। সত্যি বলতে কি এ ঘটনা ছিল অভূতপূর্ব।

আব্বাস উদ্দীন ছিলেন সুকণ্ঠ শিল্পী। তাঁর গলায় যখন ইসলামী গান উঠে আসত তখন শ্রোতারা যেন হারানো সম্বিত ফিরে পেত। আব্বাস উদ্দীনের গানের মাধ্যমেই পল্লী বাংলার ও সেকালের মুসলিম চেতনা ও সংস্কৃতির একটি আবহ ফুটে উঠেছিল। মুসলিম লীগের বিরাট বিরাট জনসভায় গানের মাধ্যমে পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে তাঁর ভূমিকা ছিল অতুলনীয়।

আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম ছিল একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। মুসলিম সমাজের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য এবং মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতি রেখে মানবিক সেবাকর্মের উদ্দেশ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিভিন্ন সময় এ প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলার স্বনামধন্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ জড়িত ছিলেন। কলকাতার ডাইরেক্ট অ্যাকশন পরবর্তী সময় যখন মারমুখী হিন্দুরা নিরীহ মুসলমানদের আক্রমণ করে তখন হাজার হাজার মুসলমানের লাশ দাফনের ব্যবস্থা করেছিল এই প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সালাউদ্দীন নামে একজন মহৎ ব্যক্তি দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। তাঁর অপরিসীম উৎসাহে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের সেবামূলক কর্মের পরিধি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আজকাল প্রায়ই প্রচার মাধ্যমের বদৌলতে জনসেবায় মাদার তেরেসার নাম শোনা যায়। কিন্তু এই নীরব সাধক সালাহউদ্দীন মাদার তেরেসার তুলনায় কোন অংশে কম ছিলেন না।

১৯৪৬ সালের নির্বাচন ছিল মুসলমানদের জন্য একটা টার্নিং পয়েন্ট। কায়েদে আযম আহ্বান জানিয়েছিলেন যদি মুসলিম লীগের প্রার্থী কলাগাছও হয় তবে তাকেই ভোট দিতে। বাংলার মুসলমানরা সেরকমই করেছিলেন। তাঁরা সেদিন একযোগে মুসলিম লীগকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে দেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হল সারা ভারতের আর কোথাও মুসলিম লীগ এমন সমর্থন পায়নি। এমনকি নির্বাচনোত্তর কালে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশেও মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হতে পারেনি। একমাত্র বাংলাতেই সেটা সম্ভব হয়েছিল। বাংলার মুসলমানদের নির্বাচনী জেহাদেই বলা যায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়েছিল।

নির্বাচনের পর প্রদেশে মুসলিম লীগ গঠিত হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হন প্রধানমন্ত্রী। নুরুল আমীন সাহেব স্পীকার আর কুমিল্লার মফিজুদ্দীন চীফ হুইপ নির্বাচিত হন।

সোহরাওয়ার্দ্দী ছিলেন অভিজাত পরিবারের সন্তান। তাঁর আব্বা জাহিদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি আর মা খুজিস্তা আখতার বানু ছিলেন একজন বিদুষী মহিলা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনিই প্রথম ফার্সীতে এম এ পাশ করেন।

সোহরাওয়ার্দী ছিলেন স্বনামধন্য পন্ডিত। জামালুদ্দীন আফগানীর তিনি ছিলেন ভক্ত। আর হাসান সোহরাওয়ার্দী ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর।

অভিজাত পরিবারের সন্তান বলে তাঁর মধ্যে কোন অহমিকা ছিল না। বিনা আয়াসে তিনি কুলি-মজুর, রেল-শ্রমিক, ঠেলা গাড়ির চালক আর রিকশাওয়ালাদের সাথে মিশে যেতে পারতেন। কলকাতার ডক শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে তিনি একসময় অবিশ্রান্ত খেটেছেন। শ্রমিক আন্দোলনে তাঁর সাথে দুজন মুসলিম নেতা যুক্ত হয়েছিলেন। একজন পূর্ব পাকিস্তানের শেষ গভর্ণর ডা. এ এম মালেক আর অপরজন ফয়েজ আহমেদ।

মওলানা ভাসানী একবার আমাকে বলেছিলেন সি আর দাস দেশ বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ প্যারিস থেকে ধুয়ে আনা হত। কিন্তু শহীদও তাঁর চেয়ে কম ছিলেন না। শহীদ ছিলেন বিসিএল, উপরন্তু জন্মেছিলেন এক খান্দানী পরিবারে। কিন্তু তাঁর পছন্দ ছিল অনাড়ম্বর জীবন। ১৯৪৬-এর নির্বাচনের সময় দেখেছি, মুসলিম লীগের সাধারণ কর্মীদের সাথে তিনি কিভাবে মিশে যেতেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী রাত্রে কর্মীদের ঘুমানোর ব্যবস্থা করে দিয়ে নিজে জেগে থাকতেন। দিনের পর দিন কর্মীদের ভরণ-পোষণের ব্যয় নিজে বহন করতেন। বাকেরগঞ্জের নির্বাচনী প্রচারের সময় লঞ্চ থেকে নেমে তিনি নিজে আমাদের ডাব কেটে পানি পান করিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর মধ্যে কখনও ক্লান্তি দেখিনি। বাংলার পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে ফজলুল হক, নাজিমুদ্দীন ও সোহরাওয়ার্দী ছিলেন তিনটি নক্ষত্র।

৪৬-এর নির্বাচনের ঠিক আগের একটি ঘটনা। তখনও মুসলিম লীগ প্রার্থীদের নাম পুরোপুরি ঠিক হয়নি। ঢাকার নওয়াবগঞ্জ-দোহার এলাকা থেকে আমরা মোহাম্মদ ওয়াসেককে ঠিক করেছিলাম প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করাব। ওয়াসেক ছিলেন বিপ্লবী ছাত্রনেতা। সেকালে বাংলায় মুসলিম ছাত্রদের সংগঠিত

করতে ওয়াসেক দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত কাজ করেছিলেন। আমরা যখন মালদায় ছিলাম তখন তিনি একবার সেখানে যান। আমাদের স্কুলের মুসলমান ছাত্ররা সেদিন তাঁর অনলবর্ষী বক্তৃতায় এতটা উদ্দীপিত হয়েছিল যে তা ভুলবার নয়। তরুণ ওয়াসেক সে সময় কলকাতার হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণে নেতাজী সুভাষ বসুর সাথে যোগ দিয়ে এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন।

ওয়াসেক বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাও পাস করেন। কিন্তু রাজনীতি এত মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি উচ্চ পদের চাকরীর প্রলোভন সহজেই ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন চিরকুমার। বিত্ত- বৈভবের প্রতিও তাঁর কোন আসক্তি ছিল না। একটি নিরাসক্ত মন ছিল তাঁর। নির্বাচনের আগে টাকার দরকার। সোহরাওয়ার্দী সাহেব তখন একবার ঢাকায় এলেন। তিনি উঠেছিলেন নওয়াবজাদা নসরুল্লাহর বাসায়। সোহরাওয়ার্দীও মনে- প্রাণে আশা করেছিলেন ওয়াসেক নির্বাচনে দাঁড়াক। মুসলিম লীগ নেতারা সৎ যোগ্য ও উদ্যমী প্রার্থীকে চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন এলাকায় যাচ্ছিলেন। ওয়াসেকের নিজের এলাকায়ও এরকমটি ঘটে। একদিন তিনি আমাকে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছে নিয়ে যান। ওয়াসেক সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কাল সুবা ছে বাজে ও আপকা ইহা চলে আয়েগা, আপ উনকো সাড়ে তিন হাজার রূপীয়া দে দিজিয়েগা আউর ও সুবা লঞ্চ মে সাইনপুকুর চলা জায়েগা। সাইনপুকুর ছিল মুসলিম লীগ নেতা ফজলুর রহমানের গ্রামের বাড়ি। এটি ছিল দোহার থানায়। এখানে তিনি জনমত জরিপের কাজ চালাচ্ছিলেন।

ওয়াসেক সাইনপুকুর চলে যাওয়ার পর আমি পরদিন যথাসময় সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ওখানে যাই। তিনি তখন বাড়ীর সামনে পায়চারী করছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন You seems to be very naughty boy. Ibrahim, you have come so early. ব্যাংক নেহী খুলনেছে রূপীয়া হাম কাহাসে দে? তুম দশবাজে আকে পয়সা লে লেনা। আমি বললাম স্যার হামকো ছুবহ ছে বাজেকা লঞ্চ মে যানা হোগা। লঞ্চ ছে বাজে ছোড় কে চলা যায়েগা। বাদ মে আওর কই লঞ্চ নেহি হায়। হামকো রূপীয়া এন্তেজাম করকে দিজিয়ে।

তখন তিনি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহর কাছ থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা ধার নিয়ে আমাকে দিলেন। আমি সেই টাকা নিয়ে সরদঘাটের দিকে রওনা দেই। গিয়ে দেখি লঞ্চ চলে গেছে। তখন মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের সালারে সিটি সিরাজুদ্দীনের কাছ থেকে আমি একটা সাইকেল ধার করে নদী পার হয়ে

আড়িয়াল বিলের ভিতর দিয়ে সাইনপুকুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই। সেদিন সাইকেল চড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। সাইকেল কাঁধে আর কচুরিপানা ভেঙ্গে ঘটনাস্থলে গিয়ে ওয়াসেকের কাছে টাকা পৌঁছাতে হয়েছিল। নির্বাচনকে সামনে রেখে তখন মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে অনেক সাইকেল কেনা হয়েছিল।

সেদিন ওয়াসেকের জন্য এই যে এত খেটেছিলাম মনে হয় এর কোন কিছুই কাজে আসেনি। ফজলুর রহমান চাননি ওয়াসেক নির্বাচনে দাঁড়াক। তিনি নির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে পছন্দ করেছিলেন অবসরপ্রাপ্ত স্কুল ইনস্পেক্টর খান বাহাদুর আব্দুল খালেককে। খালেক সাহেব আমার আত্মীয়। কিন্তু তাঁর নির্বাচনে দাঁড়ানোটা আমার কাছে গুরুত্বহীন মনে হয়েছিল। মুসলিম লীগের জন্য ওয়াসেকের যে বিপুল অবদান তাঁর সামনে খালেককে কোন স্থান দেয়া যেত কিনা সন্দেহ।

সে সময় মুসলিম লীগের মধ্যে সোহরাওয়ার্দী আর নাজিমুদ্দীনের দুটো ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ ছিল। নাজিমুদ্দীন গ্রুপে ছিলেন মওলানা আকরাম খাঁ, ফজলুর রহমান, হামিদুল হক চৌধুরী, ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) আর তমিজুদ্দীন খাঁ।

সোহরাওয়ার্দীর সাথে ছিলেন আবুল হাশিম, বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, ডা. এ এম মালেক, টি আলী, আব্দুস সবুর খান, খয়রাত হোসেন, আব্দুল জব্বার খদ্দর, আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ। দলের মধ্যে এই গ্রুপিং- এর কিছু প্রভাব নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী নির্বাচনের মধ্যেও পড়েছিল। ওয়াসেক ছিলেন সোহরাওয়ার্দীর সাথে। ফজলুর রহমানের প্রভাব পার্লামেন্টারী বোর্ডের সামনে ওয়াসেকের মনোনয়ন তাই বাতিল হয়ে যায়। এটা ছিল একটা দুঃখজনক সিদ্ধান্ত।

ওয়াসেক আমাকে কলকাতা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য নাজিমুদ্দীন গ্রুপকে তাঁর পক্ষে যেন আমি ভালভাবে বুঝাতে পারি। আমার নিজেরও দুর্বলতা ছিল নাজিমুদ্দীন গ্রুপের প্রতি। নাজিমুদ্দীন ও ফজলুর রহমান উভয়কে আমি ওয়াসেকের পক্ষে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কথা বলেছিলাম। এতে ফজলুর রহমান আমার প্রতি বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি আমাদের পক্ষের হয়ে কেন ওয়াসেকের জন্য কাজ করছ। আমি বলেছিলাম, আমি মুসলিম লীগের জন্য কাজ করছি। ওয়াসেককে মনোনয়ন দিলে মুসলিম লীগের আদর্শ বাস্তবায়নে আমাদের সুবিধা হবে। কিন্তু আমার সেদিনের অনুরোধে তাঁরা কোন কর্ণপাত করেননি। ঠিক এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল চাটগাঁর ফজলুল কাদের চৌধুরীর মনোনয়ন নিয়ে। তিনি ছিলেন নাজিমুদ্দীন গ্রুপে। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের চাপে তিনি মনোনয়ন লাভে

ব্যর্থ হন। আমরা মনে করেছিলাম ফজলুল কাদের চৌধুরী একজন উঁচু দরের সংগঠক ও লীগের উদ্যমী কর্মী, তাঁর মনোনয়ন লাভ মুসলিম লীগের ভিত্তিকেই মজবুত করবে। আমরা বেকার হোস্টেল থেকে মিছিল নিয়ে সোহরাওয়ার্দীর বাসায় গিয়েছিলাম। মিছিলে আমাদের সাথে সোহরাওয়ার্দীর পি এস নূরুল হুদাও ছিলেন। এই নূরুল হুদাই পরবর্তীকালে ঢাকায় বুলবুল একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। মিছিলের ভিতর থেকে অনেকেই ফজলুল কাদের জিন্দাবাদ, সোহরাওয়ার্দী মুর্দাবাদ ধ্বনি দিয়েছিল। এসব শুনতে পেয়ে সোহরাওয়ার্দী বাড়ীর ভিতর থেকে বের হয়ে এসে বললেন, Your Zindabad and Murdabad carries the same music to me.

তারপর তিনি আমাদের শান্ত করার জন্য বললেন, তোমরা এখন চলে যাও। পার্লামেন্টারী বোর্ডেই আমরা সব সিদ্ধান্ত নেব। কিন্তু চূড়ান্ত মনোনয়নের ঘোষণা দেয়ার পর আমরা হতবাক হয়ে দেখলাম ফজলুল কাদের চৌধুরীর নাম নেই। ওয়াসেকের কাহিনী বলতে গিয়ে এই যে এত কথা বললাম এর কারণ সোহরাওয়ার্দীর পার্টি কর্মীদের প্রতি কি অসীম মমতা ছিল সেটা বুঝানোর জন্য।

সোহরাওয়ার্দী কখনোই ভাল বাংলা বলতে পারতেন না। সভাগুলোতে তিনি বাংলা ও উর্দু মিশিয়ে জগাখিচুড়ি ভাষায় যা বলার চেষ্টা করতেন তা আমরা বেশ উপভোগ করতাম। জনসভায় কায়েদে আযমের কাছ থেকে আমি এসেছি এটা বলতে তিনি বলতেন আমি কায়েদে আযমের কাছ থেকে টাটকা টাটকা আসিয়াছে। তারপরেই তিনি যোগ করতেন কায়েদে আযম তোমাদের কাছে জানাইতে বলিয়াছে মুসলিম লীগকে ভোট দিতে। কায়েদে আযম তোমাদের খুব ভালবাসে। তোমরাও তাঁকে খুব ভালবাস আমি জানি।

কলকাতার ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে- তে সোহরাওয়ার্দী মুসলমানদের জান বাঁচানোর জন্য নিজের জান বাজি রেখেছিলেন। যেখানে তিনি শুনেছেন মুসলমানদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে লোকজন আর পুলিশ ফোর্স নিয়ে তিনি নিজেই সেখানে ছুটে গিয়েছেন। সেদিন সোহরাওয়ার্দী না থাকলে কলকাতার সব মুসলমান খতম হয়ে যেত।

পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা মুসলিম লীগেই থেকে যাই। সোহরাওয়ার্দীর এই মুসলিম লীগ ত্যাগ আমরা কর্মীরা কখনও প্রসন্ন মনে মেনে নিতে পারিনি। কিন্তু কলকাতায় মুসলিম লীগের ভিতরকার গ্রুপিং পাকিস্তান হওয়ার পর প্রকাশ্য আকার ধারণ করে। সোহরাওয়ার্দী আর নাজিমউদ্দীন উভয়েই দুই মেরুতে চলে যান। আমি মুসলিম

লীগে থাকলেও তাঁর সাথে আমার প্রীতির সম্পর্ক কখনই চুকে যায়নি। একবার পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার সম্পাদক সালাম সাহেবের মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছিল প্রেস ক্লাবে। বর ছিলেন সাংবাদিক এ বি এম মূসা। ঐ অনুষ্ঠানে সোহরাওয়ার্দীসহ আবু হোসেন সরকার, হামিদুল হক চৌধুরী, ইউসুফ আলী চৌধুরীর মত নামী দামী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে আমিও ছিলাম। আব্দুল জব্বার খদ্দর আমাদের টেনে নিয়ে সোহরাওয়ার্দীকে বললেন ইব্রাহিম এখন অনেক টাকা বানিয়েছে। এর কাছ থেকে কিছু আদায় করুন। সোহরাওয়ার্দী তখন আমার পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন ওতো আমার জন্যই টাকা বানিয়েছে। ওর টাকাতো আমার টাকা। তিনি ছিলেন সুবিশাল চিত্তের অধিকারী।

পাকিস্তান আন্দোলনে আবুল হাশিমের অবদান ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে অনেকখানি সীমাবদ্ধ। তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ নির্বাচিত হন। ১৯৪৫-৪৬ সালে পাকিস্তান আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন পাকিস্তানের দাবিকে জনপ্রিয় করবার জন্য তাঁর অবদান সোহরাওয়ার্দীর চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন অনেকটা রেডিক্যাল চিন্তার অধিকারী। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সাম্যভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ার কথা তিনি বলতেন। মুসলিম ছাত্রলীগের তরুণদের নিয়ে তিনি কোরআনের ক্লাস করতেন। এ ক্লাসে তিনি কোরআন শরীফের আলোকে এক আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার চিত্র তরুণদের সামনে তুলে ধরতেন। তিনি মনে করতেন পাকিস্তানও হবে এ ধরণের একটি আদর্শ রাষ্ট্র।

আবুল হাশিমের সবচেয়ে উৎসাহী ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন টাঙ্গাইলের শামসুল হক, মুন্সীগঞ্জের শামসুদ্দীন, নারায়ণগঞ্জের আওয়াল ও আলমাস। আলমাস পরে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য হয়েছিলেন।

শামসুদ্দীন কিছুদিন মৌলভী তমিজুদ্দীন খানের প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেছিলেন। পরে তিনি পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি ডাইরেক্টর হিসেবে যোগ দেন। শামসুল হক আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। মওলানা ভাসানী ছিলেন সভাপতি। খন্দকার মোশতাক ও শেখ মুজিব ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক।

শামসুল হক খুব উদ্যমী মানুষ ছিলেন। আবুল হাশিমের মত তিনিও ইসলামের বিপ্লবী ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করতেন। টাঙ্গাইলের এক উপনির্বাচনে তিনি মুসলিম লীগের প্রার্থী খুররম খান পন্নীকে হারিয়ে দিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এই নির্বাচন ছিল মুসলিম লীগের জন্য টেস্ট কেস। তখনই বুঝা গিয়েছিল মুসলিম লীগ ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে।

শামসুল হকের জীবনের শেষ অধ্যায় ছিল খুব দুঃখজনক। তিনি বিয়ে করেছিলেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্রী নরসিংদীর সিকান্দার মাষ্টারের মেয়ে আফিয়াকে। ভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে শামসুল হক কারাবরণ করেন। শুনেছি সেখানে তিনি হয়ে যান ভারসাম্যহীন। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর শামসুল হক হয়ে যান সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ। শামসুল হক জেলে যাবার পর তাঁর সাথে আফিয়ার আর কোন সম্পর্ক ছিল না।

জেল থেকে বের হয়ে তিনি বহুদিন ভারসাম্যহীন অবস্থায় ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ঘোরাঘুরি করেছেন। প্রাদেশিক পরিষদের একজন সদস্যকে দেখবার মত তখন কেউ ছিল না। আমার বাসায় তিনি এভাবে কয়েকবার এসেছেন। পুরানো ঢাকার সেকালের এক রেস্টুরেন্টের আবাসিক কামরায় তিনি মাঝে মাঝে থাকতেন। কিন্তু পয়সার অভাবে হোটেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে বহুবার গলাধাক্কা দিয়েছে। একদিন শুনতে পেলাম তাঁর লাশ বুড়ীগঙ্গায় এক নৌকার ভিতর পাওয়া গেছে। তারপর তাঁর আর কোন খবর পাইনি। অথচ তিনি তখনও আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক।

শামসুল হকের অন্তর্ধানের রহস্য, তাঁর স্ত্রীর চলে যাওয়া এবং তাঁর অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যাওয়া সবই আমার কাছে এখনও রহস্য হয়ে আছে। আওয়ামী লীগের কেউ সেদিন তাঁর সামান্য কাজেও আসেনি। মানবিক সহানুভুতিও তিনি পাননি।

৪

আবুল হাশিম মুসলিম লীগের নওয়াবদের অপছন্দ করতেন। হয়ত হতে পারে এটা তাঁর সাম্যবাদী চিন্তাভাবনার ফসল। মওলানা আকরাম খাঁর কাছে যখনই গিয়েছি, তিনি আবুল হাশিমের চিন্তা ভাবনার নিন্দা করেছেন। আকরাম খাঁ ছিলেন দেশ বিখ্যাত আলেম। তিনি বলতেন আবুল হাশিম ইসলামের অপব্যাখ্যা করছে। আবুল হাশিমের গুরু ছিলেন মওলানা আজাদ সুবহানী। গুরুর চিন্তাভাবনকে বিন্যস্ত করে তিনি লিখেছিলেন তাঁর যুগান্তকারী দার্শনিক গ্রন্থ Creed of Islam.

পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খান তাঁকে ইসলামিক একাডেমীর ডাইরেক্টর বানান। আইয়ুব খান তাঁর পান্ডিত্যের প্রশংসা করতেন।

আবুল হাশিম আমাদের মহল্লা ওয়ারীতেই থাকতেন। আমি প্রায়ই তাঁর কাছে যেতাম। তিনি কথা বলতেন, আমি শুনতাম। মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে আমি তাঁর সাথে দেখা করতে যাই। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সেভ না করতে পারায় তাঁর দাড়ি বড় হয়ে গিয়েছিল। আমি বললাম, ভাই, দাড়িতে আপনাকে খুব মানিয়েছে। সফেদ চুল ও দাড়িতে আপনাকে দরবেশের মত লাগছে।
তিনি হাসি মুখে বললেন আর কিছু বলার থাকলে বল।
আমি ইতস্তত করে বললাম ইসলামে আছে দাড়ি রাখা সুন্নাত।

তিনি একটু গলার স্বর উঁচু করে বললেন ইসলামে দাড়ি রাখার বিধান সম্বন্ধে তুমি কি জানো? কোরআন শরীফের কোথাও এমন কোন কথা নেই যে দাড়ি রাখতেই হবে।

আমি বললাম রাসূল (সাঃ) দাড়ি রাখতেন। আবুল হাশিম বললেন সেটা পরিবেশের কারণে। তারপর তিনি হাসতে হাসতে বললেন আমাকে সুন্দর লাগে কি না লাগে তুমি বলার কে! আমার স্ত্রী বা ঐ বিধবা বোনটি যদি বলে দাড়ি রাখলে আমাকে সুন্দর লাগে তখনই কেবল আমি দাড়ি রাখব।

আবুল হাশিমের ইসলামী সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব কথার উত্তরে সবুর সাহেব বলতেন, হাসু ভাই, সোনার পিতলের কলস হয় না। পিতল পিতলই, সোনা সোনাই, ইসলাম ইসলামই, সমাজতন্ত্র সমাজতন্ত্রই। আবুল হাশিমের ব্যাখ্যা শুনতে লীগ কর্মীদের সবুর খান বহুদিন নিষেধ করেছেন।

আমরা মনে করেছিলাম পাকিস্তান হবে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে, বাংলা ও আসামকে নিয়ে গঠিত হবে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল। আমরা কখনও চিন্তা করতে পারিনি কলকাতাসহ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো আমাদেরকে দেয়া হবে না।

আসলে দেশভাগ নিয়ে তখন চলছিল ইঙ্গ- হিন্দু যৌথ চক্রান্ত। ভারতবর্ষের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ছিলেন দারুন হিন্দু প্রেমী। জওহরলাল নেহেরুর সাথে ছিল তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব। রাজনীতির দাবাখেলায় কায়েদে আযম ও তাঁর মুসলিম লীগের সামনে কংগ্রেসের ঝানু ঝানু হিন্দু নেতারা যখন কাত হয়ে পড়েছিলেন তখন তাঁরা গ্রহণ করেন ষড়যন্ত্রের পথ। র‍্যডক্লিফ রোয়েদাদ মুসলমানদের প্রতি যে বেইনসাফী করেছিল সেটা সম্ভব হয়েছিল মুসলমান বিদ্বেষী ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনের ইশারায়। এই মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদের ফর্মূলা প্রস্তুত করেছিলেন নেহেরুর সাথে গোপন আলোচনার মাধ্যমে। যার ফলে ভাগ বাটোয়ারার সময় যে পাকিস্তান পাওয়া গেল তা ছিল কায়েদে আযমের ভাষায় গড়ঃ Moth eaten Pakistan - পোকায় কাটা পাকিস্তান।

কায়েদে আযম চাননি বাংলা ও পাঞ্জাব দুই টুকরো হয়ে যাক। বাংলাকে অবিভক্ত রাখতে তিনি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছিলেন। অন্তত তিনি এতটুকু আশা করেছিলেন মুসলমানরা কলকাতা পাবে। কলকাতা শহর গড়ে ওঠার পিছনে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের ছিল অনেক অবদান। পূর্ববঙ্গের চাষী মুসলমানদের কৃষি পণ্যের বিশেষ করে পাটের টাকায়ই স্ফীত হয়েছিল কলকাতা শহর। হিন্দু জমিদার মহাজন, বেনিয়ারা পূর্ববঙ্গ শোষণ করে কলকাতার নাগরিক কালচারের জন্ম দিয়েছিল। কলকাতাকে বাদ দিয়ে তাই একদিন বাংলাদেশের কথা চিন্তাই করা যেত না। সেই কলকাতা যখন বাংলার মুসলমানদের হাত ছাড়া হয়ে গেল তখন কায়েদে আযম আক্ষেপ করে বলেছিলেন- Like asking man to like without his heart. বাংলাদেশ আন্দোলনের সময় অনেককেই বলতে শুনেছি কায়েদে আযম নাকি ষড়যন্ত্র করে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বেশী দেওয়ার জন্য পূর্ব বঙ্গের মানুষদের সাথে প্রতারণা করে এই ভাগাভাগি মেনে নিয়েছিলেন। বাংলাদেশ আন্দোলনের সারথিদের মুখে যখনই এইসব কথা শুনতাম তখনই ভাবতাম যে মানুষটি ইচ্ছা করলে গান্ধীর প্রস্তাবিত যুক্তভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন শুধু এই শর্তে যে, ভারত ভাগ করা চলবেনা। তিনি কি কারণে বাংলার মাসুলমানদের এত বড় সর্বনাশ করতে যাবেন।

বাংলাকে অবিভক্ত রাখার জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম কংগ্রেসের শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশংকর রায় প্রমুখের সাথে একটি ঐকমত্যে পৌঁছেছিলেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন পাকিস্তানের বাইরে একটি স্বাধীন বাংলা নামের রাষ্ট্র গঠনের। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর এ প্রস্তাবে কায়েদে আযম সমর্থন দিয়েছিলেন। শরৎ বসু যখন এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

করার জন্য কংগ্রেস হাই কমান্ডের কাছে গেলেন তখন গান্ধী, নেহেরু, প্যাটেলের তীব্র বিরোধীতার মুখে সেদিন স্বাধীন অখন্ড বাংলার স্বপ্ন নস্যাৎ হয়ে যায়। বাংলায় নেহেরু প্যাটেলের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন উগ্র সাম্প্রদায়িক নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। ইতিহাসের এসব সত্য অস্বীকার করে যাঁরা বাংলাদেশ আন্দোলনের সময় কায়েদে আযমের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছিল আমার মনে হয় তাঁরা না বুঝে এটা করেনি। তৃতীয় একটি শক্তির ইন্ধনে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে একাজটি করেছিল। পাকিস্তান হওয়ার দিন মুর্শিদাবাদ ও মালদহে পাকিস্তানের পতাকা উড়েছিল। খুলনায় উড়েছিল কংগ্রেসের পতাকা। এ তিনটি জেলাই ছিল মুসলমান অধ্যুষিত। সবাই ভেবেছিল এ তিনটি অঞ্চল পাকিস্তানের ভিতর চলে আসবে। কিন্তু মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত তখন পর্বত প্রমাণ হয়ে উঠেছে। সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় মুসলমান নেতৃত্ব যতটুকু সম্ভব যুদ্ধ করে নিজেদের অধিকার আদায় করতে পেরেছিল মাত্র। একমাত্র খুলনাই পরবর্তীকালে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয়। খান আব্দুস সবুরের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে খুলনার মানুষ পাকিস্তানে যোগদানের জন্য সেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়। খান এ সবুর ছাড়া খুলনা পাকিস্তান অন্তর্ভূক্ত করণ সম্ভব হত না। বাউন্ডারী কমিশনের কাছ থেকে মালদহের শুধুমাত্র চাঁপাইনবাবগঞ্জ থানাটি পেয়েছিল পাকিস্তান। এর পিছনে ভূমিকা রেখেছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের অন্তর্গত মনাকষার জমিদার মুর্তজা রেজা চৌধুরী। পরবর্তীকালে মুর্তজা রেজা চৌধুরী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছিলেন। বাউন্ডারী কমিশনের সামনে চাঁপাইনবাবগঞ্জের দাবি তুলে ধরেন হামিদুল হক চৌধুরী।

বাংলার এককালের রাজধানী মুর্শিদাবাদ কিন্তু পাকিস্তানে আসেনি। আমার মনে হয় সেখানকার মুসলমান নেতৃত্ব সেরকম কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। এর একটা কারণও ছিল। ১৭৫৭ সালে সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর ইংরেজদের যত রকমের জুলুমবাজী এখানেই প্রথম আঘাত হানে। সে অত্যাচারের মুখে দাঁড়িয়ে মুসলমানরা প্রকৃত অর্থেই অসহায় হয়ে পড়ে। সাতচল্লিশ সালে এসেও তাদের অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এ সময় সিদ্ধান্ত হয় পুরো আসামকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সিলেটকে পাকিস্তানের সাথে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সুযোগ দেয়া হবে। তাও আবার রেফঅরেন্ডামের মাধ্যমে। এরকম আরকটি রেফারেন্ডামের ব্যবস্থা করা হয়েছিল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। আমরা তখন রেফারেন্ডামের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করি। মুসলিম ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সংগঠনের বিভিন্ন শাখার কর্মীরা সিলেটে

পাকিস্তানের জন্য একযোগে কাজ করবে। আমরা ঢাকা থেকে কয়েকটি গ্রুপ সিলেট পৌঁছাই। আমার সাথে হেকিম ইরতিজাউর রহমান, আলাউদ্দিন আহমেদ, শামসুল হুদা, সৈয়দ সাহেব আলম, কাজী আশরাফ উদ্দীন আহমদ, নুরুল ইসলাম, আব্দুর রহীম চৌধুরী, আলিমুল্লাহ, আবু সালেক, সুলতান হোসেন খান, খোরশেদ আলম চৌধুরী, কাজী আওলাদ হোসেন ছিলেন। ন্যাশনাল গার্ড স্কোর সালারে সিটির মোঃ সিরাজউদ্দিনের নেতৃত্বে একদল গার্ড কর্মী সিলেটে যান। নুরুল ইসলামও আমাদের সাথে ছিলেন। তিনি খুব ভাল গান গাইতেন। এ সময়ে একটি গানের দলই তৈরী করে ফেলেন এবং রেফারেন্ডামকে সামনে রেখে তিনি একটি গান রচনা করেছিলেন। সুরও তাঁর দেয়া। আমার মনে আছে সে গানের জোয়ারে পুরো সিলেটের মানুষ ভেসে গিয়েছিল। আমরা রাজনৈতিক শ্লোগান দিয়ে এবং মিটিং করেও যতখানি সফল হইনি এই গানের আবেদন হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী। গানের দু একটি কলি এখনও আমার মনে পড়েঃ

সিলেটবাসী মুসলমান
সবাই মিলে পাকিস্তান
পাকিস্তানে ভোট কর দান
তুমি কি ভুলিয়া গেছ
গৌড় গোবিন্দের হীন অত্যাচার
দুধের শিশু হত্যা করল
হাত কাটিল তার
বোরহানুনদ্দীনের রুহু কাঁদে
কাঁটিয়া সাফমাত্র
সোনার সিলেট যাব পাকিস্তান
তুমি কি ভুলিয়া গেছ
গৌড় গোবিন্দের হীন অত্যাচার
সিলেটবাসী মুসলমান
সবাই মিলে পাকিস্তান
পাকিস্তানে ভোট কর দান
শাহ জালালের পূণ্যভূমি
আজাদ কর মুসলিম তুমি
কুড়ালের বাক্সে ভোট দিয়ে ভাই
কোরানের ফরমান

সিলেটবাসী মুসলমান...

উল্লেখ্য কুড়াল ছিল পাকিস্তানের পক্ষের প্রতীক। নুরুল ইসলাম ১৯৫৩ সালে করাচীতে বিশ্ব মুসলিম যুব কংগ্রেসে কবি তালিম হোসেনের লেখা একটি গান গায়। সেটিও দারুণ হিট করেছিল। পাকিস্তানের পক্ষে জনমত সংগঠিত করবার জন্য চাটগাঁ থেকে ফজলুল কাদের চৌধুরী তাঁর এক বিরাট কর্মী বাহিনী নিয়ে সিলেট পৌঁছান। কলকাতা থেকে ন্যাশনাল গার্ডের সালার শেখ মুজিবও এক বিরাট দল নিয়ে রেফারেন্ডামের পক্ষে কাজ করতে আসেন।

মুসলিম লীগ ও মুসলিম ছাত্রলীগ নেতাদের মধ্যে সে সময় এক বিরাট সাড়া পড়েছিল। সিলেটকে যেভাবেই হোক পাকিস্তানে রাখতে হবে। এই রকম পণ করে তাঁরা সেদিন কাজ করেছিলেন।

আর যাঁরা এসেছিলেন তাঁর মধ্যে কুমিল্লার খান বাহাদুর আবিদুর রেজা চৌধুরী, মুফিজুদ্দীন আহমদ, টি আলী, ছাত্রনেতা শফিকুল ইসলাম, নুরুদ্দীন মোঃ আবাদ, নোয়াখালীর আব্দুল জব্বার খদ্দর, আজিজ আহমদ, রাজশাহীর মিরান আলী সরকার, বগুড়ার আব্দুল হামিদ খান, ফজলুল বারী, বি এম ইলিয়াস, রংপুরের মশিউর রহমান যাদু মিয়া, সাঈদুর রহমান, খুলনার আব্দুস সবুর খান, এ এম মজিদ, আদিল উদ্দিন আহমদ, বরিশালের আজিজুদ্দিন আহম্মদ, শমসের আলী, মহিউদ্দিন আহমদ, ম কাজী বাহাউদ্দিন আহমদ, আব্দুর রহমান চৌধুরী, পাবনার আব্দুল্লাহিল মাহমুদ, ফরিদপুরের ইউসুফ আলী চৌধুরী প্রমুখের কথা মনে পড়ছে।

সিলেটের মুসলিম নেতাদের মধ্যে যারা রেফারেন্ডামের জন্য কাজ করেছিলেন তাদের মধ্যে আব্দুল মতিন চৌধুরী, দেওয়ান আব্দুল বাছিত, মঈনুদ্দীন চৌধুরী, আজমল আলী, চৌধুরী মাহমুদ আলী, মোঃ আব্দুল্লাহ, শাহেদ আলী ও আব্দুল আজিজ অন্যতম। আব্দুল মতিন চৌধুরী ছিলেন আসাম মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক। মওলানা ভাষানী ছিলেন সভাপতি। আব্দুল মতিন চৌধুরী স্যার সাদুল্লাহ মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্যও হয়েছিলেন। আসামের মুসলিম লীগ সংগঠনেও তিনি রেখেছিলেন অসামান্য ভূমিকা। কায়েদে আযম তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। শোনা যায়, জিন্নাহ সাহেব যখন ভারতীয় রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে লন্ডনে চলে যান তখন লিয়াকত আলী খানের সাথে তিনিও লন্ডনে গিয়ে দেশের প্রয়োজনে তাঁকে ভারতে ফিরে আসার অনুরোধ করেছিলেন। তাঁদের কথায় উদ্বুদ্ধ

হয়েই পরবর্তীকালে কায়েদে আযম ফিরে আসেন। পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন।

সিলেটের ছাত্র নেতাদের মধ্যে জি এ খান, এ এন এম ইউসুফ, এটিএম মাসুদ আমাদের সাথে কাজ করছিল। মেয়েদের মধ্যে জরিনা রশীদ, হাজেরা খাতুন, সৈয়দা রোকেয়া প্রমুখ পাকিস্তানের দাবীকে এগিয়ে নিয়ে আসে। জরিনা রশীদ ছিল খাসিয়া। সে পরে মুসলমান হয় এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের এককালীন সচিব আব্দুর রশীদের সাথে তার বিয়ে হয়। সিলেটে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের ব্যাপক প্রভাব ছিল। কংগ্রেসের পক্ষে মওলানা হোসেন আহমদ মাদানী নিজে এসে নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছিলেন। তখন একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। যে সব জায়গায় জমিয়তের শক্ত ঘাঁটি ছিল সে সব স্থানে আমরা শাহ আজিজকে আরবী পোষাকে সজ্জিত করে নিয়ে যেতাম। তিনি এমনিতেই খুব ভাল আরবী জানতেন। আমরা জনসভায় তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিতাম ইবনে সউদের দূত হিসেবে তিনি এসেছেন। সৌদী বাদশাহর বাণী আপনাদেরকে তিনি শোনাতে চান।

শাহ আজিজ আরবীতে অনলবর্ষি বক্তৃতা দিয়ে যেতেন। আমাদের কেউ হয়ত দোভাষীর কাজ করত। এতে সাধারণ লোক ভাবত হেরেম শরীফের হেফাজতের দায়িত্ব পালনরত বাদশাহ সউদের প্রতিনিধি যদি পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিতে বলেন তাহলে সে কথা একেবারে ফেলে দেয়া যায় না।

নিম্ন বর্ণের হিন্দু এলাকাগুলোতে আমরা রসরাজ মন্ডলকে সাথে নিয়ে যেতাম। এদের নেতা ছিল যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল। যোগেন্দ্রনাথ পরে কায়েদে আযমের ইচ্ছায় অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্য হয়েছিলেন ও পরবর্তীকালে পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী হিসেবে সুদীর্ঘ সময় কাজ করেছেন। পাকিস্তানের নির্বাচনী প্রচারের সময় যোগেন্দ্রনাথ কি কারণে আসতে পারেননি তা জানা নেই। তখন আমরা রসরাজ মন্ডলকে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল বলে পরিচয় করিয়ে বহু জনসভা করেছি। রসরাজ মন্ডল পরে পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী হয়েছিলেন।

আমরা একবার রেফারেন্ডামের পক্ষে কাজ করার জন্য করিমগঞ্জ গিয়েছিলাম। করিমগঞ্জে ছিল জমিয়তের শক্ত ঘাঁটি। বাসে করে যাওয়ার সময় কুমিল্লার আজিজুর রহমান আহত হন। তিনি পরে পাকিস্তানের গণপরিষদ সদস্য হয়েছিলেন। মনে আছে তিনি হাত বের করে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন হঠাৎ করে উল্টো দিক থেকে একটা বাস এসে তার হাতটা উড়িয়ে নিয়ে যায়। ব্যথায় তিনি ছটফট করছিলেন। তিনি চিৎকার করে বলছিলেন আমার স্ত্রীকে এনে দাও। করিমগঞ্জে

এসে তাড়াতাড়ি করে আমরা আজিজুর রহমানকে হাসপাতালে ভর্তি করি। অন্যদিকে তার স্ত্রীকেও খবর পাঠানো হয়। হাসপাতালে আজিজুর রহমানকে রেখে আমরা বেড়িয়ে পড়ি জনসভার উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে ফেরার পথে নদীর ঘাটে জমিয়তের কর্মীদের সাথে আমাদের দেখা হয়ে যায়। ওরা উল্টো দিক থেকে আসছিল। কথায় কথায় শুরু হয়ে যায় সংঘর্ষ। নদীর ঘাটে ছিল পাথর। সেদিন সে পাথরের ব্যবহার হয়েছিল পর্যাপ্ত। হতাহতের সংখ্যাও মন্দ ছিল না। জমিয়তের তিনজন কর্মী নিহত হন। আমাদের গাড়ির ড্রাইভারের মাথায় এসে পড়ে এক বড় পাথর। মাথা ফেটে প্রচুর রক্তরক্ষণ হয়ে ড্রাইভার মারা যান। পরদিন কংগ্রেস সমর্থক পত্রিকাগুলো লেখে মুসলিম লীগ গুন্ডাদের হাতে তিনজন মওলানা নিহত।

গাড়ীর ড্রাইভারের মৃত্যুতে আমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি। আমাদের এক বন্ধু কাজী আশরাফ উদ্দীন আহমদ ড্রাইভিং জানতেন। তিনি এই বিপদে হাল ধরেন। ড্রাইভারের লাশসহ বাসে করে আমরা সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা দেই। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। এমনিতে তখন বর্ষাকাল। রাস্তার দুধারে অথৈ পানি। হঠাৎ দেখি আমাদের পিছনে দুটি জীপ ছুটে আসছে। আমরা মনে মনে ভীত হয়ে পড়েছিলাম। কেননা, মারামারির ঘটনাটি নিশ্চয় এতক্ষণে প্রশাসনের কানে পৌঁছে গেছে। ভেবেছিলাম আমাদের ধরার জন্য হয়ত কোন ফোর্স আমাদেরকে অনুসরণ করছে। আমরা তখন তাড়াতাড়ি করে লাশ রাস্তার এক পাশে রেখে পানিতে ঝাঁপ দিলাম। চারপাশের কিছুই জানি না। পানির গভীরতা কত তাও বুঝতে পারছিলাম না। শুধু ভেসে থেকে সবকিছু বোঝার চেষ্টা করেছিলাম। দেখি জীপ দুটো বাসের পাশ দিয়ে দ্রুত চলে গেলো। তখন নিশ্চিত হলাম আমরা বিপদমুক্ত। একে একে পানি থেকে উঠে এসে ভেজা কাপড় নিয়েই বাসে চড়ে বসলাম। ঐ অবস্থায় বাস চলল। সেদিন আমরা সিলেট পৌঁছেছিলাম রাত তিনটায়। সিলেটে এসেই আমরা হবিবুল্লাহ বাহারকে পুরো ঘটনা খুলে বলি। বাহার ঐ রাতেই লাশ দাফন করে ফেলার কথা বললেন। আমরা তাঁর কথা মত কাজ করলাম। বাহার ভেবেছিলেন লাশ দীর্ঘক্ষণ রেখে দেওয়ার অর্থ শুধু শুধু আইনগত ঝামেলায় আটকে যাওয়া। তাছাড়া আমাদের একটা রাজনৈতিক ইমেজেরও ব্যাপার ছিল।

সিলেটে বাহার আমাদের সার্বক্ষণিক দেখাশোনার দায়িত্ব নেন। হবিবুল্লাহ বাহার ছিলেন একাধারে রাজনীতিবিদ, খেলোয়াড় এবং সুসাহিত্যিক।

কলকাতা থেকে তিনি তাঁর বোন শামসুন্নাহার মাহমুদের সাথে যৌথভাবে বের করেছিলেন বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা ‘বুলবুল’। ‘বুলবুল’ পত্রিকা হিসেবে

সেকালে খুব নাম করেছিল। এ দুই ভাইবোনের উদ্দেশ্যেই কবি নজরুল ইসলাম উৎসর্গ করেছিলেন তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ চক্রবাক।

পাকিস্তান হওয়ার পর বাহার পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হন। মন্ত্রী হিসেবে তাঁর এক বিরাট সাফল্য ছিল তিনি ঢাকা থেকে মশা নির্মূল করেছিলেন। আমার মনে হয় এ কাজে তাঁর আগে ও পরে কেউই এরকম কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি।

বাহারের মন্ত্রীত্ব থেকে বিদায়ের পর ঢাকায় আবার মশার প্রাদুর্ভাব হয়। এ নিয়ে তখন পত্র- পত্রিকায় খুব লেখালেখি হয়েছিল। কিন্তু মশা নির্মূলে কেউ কোন ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসেনি। তখন একটি পত্রিকায় বিখ্যাত চিত্রনায়িকা বৈজয়ন্তীমালার গানের একটি কলি তুলে দিয়ে ঢাকার মশা যাচ্ছে না কেন তার উত্তরে প্যারডি করে লিখেছিল 'হামছে না পুছ, পুছ বাহারছে'।

অনেকেই জানেন না ঢাকা বারডেম হাসপাতাল গড়ার পিছনে ডা. ইব্রাহিমকে বাহারই অনুপ্রেরণার পাশাপাশি সহযোগিতা যুগিয়েছিলেন। ডা. ইব্রাহিম তখন এম আর সি পি করে সদ্য বৃটেন থেকে ফিরেছেন। বারডেম হাসপাতাল সে সময় শুরু হয়েছিল সেগুন বাগিচায়।

পাকিস্তান হওয়ার পর হিন্দুস্থান থেকে নুরজাহান থিয়েটারস নামে একটি নাট্যদল ঢাকায় আসে। আজকের ন্যাশনাশ হাসপাতাল যেখানে সেকালে এখানে ছিল একটা খোলা ময়দান। নাট্যদল সেখানেই অভিনয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। অভিনয়ের কথা শুনে পুরোনো ঢাকার লোকজন ভীষণ খেপে যায়। তারা এসব অভিনয়কে অনৈসলামী কার্যকলাপ বলে নাট্যস্থলের সবকিছু ভেঙ্গে চুরে দেয়। তখন নাট্যকর্মীরা আমার কাছে এলে আমি ঘটনা বাহারকে খুলে বলি। আগে থেকেই জানতাম তিনি সংস্কৃতিমনা। সবকিছু শুনে তিনি বললেন নাট্যদলকে বলো সবকিছু পুনরায় আয়োজন করতে। আমি উদ্বোধন করব।

পুরানো ঢাকার লোকজনের উপর বাহারের একটা প্রভাব ছিল। আর তাই বাহার উদ্বোধন করার সময় আর কোন গন্ডগোল হয়নি। পরবর্তীকালে বাহার বুলবুল একাডেমী প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

এই নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার খবরটা কেমন করে যেন কবি জসীম উদ্দীনের কানে পৌঁছে। তিনি আমার সাথে দেখা করে তাঁর 'বেদের মেয়ে' নাটকটা মঞ্চস্থ করার অনুরোধ করেন। আমরা তাঁর অনুরোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পেরেছিলাম।

বাহার যখন দেখলেন করিমগঞ্জে এরকম ঘটনা ঘটিয়ে আমরা ফিরে এসেছি তখন তিনি আমাদের দুটো বাস ভর্তি করে শিলং এর দিকে পাঠিয়ে

দিলেন। যাতে আর কোন রকম অসুবিধা না হয়। আমরা শুনেছিলাম শিলং প্রবাসী সিলেটের বহু মুসলমান ভোটারদের আটকিয়ে রাখা হয়েছে- যাতে তারা নির্বাচনে তাদের মতামত না দিতে পারে। রেফারেন্ডাম কমিটি আমাদের পাঠিয়েছিলেন তাদের সিলেটে আনার বন্দোবস্ত করতে। শিলং শহরটা পাহাড়ের উপর অবস্থিত। অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্য আর মনোরম আবহাওয়া এর চারিদিকে বিরাজ করছে। পাহাড়ের উপর দিয়ে রাস্তা। এত সরু যে দুটো বাস পাশাপাশি আসা যাওয়া করতে পারে না। আমরা সেই রাস্তা ধরে শিলং এর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। রাস্তার মাঝামাঝি পেনিনসুলা নামের একটা জায়গা আছে। একটা বাজার। এখানেই বাসগুলো একে অপরকে ক্রস করে। পেনিনসুলা এলাকাটা হচ্ছে চেরাপুঞ্জী অঞ্চলের ভিতরে। যেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। পেনিনসুলার দেখলাম খাসিয়াদের বাস। এদের গায়ের রং খুব সুন্দর। খাসিয়ারা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাস করে। বাড়ির বাইরে মেয়েরাই সব কাজকর্ম করে। দেখলাম তারা দোকানদারীও করছে। পরে শিলং এ যেয়েও দেখি তাদের একই অবস্থা। খাসিয়া পুরুষরা ঘরের ভেতরে থাকে।

শিলং- এ দৈনিক আজাদের রিপোর্টার জিলানীর সাথে আমরা দেখা করি। জিলানীর বাড়ি ছিল মালদায়। সেই আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। আসামে তখন বরদলাই সরকার ক্ষমতায়। কংগ্রেসের মাসলম্যানরাই মুসলমানদের সিলেটে যেতে বাধা দিচ্ছিল। বাস সার্ভিস বন্ধ করে দিয়েছিল যাতে মুসলমানরা সিলেটে না যেতে পারে।

জিলানী আমাদের নিয়ে যায় মুসলিম লীগ নেতা আসামের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী স্যার সাদুল্লাহর কাছে। আমরা রেফারেন্ডাম কমিটির পক্ষ থেকে এসেছি শুনে তিনি ইংরেজীতে বললেন, I will give you all co-operation. শিলং- এর মুসলমানদের সিলেট যেতে যেন কোন অসুবিধা না হয়, তিনি প্রশাসনের সাথে আলাপ করে তার ব্যবস্থা করেন। এ সময় আবুল হাসানাত বজলুর রশীদ বলে শিলং- এর একজন মুসলমান ব্যবসায়ী আমাদের অনেক সহযোগিতা করেছিলেন।

রেফারেন্ডামের মাধ্যমে সিলেটের মুসলমানরা পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে রায় দেয়। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ কিন্তু এই গণদাবীকেও উপেক্ষা করেছিল। করিমগঞ্জ মহকুমাকে কেটে সেদিন বাকী আসামের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছিল।

৫

১৪ই আগষ্ট, ১৯৪৭। অনেক ত্যাগ অনেক রক্ত আর অনেক সংগ্রামের পথ ধরে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান করে নিল পাকিস্তান। সেদিন আমার মনে হয়েছিল কত পথ অতিক্রম করে, কত আঁধার রাতের সীমানা পেরিয়ে, কত তিতুমীরের শাহাদাত, কত ফকীর মজনু ও শমশের গাজীর সংগ্রাম... ১৮৫৭ সালের আজাদী আন্দোলন, জাস্টিস আমীর আলী ও নওয়াব আব্দুল লতীফের বুদ্ধিবৃত্তিক সাধনা; খেলাফত আন্দোলনের পথ ধরে অবশেষে মুসলিম হোমল্যান্ডের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল। আমরা পেলাম আজাদ ওয়াতান, স্বাধীন পাকিস্তান। ১৪ই আগস্টের ক'দিন পূর্বেই আমি আর সালাউদ্দিন র‍্যাংকিন স্ট্রীটের মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর বিসি নান নামের দোকান থেকে কাপড় কিনে পাকিস্তানের পতাকা বানানো শুরু করি এবং বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করি যাতে ১৪ই আগষ্ট সকালের মধ্যে পুরো ঢাকা পাকিস্তানের পতাকায় পতাকায় সুশোভিত হয়।

মনে আছে লালবাগ কেল্লার ভিতর খাজা নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। তিনি ফজরের নামাজের পর পরই কেল্লার চত্বরে লোকজন পরিবেষ্টিত হয়ে চলে আসেন। কিন্তু তখন তাঁকে গার্ড অব অনার দেয়া, ব্যান্ড বাজানো ইত্যাদি নিয়ে বেশ সমস্যা দেখা দিয়েছিল- এসব কাজ করত পুলিশ বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর সদস্যরা। এদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু। তারা সবাই হিন্দুস্তান চলে যায়। এ পরিস্থিতিতে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের তরুণ সদস্যরা এগিয়ে আসে। ন্যাশনাল গার্ডের ঢাকার সালারে সিটি সিরাজদ্দীন এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

তখনও পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা নির্দিষ্ট হয়নি। ১৪ই আগষ্ট সকালে মুসলিম লীগের পতাকাকেই জাতীয় পতাকার সম্মান দেয়া হয়। ঢাকায় তখন একটি প্রদেশের রাজধানী হওয়ার মত কোন সুযোগ সুবিধা ছিল না। পুরো পূর্ব পাকিস্তানে উল্লেখ করার মত ছিল না তেমন কোন শহর। ঢাকার লোক সংখ্যা ছিল সর্বসাকুল্যে এক লক্ষ্যের কাছাকাছি। থানা ছিল মাত্র তিনটি। ওয়ার্ড ছিল ৭টি। পূর্ব পাকিস্তান হওয়ার পর ঢাকার ডিসি হন এস রহমতুল্লাহ, আইসিএস।

নতুন রাজধানীর সচিবালয়, প্রশাসন যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার মত কোন বিল্ডিং পাওয়া যায়নি। টিনশেডের অস্থায়ী আশ্রয়ে দিনের পর দিন প্রশাসনের কাজ চালাতে হয়েছে।

বহুদিন ধরে পূর্ব পাকিস্তানের সংসদ ভবন হিসেবে ঢাকা ইউনিভার্সিটির জগন্নাথ হলের একাংশ ব্যবহার করা হত। মুখ্যমন্ত্রী থাকতেন বর্তমান হাউজে বর্তমানে যা বাংলা একাডেমীর অংশ।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসন যন্ত্র গড়ে তুলবার মত কোন সুদক্ষ অফিসারও বহুদিন পাওয়া যায়নি। হিন্দু অফিসাররা চলে যাওয়ার ফলে যে শূণ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল রাতারাতি ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে মুসলমান তরুণদের চাকুরী দিয়ে তা পূরণ করতে হয়েছিল।

বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে কোন পাস করা আইসিএস অফিসার ছিল না। অন্যান্য সার্ভিসেও ছিল মুসলমানদের একই অবস্থা। এ অবস্থায় একটা দেশ পরিচালনা করা সহজ কথা ছিল না। শুধুমাত্র নৈতিক শক্তির উপর নির্ভর করে মুসলিম লীগ নেতারা পাকিস্তানের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আমার মনে আছে তখন কিছু অবাঙ্গালী মুসলিম অফিসার এসে পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসন যন্ত্র গড়ে তোলেন। পুলিশ সার্ভিস ও রেলওয়ে সার্ভিস গড়ে তোলার পিছনেও তাদের অবদান ছিল সমধিক। বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে সে সময় তেমন কোন ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি শ্রেণী গড়ে ওঠেনি। আদমজী, ইস্পাহানী, বাওয়ানীরাই তখন এদেশে এসে প্রথম শিল্পায়নের অবকাঠামো গড়ে তোলে।

নতুন প্রদেশে আরও একটি সমস্যা দেখা দিল। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে তখন চলছিল ইতিহাসের বীভৎসতম মুসলিম নিধন। সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের হাতে যে কত মুসলমান নর- নারীর জীবন প্রদীপ নিভে গিয়েছিল তার কোন সীমা সংখ্যা নেই। হিন্দুদের ভয়ে তখন হাজার হাজার অসহায় নিঃস্ব মুহাজির ভারত থেকে এসে ঢাকা শহর ছেয়ে ফেলেছিল। এভাবে মুসলমানদের ভিটেমাটি ছাড়া করে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিয়ে হিন্দু ভারত আরও একটি উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চেয়েছিল। যাতে নতুন প্রদেশের দুর্বল ও নড়বড়ে প্রশাসন মুহাজির সমস্যা মোকাবেলা করতে গিয়ে অচল হয়ে পড়ে।

ফুলবাড়ীয়া রেলস্টেশন তখন মুহাজির আর মুহাজিরে পূর্ণ হয়ে থাকত। আমরা মুসলিম লীগ কর্মীরা এই সব অসহায় বনি আদমকে আশ্রয় দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগলাম। ঢাকার প্রায় প্রত্যেকটা স্কুল তখন রিকুইজিশন করা হল এদের আশ্রয় দেবার জন্য। বিভিন্ন পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়িতেও তাদের জন্য জায়গা করা হল। আমরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে এদের জন্য চাঁদা তুলতাম। খাবারের ব্যবস্থা করতাম। আমার উপর নাজিমুদ্দীন সাহেবের নির্দেশ ছিল রিফিউজী ক্যাম্পগুলো তত্ত্বাবধান করার।

আসলে এসব মুহাজিররা পাকিস্তানের জন্য সবকিছু হারিয়েছিল। বলতে দ্বিধা নেই, সেদিন পাকিস্তানকে ভালবেসেই তারা এখানে তাদের নতুন আশ্রয় নির্মাণ করতে চেয়েছিল। এসব মুহাজিরের একটা বিরাট অংশই ছিল উর্দূভাষী। কিন্তু ভাষাটা তখন আমাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়নি। কেননা পাকিস্তান হয়েছিল মুসলিম জাতিসত্ত্বার উপর ভিত্তি করে। তাই তাদের আমরা আপন করে নিতে পেরেছিলাম।

তখন পুরাতন হাইকোর্ট বিল্ডিংয়ে পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের কাজ শুরু হয়। বিল্ডিং এর শীর্ষে যে বিরাট পাকিস্তানী পতাকা উড়ত- আমি দেখেছি এইসব মুহাজির প্রত্যেকদিন সকালে গিয়ে ঐ পতাকাকে সালাম করত অনেকক্ষণ ধরে।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দীন। অত্যন্ত সৎ ও ধার্মিক হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল। খাজা নাজিমুদ্দীন ছিলেন ঢাকার নওয়াব পরিবারের সন্তান। আত্মীয়তা সূত্রে নওয়াব সলিমুল্লাহর ভাগ্নে। উচ্চ শিক্ষা পেয়েছিলেন বৃটেনে।

এত বড় ভূস্বামী ঘরের সন্তান হয়েও তিনি জনসাধারণের কাতারে নেমে এসেছিলেন এবং তাদের কল্যাণের জন্য আজীবন রাজনীতি করে গেছেন। তাঁরই উদ্যোগে বাংলার কৃষককে বাঁচানোর জন্য যুক্তবঙ্গে ঋণ শালিসী বিল পাস হয়েছিল। বাংলার মুসলমান জাগরণে ঢাকার নওয়াব পরিবারের মধ্যে নওয়াব সলিমুল্লাহর পর তাঁরই অবদান সমধিক। খাজা নাজিমুদ্দীন শেরে বাংলার পর যুক্তবঙ্গের মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী হন। কর্মীদের প্রতি নাজিমুদ্দীন সাহেবের নজর ছিল খুব তীক্ষ্ণ। তাদের ভালমন্দের সব কিছুই তিনি খবর রাখার চেষ্টা করতেন। পাকিস্তান হবার পর আমার আব্বাকে একবার ঢাকা থেকে বদলী করে খুলনার এডিএম হিসেবে পাঠান হয়। এর পিছনে একটা কারণ ছিল। কাদের সর্দার নামে পুরনো ঢাকার একজন শক্তিশালী পঞ্চায়েত নেতাকে ঢাকার নওয়াবরা পুরনো শত্রুতার জের ধরে মামলা দিয়ে জেলে পাঠায়। এই কাদের সর্দার ছিলেন ফজলুল হকের গুণমুগ্ধ। তাঁর জামিনের জন্য স্বয়ং ফজলুল হক এসে আমার আব্বাকে অনুরোধ করেন। তাছাড়া কেসটা জামিনযোগ্যও ছিল। তিনি সেই হিসেবে কাদের সর্দারকে জামিন দিয়ে দেন। কিন্তু নওয়াবরা আমার আব্বার উপর ভীষণ চটে যান। তাঁরা খাজা নাজিমুদ্দীনকে প্রভাবিত করে আমার আব্বার বদলীর আয়োজন করেন। নাজিমুদ্দীন সাহেবের নিরেট সরলতার জন্য এটা সম্ভব হয়েছিল।

আমি বাসায় এসে রাত্রিতে এ ঘটনা শুনি। পরদিন সকালে আবু সালেককে সাথে করে সরাসরি বিমানবন্দরে চলে যাই। নাজিমুদ্দীন সাহেব তখন রাষ্ট্রীয় কাজে করাচী যাচ্ছিলেন।

আমি সোজা তাঁর কাছে গিয়ে সালাম দিয়ে বিনীত কণ্ঠে বললাম, 'স্যার, মাইনে সুনা হ্যায় কে মেরে ওয়ালিদ সাহাবকো ট্রান্সফার কর দিয়া গিয়া, কিয়া ইয়ে সাচ হ্যায়'?

তিনি অকপট সরলতার সাথে জবাব দিলেন, 'দেখো ইব্রাহিম, সৈয়দ সেলিম, সৈয়দ সাহেবে আলম আউর হাবিবুর রহমান হেকিম সাহেব মেরে পাস আয়েথে তুমহারা ওয়ালিদ সাহাবকা খেলাফ শেকায়েত লেকরকে, উনুহনে কাদের সর্দার জিনকো এরেস্ট কিয়া গিয়া থা উনকো জামানত দে দি।' আমি কিছুমাত্র দমে না গিয়ে বললাম, 'স্যার, হাকিকত ইয়ে হ্যায় কে শের- ই- বাঙ্গাল খুদ হামারা ঘর তশরিফ লায়ে আউর ইস সিলসিলামে মেরে ওয়ালিদ সাহেব ছে বাত কি। কিউ কে ইয়ে বেলয়্যাবল (Bel-able) কেস থা ইস লিয়ে কাদের সর্দারকো জামানত মিলি'।

মনে হল নাজিমুদ্দীন সাহেব ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন। একটা সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে একজন সরকারী অফিসারকে বদলি করা যে ঠিক নয়, তা তাঁর পরবর্তী একশন থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়।

তখন হোম সেক্রেটারী ছিলেন এস এন বাকের। নাজিমুদ্দীন সাহেবের পিছনে তখন তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি করে তিনি তাঁকে বললেন- Baker, Please withheld transfer of Mr. Hussain, till I come back from Karachi. তখনকার মত আব্বার সমস্যা কেটে যায়। পরবর্তীতে আব্বা আরও তিন বছর ঢাকায় কাটান। নুরুল আমীন যখন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তখন তিনি কুমিল্লার ডিএম হিসেবে বদলি হন। কুমিল্লার ডিএম দেহলভী ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হওয়ায় ঐ পদটি শূণ্য হয়। নাজিমুদ্দীন সাহেবের সততা ও নির্লোভ চারিত্রিক বৈশিষ্ট ছিল প্রায় প্রবাদতুল্য। একটা ঘটনা মনে পড়ছে। প্রদেশের প্রশাসন তখন আমদানী- রফতানীর জন্য কিছু লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আমার মনে আছে অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানও তখন আমদানী- রফতানী লাইসেন্স ব্যাপারটা কি তা বুঝে উঠতেন না। আসলে আমদানী- রপ্তানীর জন্য যে ব্যবসায়ী শ্রেণী গড়ে ওঠা প্রয়োজন তা তখনও পূর্ব পাকিস্তানে ছিল না বললেই চলে। বৃটিশের বৈরী শাসন ও জুলুমের ফলে মুসলমানদের মধ্যে অবশ্য সেরকম কোন ব্যবসায়ী শ্রেণী গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। আমদানী- রফতানী ব্যবসাটা ছিল

পুরো হিন্দুদের কব্জায়। পাকিস্তান হবার পর এ অবস্থা বদলাতে শুরু করে। প্রথম দিকে অনেক বাঙ্গালী মুসলমান ব্যবসা না বুঝে ওঠার কারণে লাইসেন্সগুলো পূর্ব পাকিস্তানে আগত অবাঙ্গালী মুসলমান ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিতেন। লাইসেন্স কেনাবেচা করে অনেকে তখন বিস্তার অর্থ উপার্জন করেছেন।

মোহন মিয়া তখন প্রদেশ মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক। আমরা কয়েকজন মিলে তাঁর কাছে একদিন গেলাম কিছু ব্যবসায়িক সুবিধা পাওয়ার আশায়। তিনি আমাদের নিয়ে নাজিমুদ্দীন সাহেবের কাছে গেলেন। মোহন মিয়া খোলাখুলিভাবে তাঁকে বললেন, এসব ছেলেরা পাকিস্তান আন্দোলন করেছে। আন্দোলনের জন্য তাদের কেরিয়ারও অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এখন সময় এসেছে এদের জন্য আমাদের কিছু করার। আমরা যদি এদের লাইসেন্স ইস্যু করি তবে এরা তা বেঁচে কিছু উপার্জন করতে পারবে।

নাজিমুদ্দীন সাহেব সব শুনে বেশ কঠোর কন্ঠেই বললেন, 'হাম ইয়ে লোগোকো কাভি লাইসেন্স নেহি দেয়েঙ্গে। জো সহিমানোমে বিজনেস করতে হ্যায় স্রেফ উনহি লোগোকো লাইসেন্স মিলেগা। পলেটিক্যাল ওয়ার্ককারসকো লাইসেন্স দেনেকা মতবল হোগা কে উনহে চোর ও বদমাশ বানায়া যায়ে। হাম ইনহে বরবাদ করনা নেহি চাহতে হ্যায়। আগর ইয়ে সারকারী নকরী করনা চাহতে হ্যায় হাম নকরীকা বন্দোবস্ত কর দেয়েঙ্গে। হাম জানতে হ্যায় কে ইয়ে লোগ পাকিস্তানকো লিয়ে বহুত কাম কিয়া, মুসলিম লীগকে কহনে পর কোরবানী দি। হাম ইনকো ইজ্জত করতে হ্যায়। ইয়ে হামারা কউমকা সরমায়া হ্যায়'।

তারপর তিনি মোহন মিয়াকে বললেন কর্মীদের একটি লিস্ট দিতে। এ লিস্টে আমার সাথে শফিকুল ইসলাম, শফিকুর রহমান, মুজিবর রহমান, আবু সালেক, সুলতান হোসেন খান, আলাউদ্দিন আহমদ, আফজাল হোসেন, আতাউল হক খান, কাজী আওলাদ হোসেনের নাম ছিল। হামিদুল হক চৌধুরী তখন অর্থমন্ত্রী। নাজিমুদ্দীন তাঁকে ডেকে আমাদের কয়েকজনের চাকুরির ব্যবস্থা করে দিতে বলেন। আমাদের চাকুরী হয়ে যায়। পরদিন দৈনিক আজাদে বড় হেডিংয়ে লেখা হয় "কওমের খেদমতের এনাম স্বরূপ উচ্চ বেতনের গেজেটেড চাকরী"।

আমাকে ও আলাউদ্দিন আহমদকে দেয়া হয় কৃষি দফতরে। শফিকুর রহমান ও মুজিবর রহমানকে দেয়া হয় ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে। আবু সালেক, সুলতান হোসেন খান, আফজাল হোসেন, কাজী আওলাদ হোসেন চাকরী পান তথ্য মন্ত্রণালয়ে এবং শফিকুল ইসলাম ও আতাউল হক খান যান খাদ্য বিভাগে।

আমরা কেউই দীর্ঘদিন চাকরিতে টিকে থাকতে পারিনি। এক দেড় বছরের মধ্যেই সবাই চাকরী ছেড়ে দেন। শুধুমাত্র আফজাল হোসেনই চাকরীতে থেকে যান।

নাজিমুদ্দীন সাহেবের আচার ব্যবহার ছিল আদর্শ স্থানীয়। তাঁম মত শরীফ মানুষ আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। যখনই তাঁর বাসায় গিয়েছি তখনই তিনি আমাদের নিজ হাতে আপ্যায়ন করেছেন। সব সময় তিনি মুসলিম লীগ কর্মীদের ইসলামী জিন্দেগী অনুসরণ করতে বলতেন। বিশেষ করে আমাদের তিনি বলতেন নিয়মিত নামাজ পড়তে। নামাজের ওয়াক্ত হলে তিনি এর কাজ বাদ দিয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। তিনি তাহাজ্জুদ গোজারও ছিলেন।

১৯৪৮ সালে কায়েদে আযম ঢাকায় আসেন। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হিসেবে এটিই ছিল তার প্রথম ঢাকা সফর। এটা তাঁর শেষ সফরও ছিল। কারণ করাচী ফিরে গিয়ে তিনি আর বেশীদিন হায়াত পাননি।

আমি তখন ঢাকা মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি। জিন্নাহ সাহেব ঢাকা আসবেন শুনে আমাদের সবার মন আনন্দে নেচে ওঠে।

যে নেতার কথায় পাকিস্তান আন্দোলন করেছি, যাঁর অসাধারণ নেতৃত্বের সামনে কংগ্রেসের জাঁদরেল নেতারা ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ পর্যন্ত পাকিস্তান দাবী কবুল করতে বাধ্য হয়েছিল, যাঁর অসাধারণ বলিষ্ঠতার মুখে উপমহাদেশের কোটি কোটি মুসলমান পেয়েছিল তাঁদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি, তিনি এলে আমাদের মনের অনুভূতি যে এমনিতেই উল্লাসমুখর হয়ে উঠবে তাতো স্বাভাবিক। আমার মনে আছে বিভিন্ন সুযোগে আমি তাঁর সাথে ৭ বার হাত মিলিয়েছিলাম। আমরা মনে করতাম তাঁর মত মানুষের সাথে হাত মিলাতে পারাটা রীতিমত একটা গৌরবের ব্যাপার। ইতিহাসের এই অধ্যায়টি পুরোপুরি না জানলে আমাদের এই মানসিক অবস্থাটা কেউ ধরতে পারবে না।

কায়েদে আযমের ঢাকা সফর পুরোপুরি সফল করবার জন্য আমরা সর্বাত্মক সাংগঠনিক তৎপরতা শুরি করি। ঢাকার নওয়াব হাবিবুল্লাহকে সভাপতি করে একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়। নওয়াব সাহেব তখন মুসলিম লীগে পুনরায় ফিরে এসেছেন। আমি অভ্যর্থনা কমিটির প্রচার সম্পাদক। আমার মনে আছে সমগ্র প্রদেশে তখন কয়েক লক্ষ পোষ্টার ও লিফলেট বিলি করা হয়েছিল আমার নামেই। এয়ারফোর্সের দুটো ছোট বিমানে করে আমি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচারপত্র ছড়িয়েছিলাম।

কিছু প্রচারপত্র ঢাকা কোর্ট বিল্ডিং-এর উপরে এসে পড়ে। তখন আদালতের অধঃস্তন কেরানীরা সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আমার আব্বার কাছে পৌঁছে দেয়ার সময় বলেছিল আপনার ছেলের নামেই এতসব কান্ডকারখানা চলছে। আব্বা বোধ হয় খুশিই হয়েছিলেন। কায়েদে আযম যেদিন আসেন সেদিন ঢাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল। তেজগাঁও থেকে ঢাকার রাস্তায় দু'ধারে অসংখ্য লোক দাঁড়িয়েছিল কায়েদে আযমকে দেখার জন্য। তিনি ঢাকায় এসে মিন্টু রোডের একটা বাড়ীতে ওঠেন। পরবর্তীকালে আইয়ুব খান এটির বহু সংস্কার করে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন বানিয়েছিলেন।

আমরা বিমান বন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়েছিলাম। 'মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ' 'কায়েদে আযম জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে পুরো ঢাকা সেদিন প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল। রেসকোর্স ময়দানে কায়েদে আযম প্রথম জনসভা করেন। অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষ থেকে বিরাট প্যান্ডেল সাজানো হয়েছিল। সুদৃশ্য ডায়াস তৈরী করা হয়েছিল। কায়েদে আযম বক্তৃতা দেন বিকালের দিকে। সকাল থেকেই দূর-দূরান্ত থেকে সর্বস্তরের হাজার হাজার লোক জনসভা স্থলে জমায়েত হতে থাকে। আমার কাছে মনে হল বিরাট এক জনসমুদ্র। আসলে কায়েদে আযম তখন মুসলমানদের জন্য একটি গৌরবের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের সব জেলা থেকে প্রবীণ ও নবীন সব মুসলিম লীগ নেতাই কায়েদে আযমের জনসভায় হাজির হয়েছিলেন। সংবর্ধনা কমিটির পক্ষ থেকে আব্বাস উদ্দিন ও কবি গোলাম মোস্তফা কায়েদে আযমকে অভিনন্দন জানিয়ে গান গেয়েছিলেন।

তখন ছিল গরম কাল। মুসলিম লীগ কর্মীরা হাজার হাজার মাটির কলস ভর্তি পানি তৃষ্ণার্ত শ্রোতাদের পান করিয়েছিলেন।

ঢাকায় অবস্থানকালে কায়েদে আযম পল্টন ময়দানে মুসলিম লীগ কর্মী সমাবেশে ভাষণ দিয়েছিলেন। এছাড়া কার্জন হলে ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এবং ঢাকা ক্লাবের একটি অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেন। রেসকোর্স ময়দানে এবং সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার উপর সুস্পষ্ট বক্তব্য দেন। তিনি উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করবার পক্ষেও যুক্তি প্রদর্শন করেন।

প্রকৃতপক্ষে উর্দু পাকিস্তানের কোন প্রাদেশিক ভাষা ছিল না। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের কোন প্রদেশেই উর্দুর ব্যবহার হত না। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোতে নিজস্ব ভাষা প্রচলিত ছিল। জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ থাকবার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়ে কোন নির্দিষ্ট প্রাদেশিক ভাষার স্থলে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করবার কথা কায়েদে আযম ভেবেছিলেন।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত অনেকেই পরবর্তীকালে দাবি করেছেন কায়েদে আযমের ভাষণের একটি কথিত উক্তি Urdu and Urdu shall be the state language of Pakistan. উচ্চারণ করার সময় তারা নাকি No No বলে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এটা একটা স্রেফ মিথ্যাচার এবং গালগল্প মাত্র। তাঁরা মনে করেছিলেন মিথ্যা বলে তাঁরা গৌরবের অধিকারী হবেন। এটাকেই বলা যায় ইতিহাসের চুরি। এই গৌরব দাবীকারীদের মধ্যে নাইমুদ্দীন, তোয়াহা, আজিজ আহমেদ প্রমুখের কথা শুনেছি।

রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসভায় কায়েদে আযমের ভাষণের প্রতিবাদ করতে যাওয়া ছিল রীতিমত কল্পনাতীত ব্যাপার। তখন কায়েদে আযমের যে বিপুল জনপ্রিয়তা এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের যে বিশালতা তার সামনে দাঁড়িয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে গেলে জনতার রুদ্ররোষেই সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। কনভোকেশন বক্তৃতা সম্বন্ধেও একই কথা চলে আসে। ওখানেও নাকি তাঁরা 'নো' 'নো' বলে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। অথচ এই প্রতিবাদের কথা উপস্থিত কেউ শোনেনি। তখনকার পত্র পত্রিকায় এ ধরণের কথা প্রকাশ পায়নি। পেছনের দিক থেকে কেউ বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ করে থাকলেও জিন্নাহ সাহেব নিজে শোনেননি, যারা সামনের দিকে বসা ছিলেন তাঁদের কানেও পৌঁছেনি।

এটা সত্য যে, মুসলিম লীগ তখন দুটো গ্রুপে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। মুসলিম লীগের মধ্যে দুটো উপদল ছিল নাজিমুদ্দীন ও সোহরাওয়ার্দী গ্রুপ এরা ছিল তাঁদের অনুসারী। ছাত্র নেতাদের অনেকেই পরবর্তীকালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুরু করেন। কায়েদে আযমের ঢাকা অবস্থানকালে নাইমুদ্দীন, তোয়াহা প্রমুখ ভাষার দাবী নিয়ে তাঁর সাথে দেখা করেছিলেন। বদরুদ্দীন উমর তাঁর ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিষয়ক বইয়ে লিখেছেন এরা নাকি কায়েদে আযমের সাথে ভাষার প্রশ্নে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন। এটা একটা কল্প কাহিনী বৈ অন্য কিছু নয়। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলা খুব একটা সহজ ব্যাপার ছিল না। সোহরাওয়ার্দীর মত জননেতাকেও আযমের সাথে দেখা করতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হত।

যাঁরা রাষ্ট্রভাষার দাবী নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই আমাদের সাথে পাকিস্তান আন্দোলনে জড়িয়ে ছিলেন। এদের মধ্যে এ সময় একটা রূপান্তর আসতে শুরু করল। পশ্চিম পাকিস্তানীরা তাঁদের ভাষা আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে চায়- আমাদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চায়- ইত্যাকার কথা তাঁদের মুখে শোনা যেতে লাগল।

এ সমস্ত শ্লোগান দিয়ে সরল অথচ আবেগপ্রবণ বাঙ্গালী মুসলমানের অনুভূতিকে তারা বিষিয়ে দিতে শুরু করল। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে যেমন উর্দুর কোন প্রচলন ছিল না তেমনি কায়েদে আযমের মাতৃভাষাও ছিল না উর্দু। তাঁর মাতৃভাষা ছিল গুজরাটী। উর্দুর সাথে তিনি তেমন ঘনিষ্ঠও ছিলেন না। কায়েদে আযম নিজেও বলেছিলেন এই প্রদেশের ভাষা কি হবে তা এখানকার জনগণই নির্ধারণ করবে। তাঁর জীবদ্দশায় বাংলাকে প্রাদেশিক ভাষা হিসেবেই মেনে নিয়ে একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছিল। একারণে '৫২- এর ভাষা আন্দোলন পর্যন্ত ভাষা নিয়ে কাউকে মাততে দেখা যায়নি।

আন্দোলনকারীরা ভাষা সমস্যা নিয়ে মিছিল মিটিং পিকেটিং শুরু করল। পরিষদ ভবন, মূখ্যমন্ত্রীর বাসভবন এগুলো আন্দোলনকারীদের ঘেরাওয়ের শিকার হতে লাগল প্রায় প্রতিদিন। এরা মুখে বাংলা ভাষার প্রতি দরদ দেখাত অথচ মিছিল মিটিং- এর নামে সরকারী সম্পত্তি নষ্ট, কর্মচারীদের তাদের নিজ নিজ দফতরে যেতে বাধা প্রদান নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। অথচ তাদের এ সমস্ত অন্যায় কার্যকলাপের প্রতিরোধ করতে যখন পুলিশ নামান হতো তখনই প্রচার করা হত মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের অত্যাচারে নাকি দেশ জর্জরিত হয়ে যাচ্ছে।

আমার মনে আছে আন্দোলনকারীরা এতদূর জঙ্গি হয়ে উঠেছিল যে একবার তারা সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং- এর দেয়াল টপকিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং সেখানে উপস্থিত প্রাদেশিক মন্ত্রী সৈয়দ মোহাম্মদ আফজালকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। আফজাল ছিলেন ফজলুল হকের ভাগ্নে। তিনি নিজেও বাংলা ভাষার সমর্থক ছিলেন। আমার তখনই মনে হয়েছিল এটা শুধু নিছক রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন হতে পারে না। এর পিছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে। ভাষা আন্দোলনকারীরা এ সমস্ত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে প্রদেশে নতুন প্রশাসনকে বেকায়দায় ফেলতে চেয়েছিল। ভাষার মত একটি আবেগপ্রবণ ব্যাপারকে পুঁজি করে তারা নাজিমুদ্দীন সাহেবকে অনেকখানি হেনস্থা করতে পেরেছিল। মিছিল মিটিং- এ তারা নাজিমুদ্দীন সাহেবকে অশ্লীল ভাষায় গালি দিত।

নতুন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন তা নিয়ে কলকাতার পরিষদ ভবনে ভোটাভুটি হয়েছিল। ঐ নির্বাচনে সোহরাওয়ার্দী নাজিমুদ্দীনের কাছে হেরে যান। প্রদেশে যখন নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভা গঠন করেন তখন তাঁর মন্ত্রীসভায় সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের কেউই স্থান পায়নি। স্বাভাবিকভাবে তাদের একটা ক্ষোভ ছিল। পরিষদে এরাও নাজিমুদ্দীনের বিরোধীতা করা শুরু করে এবং ভাষা আন্দোলনকারীদের পিছন থেকে উৎসাহ যোগাতে থাকে। এঁদের মধ্যে বগুড়ার

মোহাম্মদ আলী, কুমিল্লার টি আলী এবং কুষ্টিয়ার ডাঃ এ এম খালেক ছিলেন। ভাষার ব্যাপারটা নিয়ে এঁরা যে খুব গভীরভাবে ভাবতেন এমন নয় কিন্তু ক্ষমতার রাজনীতির জন্য তাঁরা এসব করেছিলেন বলেই মনে হয়। কিন্তু এর ফল যা হয়েছিল তার জন্য আমাদের পরবর্তীকালে চড়া মূল্য দিতে হয়।

ভাষা আন্দোলনকারীদের সাথে কমিউনিষ্ট পার্টি ও কংগ্রেসের একটা যোগাযোগ ছিল। কিন্তু সেটা কখনও প্রকাশ্য ব্যাপার হতে পারেনি। আমি নিজে লক্ষ্য করছি ভাষা আন্দোলনকারীদের মিছিল- মিটিং চলাকালে কমিউনিষ্ট পার্টির অফিস ও লাইব্রেরীগুলো বিশেষ তৎপর হয়ে উঠত। কংগ্রেসী নেতাদের মনে হত খুব কর্মচঞ্চল। ভাষা আন্দোলনকারীদের লিফলেট- ইশতেহার ও অন্যান্য প্রচারপত্র তাঁরা নিজেরা অনেক সময় স্বেচ্ছায় বিলি- বাটোয়ারা করে দিত। ভাষা আন্দোলনের নেতা তোয়াহা, মতিন এঁরাতো কমিউনিষ্ট পার্টির সাথেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

কমিউনিষ্ট পার্টির অনিল রায়, লীলা রায় এবং কংগ্রেসের শিরিশ চট্টোপাধ্যায় ও ভবেষ নন্দীরা ভাষা আন্দোলকারীদের সব রকমের সহযোগীতা করতেন। এঁরা নিশ্চয়ই সেদিন কোন সদুদ্দেশ্য নিয়ে ভাষা আন্দোলনকারীদের পাশে এসে দাঁড়াননি।

কায়েদে আযম ঢাকায় এসে আন্দোলনরত ছাত্রদের সাথে আমরা যারা নাজিমুদ্দীন গ্রুপের বলে পরিচিত ছিলাম তাদের মধ্যে একটা ঐক্য তৈরী করে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ আন্দোলনকারীরা তখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবী নিয়ে এতদূর এগিয়ে গিয়েছিল যে তাদের সাথে আমাদের চিন্তার দূরত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কায়েদে আযম বলেছিলেন 'বিভিন্ন গ্রুপের ঐক্য ছাড়া পাকিস্তান টিকবেনা'। সে কথা অবশ্য পরে নির্মমভাবে সত্য হয়েছিল।

তখনকার মত কায়েদে আযম সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের কয়েকজন নেতাকে খুশী করবার চেষ্টা করেছিলেন বলে মনে হয়। ডা. এ এম মালেক লিয়াকত আলী খানের মন্ত্রীসভায় যোগ দেন এবং মোহাম্মদ আলী ও টি আলী বিদেশে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন।

কায়েদে আযম শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগ দেয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। শুনেছি তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন।

ভাষা আন্দোলনকারীদের খবর ফলাও করে প্রচার করত কলকাতার কংগ্রেসী পত্রিকাগুলো। এসব পত্রিকা পড়লে মনে হত পত্রিকাগুলো ভাষা আন্দোলনের দাবীকেই সমর্থন করছে। আমার কাছে এ জিনিসটা চিরদিনই অদ্ভুত ঠেকেছে যে কলকাতার বাঙ্গালী হিন্দুরা এদেশের বাংলাভাষার আন্দোলনকে সমর্থন করছে অথচ নিজেরা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে হিন্দিকে গ্রহণ করেছে- এক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দোহাই পেড়ে। সেখানে তাদের বাংলা প্রেমের মোটেও ঘাটতি হয়নি। অথচ পাকিস্তানে উর্দু রাষ্ট্রভাষার দাবীর কথা শুনে তারাই আবার হৈ চৈ করে উঠেছে এবং এদেশের কিছু আত্মবিক্রিত নেতা ও বুদ্ধিজীবীর ভাষার দাবী নিয়ে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে তাঁরাই সমর্থন দিয়েছে। পাকিস্তান হয়েছিল ১৪ই আগষ্ট। অথচ ১লা সেপ্টেম্বরেই ঢাকা ইউনিভার্সিটির দুজন লেকচারার, আবুল কাশেম ও নূরুল হক ভূঁইয়া তমুদ্দুন মজলিসের জন্ম দেন। এই সংগঠনটিই ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের মধ্যে ভাষার ব্যাপারে কাজ করতে শুরু করে। যার পথ ধরে পরবর্তীকালে গড়ে উঠে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময়ই মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের মনে সন্দেহ ছিল পাকিস্তান টিকবে কিনা। ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন দুটি অঞ্চলকে একত্রিত করে রাষ্ট্রটির জন্ম হয়েছিল। শুধুমাত্র মুসলিম জাতীয়তার আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রটির কোষাগারে তখন কোন টাকা ছিল না। বাউন্ডারী কমিশনের কাছে পাকিস্তানের পাওনা ৫৫ কোটি টাকা ভারত আটকে দিয়েছিল। লাখ লাখ মুহাজির হিন্দুদের হাতে নির্যাতিত হয়ে পাকিস্তানে ছুটে এসেছিল। এ সমস্যা মোকাবিলা করতে তখন পাকিস্তান সরকারের অচল হয়ে পড়ার মত অবস্থা। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা ছিল আরও খারাপ। হিন্দুরা চলে যাওয়ায় প্রশাসন অর্ধমৃত হয়ে পড়েছিল। পুলিশ ও আর্মি তখনও ঠিকমত গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। সরকারের প্রত্যেকটা বিভাগই ছিল অপূর্ণ। এরকম একটা নাজুক অবস্থায় ভাষার দাবী নিয়ে যারা নতুন দেশে ঐক্যের পরিবর্তে ঘৃণা ছড়ানো শুরু করল, তাদের উদ্দেশ্যে সততা কতদূর ছিল তা বলা মুশকিল।

এক হতে পারে রাজনৈতিক স্বার্থে সেদিন মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ভাষাকে ব্যবহার করা হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তানের বুনিয়াদকে দুর্বল করে দেয়ার জন্য ভাষার প্রশ্নটাকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছিল। এটা সত্য পূর্ব বাংলার মুসলমানরা বাংলাভাষী। কিন্তু বৃটিশের দুশো বছরের রাজত্বে বাংলাভাষা ও সাহিত্য এবং রাজনীতিতে ডমিনেট করেছে হিন্দুরা। বাংলার মুসলমানদের তারা কখনও বাঙ্গালী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। বাঙ্গালী বলতে বাংলাভাষা কিংবা বঙ্গের

অধিবাসী না বুঝিয়ে সেকালে হিন্দুদের বুঝানো হত। এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের বহু বিখ্যাত 'স্কুলের মাঠে বাঙ্গালী ও মুসলমানের মধ্যে ফুটবল খেলা চলিতেছে'- উক্তিটি মনে করবার মত।

এ অবস্থা থেকে মুসলমানদের বাঁচার জন্যই পাকিস্তান আন্দোলনে নামতে হয়েছিল। অথচ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকারীরা এমন একটা প্রসঙ্গ নিয়ে রাজনীতির মাঠ গরম করলেন যা মুসলিম জাতীয়তার বুনিয়াদকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে অগ্রসর হল।

তারা যে এ জিনিসটা বুঝতেন না তা নয়। কিন্তু বাংলা ভাষার পরিচয়টা যখন মুসলমান পরিচয়ের চেয়ে তারা বেশী করে দিতে লাগলেন তখনই পাকিস্তানের আকাশে কালো মেঘ জমতে শুরু করেছিল। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর অনেক নেতাকে বলতে শুনেছি ভাষা আন্দোলন থেকেই আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু। তখন আমার কাছে এটা পরিষ্কার হয় যে আসলে ভাষা আন্দোলন ছিল পাকিস্তানকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ারই একটি আন্দোলন।

সেই উনিশ'শ আটচল্লিশেই মুসলিম লীগ কর্মীদের সাথে ভাষা আন্দোলনকারীদের প্রায়শঃই মারামারি হত। এবার শুনতে পেলাম কোর্ট হাউস স্ট্রিটে কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে বসে ভাষা আন্দোলনকারীরা মিটিং করছে। ফিরোজ আহমদ ডগলাস বলে আমাদের এক তরুণ কর্মী ছিল। আমাদের একটা সুবিধা ছিল ফিরোজ আবার কমিউনিস্টদের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করত। সে আমাদের কাছে কমিউনিস্টদের গোপন খবর পাচার করত। সেই এসে জানাল মিটিং- এ সিদ্ধান্ত হয়েছে ভাষা আন্দোলনকারীরা মর্নিং নিউজ, সংবাদ এবং আজাদ পত্রিকা অফিসে আগুন লাগিয়ে দেবে। এসব পত্রিকা তখন মুসলিম লীগকে সমর্থন করত। তখন ঢাকা নগর মুসলিম লীগের অফিস ছিল ৩৩, জনসন রোডে বর্তমানে যা লিয়াকত এভিনিউ। আমি তাড়াতাড়ি করে সেখানে চলে যাই। আমরা সিদ্ধান্ত নেই আগুন দেয়ার আগেই আমরা তাদের প্রতিহত করব। কিন্তু তারা ততক্ষণে মর্নিং নিউজ অফিস জ্বালিয়ে দেয়। রায় সাহেব বাজারে এসে আমরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাই। মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। দু'পক্ষই মারামারি করার জন্য এক রকম প্রস্তুত হয়ে ছিল।

আমার মনে আছে প্রতিপক্ষ সেদিন মিছিল করে আমাদের দিকে আসছিল আর শ্লোগান দিচ্ছিল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'পাকিস্তান মুর্দাবাদ' ইত্যাদি। দু'পক্ষেই সেদিন হতাহত হয়েছিল। এক পর্যায়ে পুলিশ টিয়ার

গ্যাস ছোঁড়ে এবং গুলিও চালায়। গুলিতে আমাদের একজন ভীষণভাবে আহত হয়। তাকে হাসপাতালে নেয়ার সময় সে মারা যায়।

ভাষা আন্দোলনকারীরা চেয়েছিল এ ঘটনার সূত্র ধরে তার পরের দিন ঢাকায় হরতাল ডাকতে। প্রতিরোধের মুখে তাদের সে চেষ্টা বানচাল হয়ে যায়। আমি মুসলিম লীগের তরুণ কর্মীদের নিয়ে জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা কলেজ আর ইউনিভার্সিটিতে যাই। গিয়ে দেখি পিকেটাররা জটলা করছে। এর মধ্যে মুসলিম লীগ কর্মীরা কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয়।

'পাকিস্তান মুর্দাবাদ' শ্লোগান দেয়ায় তাদের উপর আমাদের ক্ষোভ ছিল প্রচন্ড। তাছাড়া সরকারের বিরুদ্ধে এরা আন্দোলন উস্কে দিচ্ছিল।

কোর্ট হাউস ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির অফিস ছিল কাপ্তান বাজার এবং ফুলবাড়ী রেল স্টেশনের বিপরীত দিকে। তিনটি অফিসই বিক্ষুব্ধ জনগণ জ্বালিয়ে দেয়। এদের দুটো পার্টি লাইব্রেরী ছিল। একটি ঢাকা কোর্টের বিপরীতে নাসিরুদ্দীন সরদার লেনের মাথায় অন্যটি নওয়াবপুরে। এ দুটো লাইব্রেরী ছিল সেকালে পাকিস্তান বিরোধী প্রকাশনা ও প্রচারণার তীর্থস্থান। কমিউনিস্টদের এ দুটো আখড়াও জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

কমিউনিস্ট রাজনীতি ছিল আমার কাছে এক রীতিমত রহস্যময় ব্যাপার। অনেকেই জানেনা এরা পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করত। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী, রণেশ দাশের মত প্রথিতযশা কমিউনিস্ট নেতারা সেকালে পাকিস্তান আন্দোলনকে রীতিমত নিপীড়িত মানুষের আন্দোলন বলে বক্তৃতা- বিবৃতি পর্যন্ত দিয়েছেন। অথচ পাকিস্তান হবার পর এঁরাই আবার বলতে শুরু করলেন এটা নাকি একটা ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক দেশ। পাকিস্তান হচ্ছে সর্ব প্রকার প্রগতিবিরোধী মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনার কারখানা। আমার মনে আছে কোর্ট হাউসের পিছনে যে অফিসটা সেদিন পুড়িয়ে দেয়া হয় সেটা কয়েকদিন পরেই হোটেল হিসেবে চালু করেছিল ভাষা আন্দোলনের এক নেতা কামরুদ্দীন আহমদের ছোট ভাই বদরুদ্দীন আহমদ রুকু। কামরুদ্দীন ছিলেন সোহরাওয়ার্দীর ভক্ত। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন আরমানীটোলা হাই স্কুলের মাস্টার। পরবর্তীকালে সোহরাওয়ার্দী যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন তখন তাঁকে তিনি রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দেন।

কমিউনিস্ট পার্টি অফিস পুড়িয়ে দেবার পর কলকাতায় কমিউনিস্টদের মুখপত্র 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় মুসলিম লীগ কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক লেখালেখি হয়েছিল। এ সময়ে আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ফজলুল হক হলে মুসলিম ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে একটা সভা আহ্বান করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল

রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে মুসলিম লীগের অবস্থান ব্যাখ্যা করা। তখন ভাষা আন্দোলনকারীরা মুসলিম লীগ নেতা আবু সালেক, সুলতান হোসেন খান, কাজী আউলাদ হোসেন, এটি সাদী প্রমুখকে ঘেরাও করে ফেলে। আমাদের কাছে খবর আসে তাঁদেরকে মেরে ফেলার জন্য তুলে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। খবরটা এনেছিল ইউনিভার্সিটির ছাত্র আমাদের কর্মী আখতার আহাদ ও আসলাম। আমি মুসলিম লীগের শ'খানেক কর্মী নিয়ে ফজলুল হক হলে পৌঁছে যাই। আমাদের সবার মধ্যে তখন যুদ্ধ প্রস্তুতি চলছে। এসময় ইউনিভার্সিটির ভিসি মাহমুদ হাসান ছুটে আসেন। তাঁরই মধ্যস্থতায় ভাষা আন্দোলনকারীরা মুসিলম ছাত্রলীগের নেতাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়। মাহমুদ হাসান না আসলে হয়ত সেদিন রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটত!

ঢাকা থেকে ফিরে গিয়ে কায়েদে আযম মাত্র ছ'মাস বেঁচেছিলেন। তখন পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হিসেবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন খাজা নামিজমুদ্দীন। সেই সাথে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন নূরুল আমীন।

নূরুল আমীন ছিলেন অত্যন্ত সৎ রাজনীতিবিদ, তাঁর প্রশাসনও ছিল পুরোপুরি দুর্নীতিমুক্ত। কিন্তু রাজনৈতিক দক্ষতা তাঁর কতটুকু ছিল সেটা বলা মুশকিল। অত্যন্ত গণতন্ত্রমনা হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার অভাবে আমার মনে হয় তিনি দ্রুত অপ্রিয় হয়ে ওঠেছিলেন।

পূর্ববঙ্গের উন্নয়ন প্রকৃত পক্ষে তাঁর আমলেই শুরু হয়। তখন ঢাকা শহরে কোন আন্তর্জাতিক মানের হোটেল ছিল না। একটি প্রাদেশিক রাজধানীতে বিদেশী অভ্যাগতরা কোথায় উঠবেন, কোথায় রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদি হবে তার কোন বন্দোব ছিল না। এই শূণ্যতা পূরণ করার জন্য তিনি সরকারী অনুকূল্যে প্রথম হোটেল শাহবাগ নির্মাণ করান। যা বর্তমানে পিজি হাসপাতাল। তাঁর হাতেই গড়ে ওঠে ঢাকার নিউমার্কেট এবং আজিমপুরের সরকারী কলোনী। ধানমন্ডির আবাসিক এলাকা তাঁর সময়ে তৈরী। আমার মনে আছে মতিঝিল এলাকায় যখন তাঁর সময় বাণিজ্যিক প্লট দেয়া শুরু হয় তখন কেনার জন্য বাণিজ্য বিমুখ বাঙ্গালীরা খুব একটা এগিয়ে আসেনি। এর সুযোগ নিয়েছিল ভারত থেকে আগত ধনাঢ্য মুহাজীররা- যারা আগে থেকেই ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে জড়িত ছিল।

নূরুল আমীনের এই উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমালোচনা শুরু করল বিরোধীরা। শাহবাগ হোটেলকে তারা বলত 'শাদ্দাদের বেহেশত'। আন্তর্জাতিক একটি হোটেলের সুযোগ- সুবিধার কথা বিকৃতভাবে জনগণের কাছে প্রচার করে

তারা রাজনৈতিক সুবিধা হাসিলের চেষ্টা করতে লাগল। তারা বলতে লাগল দেশের মানুষকে দরিদ্র রেখে নূরুল আমীন বিলাস- ব্যসনে গা ঢেলে দিয়েছেন।

অথচ আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি তিনি অত্যন্ত সাধাসিধা জীবনযাপন করতেন। ধৈর্য্য ধরে তিনি জনগণের দুঃখ- কষ্টের কথাও শুনতেন।

ইস্কাটনে তাঁর একটা ছোট্ট একতালা বাড়ী ছিল। অথচ বিরোধীরা সাধারণ জনগণের কাছে প্রচার করত তিনি নাকি শ্বেত পাথরের বিরাট প্রাসাদ বানিয়েছেন যেখানে তার স্ত্রী সোনার খাটে শুয়ে থাকেন।

নূরুল আমীন কোনদিন এ ধরণের মিথ্যা অপপ্রচারের বিরুদ্ধে টু'শব্দটি করেননি। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য্যরে সাথে সমস্ত পরিস্থিতি মোকাবেলা করে গেছেন।

৬

এ সময়েই পূর্ববঙ্গের রাজনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের আভাস পাওয়া গেল। সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের যারা নাজিমুদ্দিন সরকারে সুযোগ সুবিধা পেলো না এবং পরবর্তীকালে নূরুল আমীনের সময়ে যারা সরকার থেকে দূরে রইল সেই সব নেতা কর্মীরা ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ তৈরী করে। আওয়ামী মুসলিম লীগের কর্ণধাররা বলতে লাগলেন মুসলিম লীগ জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে তাই তাঁরা জনগণের (আওয়াম) মুসলিম লীগ তৈরী করেছেন।

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এটা ছিল নিছক রাজনৈতিক কৌশল। সাধারণ জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য তখনও তারা মুসলিম শব্দটা ছুঁড়ে ফেলেনি। পূর্ববঙ্গের মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চিন্তার স্রোতে এই প্রথম তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটল যা পরবর্তীকালের ঘটনা প্রবাহ পুরোপুরি ওলট পালট করে দেয়।

আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতারা কিছুদিন এই নামে কাজ চালালেও বেশীদিন তাঁদের স্বরূপ গোপন রাখতে পারেননি। শীঘ্রই তাঁরা মুসলিম শব্দটা বাদ দিয়ে দেন এবং তাঁদের ভাষায় তারা ধর্ম নিরপেক্ষ বনে যান।

আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় দেখেছি, এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ইসলাম নিরপেক্ষতা। হিন্দু হিন্দু থাকতে পারে, খ্রিষ্টান খ্রিষ্টান থাকতে পারে তাতে ধর্মনিরপেক্ষতার হানি হয় না। কিন্তু মুসলমানের ক্ষেত্রে অবস্থাটা ভিন্ন। তাদের ধর্মনিরপেক্ষ হতে হলে নিজস্ব তাহজীব- তমদ্দুন ত্যাগ করতে হবে। আওয়ামী লীগের এই রাজনীতি আমি কোনদিন বুঝতে পারিনি।

আওয়ামী মুসলিম লীগের এই মুসলিম বর্জনে তাৎক্ষণিকভাবে তখন কিছুটা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বৈকি! যার দরুন আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, রফিকুল হোসেন, খয়রাত হোসেন, হাশিমুদ্দীন, আবদুস সালাম খাঁন প্রমুখ আওয়ামী লীগ ত্যাগ করেছিলেন। পাকিস্তানকে অকেজো করে দেওয়ার জন্য তখন যে কত দিক থেকে চক্রান্ত চলছিল তার ইয়ত্তা নেই। এ সময়ের একটা ঘটনা মনে পড়ছে। তখন পুরনো ঢাকার চকবাজারে আলাউদ্দীন ছাতিওয়ালা নামে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বাস করতেন। তাঁর ছাতির কাপড় তৈরীর কারখানা ছিল। এ জন্য ছাতিওয়ালা নামে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। ঢাকাইয়া হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন শিক্ষিত পরিবারের ছেলে। সে সময় ঢাকাইয়ারা লেখাপড়ার চেয়ে ব্যবসাকে অগ্রাধিকার দিতেন বেশী। বাঙ্গালীদের মধ্যে আলাউদ্দীন ছাতিওয়ালাই পাকিস্তান

উত্তরকালে প্রথম শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে আসেন। তিনি মুসলিম লীগ হিতৈষী ছিলেন। একবার কলকাতায় ব্যবসায়িক কাজে গিয়ে আলাউদ্দীন গ্রেফতার হন। বোধ হয় পুরনো শত্রুতার কারণে তাঁকে সেখানকার কেউ ধরিয়ে দিয়েছিল। তখন চকবাজারের মুসলিম লীগ নেতা আহসান উল্লাহ খান সহ সব ব্যবসায়ী আমার কাছে আসেন বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্য। আমি তখন কোন উপায় না পেয়ে মন্ত্রী মফিজউদ্দীন আহমদ ও পরিষদে আমার হুইপ নওয়াবজাদা নসরুল্লাহর কাছে ছুটে যাই। তাদের কাছে গিয়ে আমরা ঢাকাবাসীর পক্ষ থেকে এসেছি বলে আলাউদ্দীন ছাতিওয়ালাকে মুক্ত করবার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাই। আমাদের কথা শুনে মফিজউদ্দীন ও নসরুল্লাহ পশ্চিমবঙ্গের হোম সেক্রেটারী এস.এন. মিত্রের কাছে চিঠি লিখে দেন। মিত্রের সাথে তাঁদের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিল। আমি ও আহসানউল্লাহ চিঠি নিয়ে কলকাতায় চলে যাই। কলকাতায় আমরা উঠেছিলাম ৪ সোহরাওয়ার্দী এভিনিউতে। এই বাড়ীটি ছিল হাজী আব্দুর রশীদ খানের। হাজী সাহেব কংগ্রেস করতেন। সি আর দাস কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র তখন হাজী সাহেব ছিলেন কর্পোরেশনের ডেপুটি চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার। হাজী সাহেব ছিলেন আমার আত্মীয়। এই সূত্রে আমার এই বাড়ীতে ওঠা। এর পাশের বাড়ী ৫ সোহরাওয়ার্দী এভিনিউতে ছিল পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনারের বাসা। তখন ডেপুটি হাই কমিশনার ছিলেন সিরাজগঞ্জের মুসলিম লীগ নেতা আব্দুল্লাহিল মাহমুদ। ইনি পরে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছিলেন।

আমরা চিঠি নিয়ে মিত্রের সাথে দেখা করি এবং কলকাতার বংশাল কোর্ট থেকে আলাউদ্দীন ছাতিওয়ালার জামিনের ব্যবস্থা করি। ছাতিওয়ালা জামিন পেয়ে ঢাকায় চলে আসেন। আমরা কলকাতায় বেড়ানোর জন্য কয়েকদিন থাকব বলে সিদ্ধান্ত নেই।

আহসানউল্লাহ একদিন আমাকে নিয়ে তার এক হিন্দু বন্ধুর বাড়ীতে যায়। আহসানউল্লাহর বন্ধু আমাদের আপ্যায়ন ও দুপুরে ভুরিভোজ করান।

খাবার আগে আহসানউল্লাহর বন্ধু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন আমার কাছে কোন পাকিস্তানী ১০০ টাকার নোট আছে কি না। আমি হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলে তিনি একটি ১০০ টাকার নোট আমার কাছে চান। আমি ব্যাগ থেকে তাঁর হাতে একটি নোট দিলে এটি তাড়াতাড়ি পকেটে পুরে ফেলেন। আমি একটু অসন্তুষ্ট হই কিন্তু পরিস্থিতি বুঝে নীরব থাকি।

খাবার পর তিনি পুনরায় হঠাৎ করে আমাকে একটা নতুন চকচকে ১০০ টাকার নোট দিয়ে বলেন এটা রাখেন। আমি তাঁকে যেটা দিয়েছিলাম সেটা ছিল

একটু পুরনো। আমি একটু ইতস্তত করে সেটাই পকেটে রেখে দেই। কিছুক্ষণ পর তিনি আমাকে আমার পুরনো গোছের টাকাটাই ফেরত দিয়ে বলেন এটাই হচ্ছে আপনার টাকা! আগেরটা আমার। তারপর তিনি যা বলেন তা শোনার জন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না।

তিনি আমাকে বললেন আমরা নোটের বিজনেস করি। আমরা আহসানউল্লাহর কাছে আপনার সব কথা শুনেছি। আপনি যদি আমাদের সাথে থাকেন তাহলে খুব ভাল হয়। আমরা বেশ কিছুদিন ধরেই পূর্ব পাকিস্তানে ব্যবসা চালিয়ে আসছি। ঢাকায়ও আমাদের এজন্ট আছে। আমরা সাধারণত ৪০ শতাংশ হারে বিজনেস করি। তার মানে আপনি যা লাভ করবেন তার ৪০ শতাংশ আমাদেরকে দিতে হবে।

তারাই আমাকে বিজনেসের পথ বাতলে দিল। নরসিংদী কিংবা বাবুরহাট যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার কাপড়ের বিজনেস চলে সেখানে তারা আমাকে একটি দোকান নিয়ে কাপড় কিনতে বললেন। আরও বললেন এতে কোন অসুবিধা নেই। শুধু একটু থানার সাথে ভাল যোগাযোগ রাখলেই চলবে। তাঁরা কিভাবে জেনেছিলেন ঢাকায় আমার বেশ প্রভাব আছে। প্রশাসনের কর্তাদের সাথেও আমার ভাল যোগাযোগ আছে তাও তারা জেনে নিয়েছিলেন। ইচ্ছে করেই আমি বার্গেনিং- এর সুরে বললাম দাদা লাভের পার্সেন্টেজ একটু বাড়িয়ে দিলে হয় না। বিজনেসটা বেশ রিস্কি।

তিনি তখন সোৎসাহে বললেন, কোন অসুবিধা হবে না। বিজনেসের ভলিউম যত ভালো হবে পার্সেন্টেজ সেই হারে উপরের দিকে উঠতে থাকবে। শুধু আপনি বললেই হল টাকা পৌঁছানোর দায়িত্ব আমাদের।

তারপর আহসানউল্লাহর বন্ধু আমাদের দু'বাড়ী পরে একটা একতলা বাড়িতে নিয়ে গেলেন। দেখলাম বাড়ীটা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। লোহার গেটে দারোয়ান আছে। হঠাৎ করে ভিতরে ঢুকে পড়া যায় না।

বাড়ীর বৈঠকখানা ঘর পার হয়ে আমি যখন ভিতরে ঢুকে পড়েছি তখন আমার চোখ ছানাবড়া। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত শুধু টাকা। ১০০ টাকার নোটের বান্ডিল থরে থরে সাজানো রয়েছে। আমার নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মনে হল একি স্বপ্ন দেখছি! সব জাল টাকা পাকিস্তানে প্রবেশের অপেক্ষায় ছিল। টাকার রুমে ঢোকানোর আগে বৈঠকখানায় বসিয়ে তিনি আমাকে মদ খাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমি সোজাসুজি বলেছিলাম মদ আমি খাই না। এরপর আহসানউল্লাহর বন্ধুকে বললাম, দাদা তাহলে দেখছি পূর্ববঙ্গে

আপনারা খুব বড় কারবার করছেন। তিনি বললেন, আপনিও বড় কারবারী হয়ে যেত পারবেন। ঢাকায় আমাদের সাথে কাজ করে অনেকেই কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে গেছে। শুধু বলেন কবে থেকে আপনি শুরু করছেন।

আমি তখনকার মত বললাম আমাকে কিছু সময় দিন। ওখানকার পরিবেশ বুঝে আপনাকে সব জানাব। তিনি তখন আবার বললেন পরিবেশ তো সব জানেনই। আবার এত দেরী কেন?

আমি আবারও সময় চেয়ে ফিরে এলাম। এ সময় আহসানউল্লাহকে কিন্তু তিনি আমার সাথে রাখেননি। তিনি তাকে তার পূর্বের বাসায় বসিয়ে রেখে এসেছিলেন।

রাতে হাজী সাহেবের বাসায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুধু টাকার স্বপ্ন দেখলাম। কোটি কোটি টাকার স্বপ্ন। সে রাতে আমার ঘুম হয়নি। ভোরেই উঠে গিয়েছিলাম। শুয়ে শুয়েই ভাবলাম হায় পাকিস্তান, তোমার জন্য কেরিয়ার নষ্ট করেছি। লেখাপড়ায় এগুতে পারিনি। নিজের জীবন বাজি রেখে তোমার জন্য সংগ্রাম করেছি। আর আজকে আমার হাত দিয়েই তোমার ক্ষতি হবে। এ আমি সহ্য করব কি করে!

আমি সোজা হাজী সাহেবের বাসা থেকে বেরিয়ে এসে আব্দুল্লাহিল মাহমুদের বাসার সামনে এসে পায়চারী করতে থাকলাম। উদ্দেশ্য ভোরের আলো আর একটু পরিষ্কার হলে হাই কমিশনার সাহেবের সাথে দেখা করব।

এরি মধ্যে দেখি মাহমুদ সাহেব বারান্দায় পায়চারী শুরু করেছেন। তিন আমাকে আগে থেকেই চিনতেন। সেখান থেকেই বেশ জোরে বললেন, ইব্রাহিম খবর কি! কলকাতায় কেন এসেছ? এখানেই বা এত সকালে ঘোরাফেরা করছ কেন। আমিও জোরে চেঁচিয়ে বললাম আপনার সাথে জরুরী কথা আছে।

মাহমুদ সাহেব উপর থেকে প্রহরারত পুলিশকে বললেন ওকে আমার কাছে নিয়ে এস।

আমি দোতালায় যেতেই জিজ্ঞাসা করলেন ইব্রাহিম পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থার কি হাল!

বললাম, মোটেই ভালনা। ওখানেও ষড়যন্ত্র এখানেও ষড়যন্ত্র। কোথায় যাব!

মাহমুদ সাহেব বললেন, কি বলছ ইব্রাহিম, খুলে বল।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চারদিক থেকে ষড়যন্ত্র চলছে আর আপনি এখানে বসে আছেন। কলকাতার রক্ত তো এখনও শুকায়নি অথচ কোনই খবর রাখেন না। ...

কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ইব্রাহিম। আমার মাথা বিলকুল ঠিক আছে। সবকিছু মন দিয়ে শুনুন।

তারপর পুরো ঘটনা তাঁকে আমি খুলে বললাম। তিনি হতবাক হয়ে শুনলেন। বুঝলাম নিজের কর্তব্য তিনি বিস্মৃত হননি মোটেই।

মাহমুদ সাহেব বললেন তুমি এখনই বিমানে করে চলে যাও। আমি টিকিটের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ওদের ওয়াচাররা টের পেলে তোমার জীবন বিপন্ন হতে পারে। তারপর তিনি নিজেই তাঁর গাড়ী দিয়ে আমাকে বিমানবন্দরে পাঠিয়ে দিলেন। আর বললেন যাবতীয় ব্যবস্থা যা করার আমি করব। সেই দিন বিকেলে আহসানউল্লাহকে তিনি আমার কাপড় চোপড়সহ ঢাকায় বিমানে করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পরদিন ঢাকায় এসে শুনি বালিগঞ্জের সেই বাড়ীতে পুলিশ হানা দিয়েছে। আর তাদের ঢাকার এজেন্ট মিটফোর্ডের এক ব্যবসায়ী গ্রেফতার হয়েছে। মিটফোর্ডের ঐ ব্যবসায়ীকে আমি চিনতাম- সে এই কাজ করে কোটি কোটি টাকা বানিয়েছিল। এরকম বহু এজেন্ট তখন পূর্ববঙ্গে বসে দেশের সর্বনাশ করছিল।

৭

১৯৫১ সালে করাচীতে মুসলিম লীগের কাউন্সিল মিটিং হয়। পাকিস্তান হওয়ার পর মুসলিম লীগের এই ছিল প্রথম কাউন্সিল মিটিং। পূর্ব পাকিস্তান থেকে অনেকের মধ্যে আমিও কাউন্সিলার মনোনীত হই। এর মধ্যে আবার আমরা শ্রীলঙ্কা যাওয়ার আমন্ত্রণও পাই। শ্রীলঙ্কা তখন সিংহল নামে পরিচিত ছিল। শ্রীলঙ্কায় মুসলিম লীগের একটি শক্তিশালী শাখা ছিল। টি বি জয়া ছিলেন সেখানকার মুসলিম লীগ নেতা। তিনি শ্রীলঙ্কার শিল্প মন্ত্রী হয়েছিলেন। পরে তিনি পাকিস্তানে শ্রীলঙ্কার হাইকমিশনার নিযুক্ত হন। এই টি বি জয়াই শ্রীলঙ্কার একটি মুসলিম যুব সম্মেলন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেন। করাচীর কাউন্সিলর মিটিং- এ যাওয়ার পথে এই যুব সম্মেলনে আমর যোগদান করি। আমরা সমুদ্র পথে শ্রীলংকা যাই এবং সেখান থেকে পরে করাচী পৌঁছি। তখন চাটগাঁ থেকে নৌ-বাহিনীর একটি জাহাজে করে আমরা রওয়ানা হই। মুসলিম লীগ সরকারই আমাদের নৌ- বাহিনীর জাহাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

আমার সাথে যেসব কাউন্সিলর জাহাজযোগে সহযাত্রী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ঢাকার নূরুল ইসলাম, হেকিম ইরতেজাউর রহমান, শামসুল হুদা, ফিরোজ আহম্দ ডগলাস, আলিমুল্লাহ, আলাউদ্দীন, মোহাম্মদ ইয়াসিন, আখতার আহাদ, আসলাম রেঙ্গুনওয়ালা, চাটগাঁর আবু সালেক, রফিকুল্লাহ চৌধুরী, চৌধুরী হারুনুর রশীদ, মোহাম্মদ রুস্তম, কাজী নাজমুল হক, আলিমুল্লাহ চৌধুরী, রাজশাহীর মোহাম্মদ ফারুক, বগুড়ার ফজলুল বারী ও আব্দুল হামিদ, কুমিল্লার এটি সাদী, শফিকুর রহমান, নূরউদ্দিন আবাদ, মফিজুর রহমান, রংপুরের সাঈদুর রহমান, ফেনীর সাইফুদ্দিন চৌধুরী এবং রাজশাহীর এমরান আলী সরকারের কথা মনে পড়ছে।

আমাদের সাথে ঢাকা ইউনিভার্সিটির তিনজন ছাত্রীও সফর করেন। তাঁরাও মুসলিম লীগের কর্মী ছিলেন। এঁরা হলেন রোখসানা রেজা, তৌহিদা ও জাকিয়া।

রোখসানা পরে পাইলট হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথম মুসলিম মহিলা পাইলট। রোখসানার আব্বা আলী রেজা ছিলেন ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট।

তৌহিদা ছিলেন ডা. আব্দুল ওয়াহেদের মেয়ে। ডা. আব্দুল ওয়াহেদ বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে প্রথম এমআরসিপি ডিগ্রী পেয়েছিলেন। তিনি পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষও হন। এই সব মুসলিম লীগ কাউন্সিলরদের

মধ্যে চাটগাঁর চৌধুরী হারুনুর রশীদ পরে মুসলিম লীগ ত্যাগ করে ন্যাপে যোগ দেন। চিন্তাভাবনায় তিনি হয়ে যান বামপন্থী। জাহাজযোগে এই ছিল আমার প্রথম সমুদ্র ভ্রমণ। সমুদ্রের মধ্যে আমাদের জাহাজটা ছিল ভাসমান দ্বীপের মত। বিশাল বিশাল ঢেউ এগিয়ে আসছে। দেখলে রীতিমত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তে হয়। পরক্ষণেই তা আবার শুভ্র ফেনার মিছিল হয়ে চতুর্দিকে ভেঙ্গে পড়ছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

সমুদ্রে উড়ন্ত মাছের ঝাঁক দেখা যেত ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আবার পরক্ষণেই তা সমুদ্রেও বুকে মিশে যেত। আমার কাছে সবচেয়ে ভাল লাগত সমুদ্রে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য। সারা পৃথিবীকে রাঙ্গিয়ে একবার সূর্য সমুদ্রের বুক ফেড়ে উপরে উঠে আসছে আবার সন্ধ্যা বেলায় রক্তের আভা ছড়িয়ে সমুদ্রের বুকেই হারিয়ে যাচ্ছে। জেলেরা দেখতাম উপকূল থেকে বহুদুর এসে মাছ ধরছে। তাদের দেখলে তাদের জীবনের প্রতি কোন মায়া আছে কিনা বুঝা যেত না। সমুদ্রের ঢেউয়ের সাথেই বোধহয় তারা জীবনবাজি রেখেছিল। মাঝে মাঝে দেখতাম ঢেউয়ের তালে তালে তাদের নৌকা কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। আবার কিছুক্ষণ পর দেখতাম ঢেউয়ের ফেনার ভিতর থেকে তারা বেরিয়ে আসছে।

আমাদের জাহাজ বঙ্গোপসাগর ছেড়ে ভারত মহাসাগরে এসে পড়ামাত্রই ভীষণভাবে দুলতে থাকে। জাহাজ কর্তৃপক্ষ আমাদের শুয়ে থাকার নির্দেশ দেয়, কেননা উঠে দাঁড়ালেই তখন পড়ে যাবার আশংকা ছিল। তারা আমাদের লাইফ জ্যাকেট পরে ফেলবারও নির্দেশ দেয়। বঙ্গোপসাগর যেখানে ভারত মহাসাগরের সাথে একাকার হয়ে গেছে এবং করাচী যাওয়ার পথে আরব সাগর যেখানে ভারত মহাসাগরের সাথে মিশেছে সেখানে দুই সমুদ্রের মিলন স্থলটা স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিলাম। পরিষ্কার ভিন্ন দু'টি পানির ধারা বয়ে চলেছে।

আমার তখন কোরান শরীফের কথা মনে হয়েছিল। সেখানে আছে দুই সমুদ্রের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এমন একটা অভেদ্য পর্দা দিয়ে রেখেছেন যা ভেদ করে কখনও দুই সাগরের পানি পরস্পরের সাথে মিশে যায় না।

আমরা চতুর্থ দিন কলম্বো বন্দরে পৌঁছি। কলম্বো বন্দরটা দেখলাম আমাদের চাটগাঁ বন্দরের মত নয়। মূল বন্দর থেকে বেশ দূরে জাহাজ নোঙ্গর করে। সেখান থেকে ছোট ছোট বোটে করে তীরে পৌঁছাতে হয়। কলম্বো বন্দরে টিবি জয়ার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ কর্মীরা মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, সিংহল জিন্দাবাদ বলে আমাদের স্বাগত জানায়।

কলম্বোয় আমরা জাহাজেই থাকতাম। সকাল বেলায় বেরিয়ে যেতাম আবার সন্ধ্যায় জাহাজে ফিরে আসতাম।

কলম্বো শহরটা দেখতে ছবির মত। মনে হল যেন নিসর্গের মধ্যে শহরটা গড়ে উঠেছে। তখনই দেখেছিলাম সিংহলীরা সবাই শিক্ষিত। রাস্তার ঝাড়ুদারও দেখেছি পথের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সংবাদপত্র পাঠ করছে। সেই সাথে পেয়েছি সিংহলীদের মধ্যে রুচিবোধের পরিচয়।

আমরা প্রথম দিন বিকেলের দিকে পৌঁছেছিলাম। ওখানকার মুসলিম লীগের উদ্যোগেই আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। দেখলাম সিংহলীরা তরকারীতে খুব নারকেল খায়। ঝালের কথা না বলাই ভাল। দ্বিতীয় দিন সমুদ্রের ধারেই গফুর ম্যানশনে সম্মেলন হয়েছিল। পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার প্রতিনিধিরা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এ সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল দুই দেশের মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধনকে উজ্জীবিত করা। পাকিস্তানীদের পক্ষ থেকে আমি, আখতার আহাদ ও রোখসানা বক্তৃতা করেছিলেম। শ্রীলঙ্কার পক্ষ থেকে টিবি জয়া ও প্রফেসর মাহমুদ কিছু কথা বলেছিলেন। শ্রীলঙ্কায় পাকিস্তানের হাইকমিশনার সেলিম খানও সম্মেলনে বক্তৃতা করেছিলেন।

সম্মেলন শেষে আমরা পুরো কলম্বো শহর ঘুরে দেখেছি। শ্রীলঙ্কায় সে সময় মুসলমানের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার প্রায় আট ভাগ। এরা সবাই ছিল সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। তারা সবাই নানা ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে জড়িত। পাকিস্তান হওয়ার পর, আমার মনে পড়ছে, সিংহলের এক মুসলিম ব্যবসায়ী প্রথম ঢাকায় এসে নওয়াবপুরে কাসিম জুয়েলার্স নামে এক সোনার দোকান দিয়েছিলেন। তখন কোন মুসলমান সোনার ব্যবসায়ী ছিল না। সিংহলের আরব বংশোদ্ভুত মুসলমানদের চেহারা দেখতে টকটকে ফর্সা। স্থানীয় মুসলমানদের গায়ের রং গৌরবর্ণ। সিংহলে অনেকগুলো সুন্দর মসজিদ দেখেছি।

একদিন সিংহলের মুসলিম লীগ কর্মীরা আমাদেরকে আদমের পাহাড়ে (Adam's Peak) নিয়ে যান। বেহেশত থেকে পৃথিবীতে এসে এ পাহাড়ের উপরই হযরত আদম (আঃ)-এর আগমণ ঘটেছিল বলে সবার বিশ্বাস। হযরত আদম (আঃ) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে বিবি হাওয়া পড়েছিলেন বর্তমান সৌদি আরবের জেদ্দায়। পাহাড়টা প্রায় ৩৫০০ ফুট উঁচু হবে। মুসলমান ছাড়াও দেখলাম খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধরাও এ পাহাড়টাকে খুব সম্মান দেখান। এরপর আমরা গিয়েছিলাম কলম্বোর জাতীয় মিউজিয়ামে। গৌতম বুদ্ধের নানা ভঙ্গির মূর্তিতে মিউজিয়াম ছিল ভর্তি। সেখানে তার চুল, পায়ের ছাপ সব কিছুই খুব সযত্নে রাখা হয়েছে।

বৌদ্ধ গাইডকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা রামায়ণের কাহিনী পড়েছি। রাম-রাবণের কথা শুনছি। তাঁদের কোন স্মৃতি-চিহ্ন এ দেশে আছে কিনা?

সে হেসে উড়িয়ে দিল। বলল পুরো কাহিনীটাই আজগুবি। এটা কবির কল্পনাপ্রসূত। রাবণ বলে কেউ ইতিহাসে ছিলেন না। আর তিনি সিংহলেও কোনদিন আসেননি। উল্টো সে আমাকে বলল শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ এত বেশী হওয়ার কারণ কি জান? ভারতে হিন্দুদের নির্মম অত্যাচারের মুখে বৌদ্ধরা এখানে পালিয়ে এসে প্রাণ বাঁচিয়েছিল।

সিংহলে যে কয়েকদিন ছিলাম তার মধ্যে একদিন আমরা যাইদিয়া মুসলিম ইউনিভার্সিটি দেখতে যাই। এটা সিংহলের মুসলামনরা নিজেদের চেষ্টায় গড়ে তুলেছিল। কলম্বো শহরে মুক্তার ব্যবসা খুব জমজমাট মনে হল। এখানকার মুক্তা খুবই বিখ্যাত। সিংহলে হাতির দাঁতের জিনিসপত্রও খুব সস্তা। সিংহলের আনারসের আকার দেখে অবাক হয়েছিলাম, এক একটা প্রায় ৫ কেজি। সিংহল টিও দেখলাম খুব নামকরা। আমরা যখন চলে আসি তখন আমাদের প্রত্যেককে হাতির দাঁত ও মুক্তার কাজ করার খুব সুন্দর সিংহলের মানচিত্র উপহার দেয়া হয়েছিল।

জাহাজে করে এবার আমরা করাচী চললাম। আসার পথে শুনেছিলাম সমুদ্রের অনেক ভৌতিক কাহিনী। সমুদ্রের ভিতরে নাকি তাদের অদ্ভুত হাত দিয়ে জাহাজ যাত্রীদের ডাকে। অদ্ভুত গলার স্বর করে মানুষকে ভয় দেখায়। কিন্তু এসব কিছুই আমাদের নজরে পড়ল না। নির্বিঘ্নে করাচী পৌঁছেছিলাম। করাচী বন্দরে আমাদের অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রী ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুন। ন্যাশনাল গার্ডের কর্মীরাও ছিল। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল করাচীর একটা কলেজ বিল্ডিংয়ে। করাচীর বাইরের প্রতিনিধিরাও আমাদের সাথে জায়গা নিয়েছিলেন।

আমাদের কাউন্সিল মিটিং হয়েছিল করাচীর বিখ্যাত খালেকদীনা হলে। এতদিন মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন চৌধুরী খালিকুজ্জামান। কাউন্সিল মিটিং-এ নতুন সভাপতি নির্বাচিত হন সর্দার আবদুর রব নিশতার। এ মিটিং-এ পূর্ব পাকিস্তান থেকে মূখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন হাজির হয়েছিলেন। সিন্ধুর মূখ্যমন্ত্রী ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুন, পাঞ্জাবের মূখ্যমন্ত্রী মিয়া মমতাজ দৌলতানা, সীমান্ত প্রদেশের মূখ্যমন্ত্রী খান আবদুল কাইয়ুম খান এবং বেলুচিস্তানের মুসলিম লীগ নেতা কাজী মোহাম্মদ ঈসা উপস্থিত ছিলেন।

করাচী শহর দেখলাম তখন কেবল গড়ে উঠছে। একটি প্রাদেশিক রাজধানী থেকে হঠাৎ করে একটি দেশের রাজধানীতে পরিণত হয় করাচী। রাজধানীর অতিরিক্ত বোঝা তখন বহন করা করাচীর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ছিল।

তার উপর ভারত থেকে আগত হাজার হাজার মুহাজির করাচী শহর ছেয়ে ফেলেছে। করাচীতে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম ঢাকার মতই প্রচুর টিনশেডের আশ্রয় তৈরী করে অফিসের কাজকর্ম চলছে।

সর্দার আব্দুর রব নিশতার ছিলেন পাঠান। দেখতে অত্যন্ত সুপুরুষ। যেমন উঁচু, তেমনি গায়ের রং কমলা লেবুর মত পরিষ্কার। তাঁর পাকানো মোচটা ছিল খুব আকর্ষনীয়। মুসলিম লীগের এই ত্যাগী পুরুষ পাকিস্তান আন্দোলনে কায়েদে আযমের অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন। ১৯৪৬ সালে ভারতে যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তিনি ছিলেন তার অন্যতম সদস্য। কাউন্সিল মিটিং- এ একটা সুন্দর ঘটনার কথা মনে পড়ছে। নিশতার সাহেব তখন নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের সবার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেলেন। মোমেনশাহীর গিয়াসউদ্দীন পাঠান মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন ছোটখাটো আকৃতির। আমাদের পাশে বসেছিলেন সীমান্ত প্রদেশের উঁচু লম্বা পাঠান কাউন্সিলার ভাইয়েরা। তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় পাঠান ভাইরা হাসতে হাসতে বলছিলেন, ইয়ে বহুত ছোটা পাঠান হ্যায়। দপ্তর সম্পাদক যিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি ছিলেন প্রবীণ মুসলিম লীগার, খুব বয়স্ক ব্যক্তি ছিলেন তিনি। কায়েদে আযমের সময় থেকেই তিনি দফতর সম্পাদকের কাজ করে আসছিলেন। তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় নিশতার সাহেব যে কথাটা বলেছিলেন তা এখনও আমার কানে বাজছে। তিনি বলেছিলেন, ইয়ে আদমী যব গুজারতা হ্যায় তব রোগ বোলতে হ্যায় মুসলিম লীগ যা রাহা হ্যায়। হাম চাহতে হ্যায় আপলোগ ভি যাঁহা যায়ে তো আদমী কহেকে মুসলিম লীগ যা রাহা হ্যায় হাম চাহতে হায় আপলোক হামারে ইয়ে সেক্রেটারীকে তরা চলতা ফিরতা মুসলিম লীগ বন যায়ে।

নিশতার সাহেব তাঁর বক্তৃতায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন। পাকিস্তানের দুই অংশের কোথাও যদি মুসলিম লীগ দুর্বল হয়ে যায় পাকিস্তানের উভয় অংশের ঐক্য বজায় রাখা যাবে না।

কাউন্সিল মিটিংয়ের পর আমরা সবাই মিলে কায়েদে আযমের মাজার জিয়ারত করতে গিয়েছিলাম। একদিন নাজিমুদ্দীন গভর্ণর জেনারেল হাউসে

মুসলিম লীগ কাউন্সিলরদের নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কায়েদে আযম ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত এ বাড়ীতেই থাকতেন। পরে নাজিমুদ্দীন এখানে ওঠেন। করাচী থাকতে একদিন আমরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা ফাতেমা জিন্নার সাথে দেখা করতে যাই। কায়েদে আযমের বোন হিসেবে তাঁর প্রতি আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি মুসলিম লীগকে গড়ে তোলবার জন্য আমাদের অনুপ্রাণিত করেন। বিশেষ করে তরুণ কর্মীদের তিনি উপদেশ দেন: Build up your career, earn money then join Politics.

আমাদের মধ্যে শাহ আজিজকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, তোমার কথা আমি শুনেছি, তুমি ভাল করে ওকালতি পড়ো। আশা করি মুসলিম লীগের জন্য তুমি অনেক কিছু করতে পারবে। শাহ আজিজ তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আইন অধ্যয়ন করছিলেন।

করাচীতে আমরা সপ্তাহ খানেক ছিলাম। নৌ- বাহিনীর আর একটি জাহাজে করে সিংহল হয়ে আমরা চাটগাঁয় ফিরে আসি। ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের জন্য একটি দুঃখজনক অধ্যায় অপেক্ষা করছিল। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৬ই অক্টোবর রাওয়ালপিন্ডির এক জনসভায় বক্তৃতারত অবস্থায় আততায়ীর গুলিতে শহীদ হন। লিয়াকত আলী খানের মৃত্যু পাকিস্তানকে দুর্বল করেছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। কায়েদে আযমের ইন্তেকালের পর দুর্বল পাকিস্তানের হাল তিনি শক্ত করে না ধরলে কি হত বলা মুশকিল।

পাকিস্তান আন্দোলনে লিয়াকত আলী খান কায়েদে আযমের পাশে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যেভাবে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তার তুলনা নেই।

৮

১৯৪৬ সালে ভারতের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে লিয়াকত আলী খান ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে। কংগ্রেসের হিন্দু নেতাদের ধারণা ছিল মুসলমানদের পক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয় চালানো সম্ভব হবে না। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে যখন লিয়াকত আলী খান পরিষদে বাজেট পেশ করেছিলেন তখন কংগ্রেস নেতারা থ' মেরে যান। লিয়াকত আলী খান এ বাজেটকে নাম দিয়েছিলেন 'গরীবের বাজেট'। হিন্দু ব্যবসায়ীদের ওপর তিনি ট্যাক্স ধার্য করে কংগ্রেসকে যথেষ্ট নাকানি- চুবানি খাইয়েছিলেন। এ সময়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল নাকি বলেছিলেন 'এভাবে আর চলা যায় না। এর চেয়ে ভাগ হয়ে যাওয়াই ভাল'।

লিয়াকত আলী খানের পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দীন। ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি ঢাকায় আসেন। ২৭ তারিখ পল্টন ময়দানে তিনি ভাষণ দেন। ভাষণ দেয়ার আগ পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারিনি তিনি বক্তৃতায় রাষ্ট্রভাষার কথা বলবেন। কায়েদে আযমের অনুকরণ করে তিনিও বলেছিলেন উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। আমার মনে হয়েছে তিনি একথাটা তখনকার পরিস্থিতিতে না বললেও পারতেন।

আর মুসলিম লীগ বিরোধীরা যেন এ রকম একটা কথা শোনার জন্যই অপেক্ষা করছিল। এতদিন নূরুল আমীনের বিরুদ্ধে ক্ষমতা বঞ্চিত মুসলিম লীগের নেতা ও কর্মীরা- যারা আওয়ামী লীগ গঠন করে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি- এখন তারাই রাষ্ট্রভাষার দাবীতে মাঠে নেমে পড়ল।

১৯৪৮ সালে কায়েদে আযম চলে যাবার পর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়ে। এর কিছু কারণ ছিল। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি প্রাদেশিক পরিষদে রাষ্ট্রভাষার সমর্থনকারী কয়েকজনকে রাষ্ট্রীয় সুযোগ- সুবিধা দিয়েছিলেন, এ কথা আগেই বলেছি। তাছাড়া জনগণ যখন দেখল তাদের নেতা কায়েদে আযমই ভাষার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন তখন ইউনিভার্সিটির কিছু তরুণ ছাত্রের ভাষার দাবী- দাওয়া নিয়ে তারা এত মাথা ঘামায়নি। ভাষা আন্দোলনকারীরাও তেমন কোন জনসমর্থন পায়নি।

নাজিমুদ্দীনের ঘোষণার প্রেক্ষিতে নতুন করে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। তারা ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী হরতাল আহ্বান করে। ঐদিন পরিষদে বাজেট পেশ হওয়ার কথা ছিল। খুব ভেবে- চিন্তে ভাষা আন্দোলনকারীরা এই দিনটি বেছে নেয়। সরকার গন্ডগোল হতে পারে আশংকায় ঢাকায় ১৪৪ ধারা

জারী করেছিল। ভাষা আন্দোলনকারীরা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা চেয়েছিল তখনকার জগন্নাথ হলের পরিষদ ভবনে হামলা চালিয়ে সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে। ইউনিভার্সিটির দিক থেকে তারা ১৪৪ ধারা ভাঙতে পারেনি। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের দিক থেকে তারা ১৪৪ ধারা ভাঙতে এগিয়ে আসে। পুলিশকে লক্ষ্য করে বৃষ্টির মত তারা ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে চলছিল। আমি বলব পুলিশ সেদিন অতর্কিতে হামলা চালায়নি। পুলিশের সাথে সেদিন রীতিমত ভাষা আন্দোলনকারীদের ছোটখাট যুদ্ধ হয়ে যায়। পুলিশ প্রথমে টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে- তাতে কোন কাজ হয়নি। ভাষা আন্দোলনকারীদের হামলায় বারবার পুলিশ আত্মরক্ষার জন্য পিছিয়েও গিয়েছিল। এক পর্যায়ে পুলিশ উপায়ান্তর না দেখে গুলি চালায়। গুলির আদেশ দিয়েছিলেন ঢাকার এসপি মাসুদ। গুলিতে কয়েকটি ছেলে মারা যায়। এরাই পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলনের শহীদ সালাম, জব্বার, বরকত, শফিক নামে পরিচিত।

এরা কেউ ভাষা আন্দোলনের সাথে মোটেই জড়িত ছিল না। সালাম ছিল একটা অফিসের পিয়ন। নোয়াখালীর ছেলে সালাম ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছিল। জব্বার ছিল দর্জি। তাঁর বাড়ি ছিল গফরগাঁয়ে। রফিক এসেছিল ঢাকায় বেড়াতে। সে দেবেন্দ্র কলেজের আইকম ক্লাসে পড়ত।

বরকত ও শফিকের আদি নিবাস ছিল ভারতের মুর্শিদাবাদে। পাকিস্তান হওয়ার পর তারা ঢাকায় চলে আসে। বরকত ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ত। শফিউর ছিল খুবই গরিব ঘরের ছেলে। ২১ তারিখের ঘটনার সূত্র ধরে ২২ তারিখেও বেশ গন্ডগোল হয়। ঢাকার নওয়াবপুর রোডে গোলাগুলির সময় শফিউর মারা যায়। ঢাকার নওয়াব পুরে আরও যারা নিহত হয়েছিল তারা হল হাবিবুল্লাহ নামে এক রাজমিস্ত্রীর ছেলে, অলিউল্লাহ রহীম নামে এক রিক্সাওয়ালা।

আমি তখন ঢাকা রিক্সা ইউনিয়নের সভাপতি। আমি তাকে চিনতাম। তার পেটে গুলি লেগেছিল। রিক্সা চালিয়ে আসার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। আমি তাকে নিজে মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পথেই সে মারা যায়। ভাষা আন্দোলনে যারা অংশগ্রহণ করেছিল তাদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থান ছিল অস্বচ্ছল। কোন আন্দোলন করার যোগ্যতাও তাদের ছিল না। ভাষা আন্দোলন যে কি জিনিস তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা থেকেও ধারণা করা স্বাভাবিক, এটা তাদের বুঝার কথা নয়। আসলে পূর্ব পাকিস্তানে তখন যে লাশের রাজনীতি শুরু হল তার স্রোতে এরা হিরো বনে গেলো। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সরকার ঢাকা হাইকোর্টের ইংরেজ বিচারপতি এলিসকে চেয়ারম্যান করে একটি তদন্ত কমিটি

গঠন করে। ইংরেজ বিচারপতি তাঁর রায়ে বলেছিলেন- পুলিশকে গুলি করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সামনে যেখানে গোলাগুলি হয়েছিল সেখানে ভাষা আন্দোলনকারীরা একটা স্মৃতি স্তম্ভ বানায়। এটাই হল শহীদ মিনার। এই স্তম্ভকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে এক অদ্ভুত কালচার আমদানী হল। যা এ দেশের মানুষ ইতোপূর্বে কখনও দেখেনি। এটাকেই আস্তে আস্তে বলা হতে লাগল বাঙ্গালীর সংস্কৃতি। প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিট থেকেই প্রভাত ফেরির প্রচলন শুরু হল। ছেলেমেয়ে একত্রে মিলে নগ্ন পায়ে স্মৃতি স্তম্ভে ফুল দেয়া শুরু করল। তারা এর পাদদেশে আল্পনা আঁকতে থাকল। পাদদেশকে এখন বলা হয় বেদি। যা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পূজারই অনুকরণ। আগে আল্পনা আঁকত মন্দিরে। মন্দিরের দেয়ালে বিগ্রহ যেখানে বসানো হয় সেই বেদিতে যে আঁকাজোখা করা হত তাকেই বলা হত আলপনা। সেই আলপনা এখন মুসলমান সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে ভাষা আন্দোলনকে ভর করে। ভাষা আন্দোলনের এই এত ঘটনার মধ্যেও কিন্তু শেখ মুজিব নিজেকে বিস্ময়করভাবে দূরে রেখেছিলেন। এর কারণ মুজিবের নেতা সোহরাওয়ার্দীর বাংলা ভাষার ব্যাপারে আদৌ উৎসাহ ছিল না। আগেই বলেছি তিনি ছিলেন উর্দূভাষী। ফজলুল হকেরও বাংলা ভাষার ব্যাপারে আগ্রহটা কম ছিল। তিনি বাংলাভাষী ছিলেন ঠিক কিন্তু সারাজীবন তিনি যে সব বৃত্তে ঘোরাফেরা করেছেন সেখানে উর্দু ও ইংরেজীর প্রচলনটাই ছিল বেশী।

১৯৩৮ সালের ১লা অক্টোবর All Indian Muslim Educational Conference- এর সভাপতির ভাষণে ফজলুল হক উর্দুকে সারা ভারতের যোগাযোগের ভাষা (Lingua-Franca) হিসেবে গ্রহণ করবার দাবী করেছিলেন। আসলে ব্রিটিশ ভারতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করবার কথা কেউ ভাবতে পারেনি। বাঙ্গালী কবি রবীন্দ্রনাথও হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার জোর ওকালতি করেছিলেন।

২১শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনার পর মোহন মিয়া ফরিদপুর থেকে ঢাকায় আসেন। আমরা তাঁর সাথে গিয়ে নূরুল আমীনের সাথে দেখা করি।

আমাদের হয়ে মোহন মিয়াই তাঁকে বললেন দেশের কি সর্বনাশ হচ্ছে। আন্দোলনের গতি প্রবাহতো ভারতের হাতেই চলে যাচ্ছে।

নূরুল আমীন তখন আক্ষেপ করে বললেন: মোহন মিয়া, দেশের মানুষ যদি সর্বনাশ চায় তবে তুমি আমি আর ইব্রাহিম কি কিছু করতে পারব? দেশের

মানুষ যদি দেশকে রক্ষা না করে তাহলে আমরা কতটুকু কি করতে পারি। দেশ তো শুধু তোমার আমার না- দেশ তাদেরও। দেশের মানুষ হিন্দুদের অত্যাচরের কথা যদি এত তাড়াতাড়ি ভুলে যায়, দু'শ বছরের লাঞ্ছনার কথা যদি মনে না রাখে তবে আমরা কিছুই করতে পারব না। দেশের মানুষ যদি আত্মহত্যা করতে চায় আমরা কি তা ঠেকাতে পারব?

৯

এ সময় পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে ঘটল আরেকটি বিপর্যয়। ১৯৫৩ সালে নাজিমুদ্দীনকে পদচ্যুত করলেন গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ। গোলাম মোহাম্মদ ছিলেন একজন আমলা। আমার মতে এই আমলার হাতেই পাকিস্তানে গণতন্ত্রেও ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়ে গেল। তারপর থেকে যতদিন পাকিস্তানের দুই অংশ একত্রিত ছিল ততদিন পর্যন্ত প্রকৃত অর্থে পাকিস্তানের রাজনীতিতে কোন স্থিরতা আসেনি। নাজিমুদ্দীনকে পদচ্যুত করা হয়েছিল সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পন্থায়। তাঁর বদলে আমেরিকায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে বানানো হল প্রধানমন্ত্রী। স্পীকার মৌলভী তমিজুদ্দীন খান এই অগণতান্ত্রিক আচরণের প্রতিবাদে হাইকোর্টে গিয়েছিলেন। হাইকোর্ট তাঁর পক্ষে রায় দিলেও পরে সুপ্রীমকোর্ট তার বিপক্ষে রায় দেয়।

আমার মনে হয়েছিল এটা একটা পাতানো খেলা। এর পিছনে ছিল জেনারেল আইয়ুবের হাত। জেনারেল আইয়ুব তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান। আইয়ুব খান চলতেন আমেরিকার ইশারায়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে তখন চলত আমেরিকা আর রাশিয়ার খবরদারী। পাকিস্তান ছিল খবরদারীর শিকার। একটা দেশে যখন সামরিকতন্ত্রের ভূত চাপে তখন সে দেশ কোনভাবেই এগিয়ে যেতে পারে না। আমেরিকা ও রাশিয়া তখন সামরিকতন্ত্রকে ভর করেই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালাত।

মোহাম্মদ আলীকে নূরুল আমীন মোটেই পছন্দ করতেন না। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁর ক্ষমতারোহণ তিনি মেনে নিতে পারেননি কখনও।

মোহাম্মদ আলীরই কেবিনেটে আইয়ুব খান যোগ দেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে। দেশের সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে চাকুরীরত অবস্থায় তিনি কি করে কেবিনেটে জায়গা করে নিলেন তাও ছিল আমাদের কাছে এক পরম বিস্ময়ের ব্যাপার।

মোহাম্মদ আলীর কেবিনেটে সোহরাওয়ার্দী যোগ দেন আইনমন্ত্রী হিসেবে। সোহরাওয়ার্দী যখন যুক্তবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তখন মোহাম্মদ আলী তাঁর উল্টো। রাজনীতির এই চক্রটা বড়ই অদ্ভুত। নাজিমুদ্দীন আমেরিকা প্রভাবিত সিয়াটো চুক্তিতে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেছিলেন। আমেরিকা তার বদলা নিয়েছিল আইয়ুবের মাধ্যমে। দুঃখজনক হলেও সত্য নাজিমুদ্দীনের এ পদচ্যুতিকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সোহরাওয়ার্দী।

এ রকম একটা বিশৃঙ্খল অবস্থায় ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ঘনিয়ে এল। ঠিক নির্বাচনের আগে মুসলিম লীগের নড়বড়ে অবস্থাটা একটু তরতাজা করার জন্য মোহন মিয়া নূরুল আমীনের কাছে নতুন প্রস্তাব নিয়ে গেলেন। মোহন মিয়াকে বলা হত কিংমেকার- পর্দার অন্তরালে থেকে ক্ষমতার রাজনীতির পাল্লা ঘুরিয়ে দিতে তাঁর জুড়ি ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে নামিজুদ্দীনের বিজয়ে তাঁরই ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশী। সিলেটের পরিষদ সদস্যদের বুঝিয়ে তিনি নাজিমুদ্দীনের পক্ষে এনেছিলেন।

মোহন মিয়া এবার আমাদের নিয়ে নূরুল আমীনের কাছে গিয়ে বললেন, ফজলুল হক মুসলিম লীগে আসতে রাজী হয়েছেন। আপনি তাঁকে সভাপতির পদটা ছেড়ে দিন। তাহলে প্রদেশে আমাদের অনেক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। নির্বাচনেও জোর লড়াই চালানো যাবে। এটা সত্য ফজলুল হক দীর্ঘদিন কোন একটা আদর্শে স্থায়ী থাকতে পারতেন না। তারপরও বলতে হবে এদেশের মানুষের উপর ফজলুল হকের ছিল অসামান্য প্রভাব। ব্রিটিশ ভারতে বাংলার চাষা মুসলমানদের আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টিতে তাঁর অবদান অতিক্রম করার মত কেউ ছিলেন না। ঋণসালিশী বোর্ড স্থাপন করে যুক্তবঙ্গে তিনিই জমিদারের শোষণ আর অত্যাচার থেকে বাংলার মুসলমানদের বাঁচিয়েছিলেন। লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৯০৬ সালে ঢাকার বুকে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাকালে ফজলুল হক উপস্থিত হয়েছিলেন। তারপর ১৯১৬ সালে লাহোর চুক্তিকালে তিনি কায়েদে আজমের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান ছিল অনন্য। ১৯৩৭ সালে তিনি যখন মুসলিম লীগের সহযোগিতায় যুক্তবাংলার প্রধানমন্ত্রী হন তখন কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোতে চলছিল নির্বিচারে মুসলিম নিধন। এর প্রতিবাদে তিনি হুংকার দিয়ে বলেছিলেন: কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোতে একটা মুসলমান মারা হলে আমি বাংলায় তার বদলা হিসেবে দুজন হিন্দুকে খতম করে দেব। তাঁর এই সাহসিকতা দেখে লক্ষ্ণৌর মুসলমানরা তাঁকে শের- ই- বাংলা উপাধি দেন।

ফজলুল হককে নূরুল আমীন সভাপতির পদ ছেড়ে দিতে রাজি হলেন না। নির্বাচনের প্রাক্কালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন হয় কার্জন হলে। সে অধিবেশনেও কর্মীদের পক্ষ থেকে ফজলুল হককে সভাপতি করার দাবী উঠেছিল। এই দাবী নিয়ে কার্জন হলে রীতিমত হাতাহাতি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নূরুল আমীনের একগুঁয়েমির মুখে ফজলুল হককে মুসলিম লীগে

আনা যায়নি। সেদিন যদি ফজলুল হককে লীগে আনা যেত তাহলে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী জোয়ার এতটা প্রবল হতে পারত না। হয়ত যুক্তফ্রন্টই গড়ে উঠত না। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে মোহন মিয়া মুসলিম লীগ ত্যাগ করলেন। তাঁর সাথে হাত মিলালেন হামিদুল হক চৌধুরী ও দেওয়ান আবদুল বাসিতসহ মুসলিম লীগের একনিষ্ঠ বহু নেতা ও কর্মী। তাঁদের এই দলত্যাগ মুসলিম লীগের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দিয়েছিল।

মোহন মিয়া খুবই জেদী ছিলেন। নূরুল আমীনকে হারানোর জন্য নিজের জমিদারীর কিছু অংশ বিক্রি করে প্রায় দু'লাখ টাকা তিনি ফজলুল হকের হাতে তুলে দেন। আমাকে তখন তিনি মুসলিম লীগ ছেড়ে তাঁদের সাথে যোগ দিতে বলেন। তাঁর সাথে আমার গভীর হৃদ্যতা ছিল। তিনি আমাকে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে মনোনয়ন দিতে চেয়েছিলেন। বললেন, নূরুল আমীনের অবস্থাটা তো দেখছ। কি হবে মুসলিম লীগ করে!

আমি বললাম মোহন ভাই নূরুল আমীনের সিদ্ধান্ত মানতে আমি পারিনি ঠিকই। কিন্তু তা বলে আমি মুসলিম লীগ ত্যাগ করব না। আমি দলত্যাগীদের দলভুক্ত হতে চাই না। আপনার সাথে আমার সম্পর্ক সব সময়ই থাকবে।

যুক্তফ্রন্টের কাছে মুসলিম লীগের পরাজয়ের আর একটা কারণ আমার কাছে খুব উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়েছে। নূরুল আমীন কখনও ছাত্র রাজনীতিকে উৎসাহিত করতেন না। ছাত্ররা রাজনীতি করুক এটা তার পছন্দ ছিল না। তাঁর অসহযোগীতার কারণে ছাত্র আন্দোলনকে আমরা সংগঠিত করতে পারিনি, নতুন রিক্রুট তেমন একটা হয়নি, এই শূণ্যতার সুযোগ নিয়েছিল আমাদের বিরোধীরা। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ছাত্র রাজনীতি সব সময়ই একটা ফ্যাক্টর। এ জিনিসটা তিনি বুঝতে পারেননি। তিনি ছাত্রদেরকে উল্টো বুঝাতেন go back to studies. নির্বাচনে মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন পেয়েছিল। ফজলুল কাদের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি পরে মুসলিম লীগে যোগ দিলে আসন সংখ্যা ১০- এ এসে দাঁড়ায়। নূরুল আমীন হেরেছিলেন সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের এক তরুণ কর্মী খালেক নওয়াজের কাছে। নূরুল আমীন একটু এদিক- ওদিক করলেই নিজের কেন মুসলিম লীগের জন্যও অনেক আসন ছিনিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু মুসলিম লীগের বিরোধীরা ক্ষমতার জন্য সেদিন যে সব ন্যাক্কারজনক কাজ করেছিলেন তিনি সে সব নীরবে মেনে নিয়েছিলেন। বলতে দ্বিধা নেই ৫৪- এর নির্বাচনের মত নিরপেক্ষ নির্বাচন এদেশে আর একটিও হয়নি। সেটা সম্ভব হয়েছিল নূরুল আমীনের গণতান্ত্রিক চেতনা ও মন- মানসিকতার জন্য। নির্বাচনের আগে যুক্তফ্রন্ট

২১ দফা পেশ করেছিল। এটাকে তাঁরা বলত গণদাবী। তাঁরা আরও বলতেন ক্ষমতার জন্য নয় গণদাবী আদায়ের জন্য তাঁরা নির্বাচন করছেন।

নির্বাচনের পর অবশ্য গণদাবী আদায়ের নেতৃত্বদানকারীদের চেহারা ফুটতে শুরু করল। পরিষদের নেতা নির্বাচিত হলেন ফজলুল হক। কিন্তু গোল বাঁধল মন্ত্রীসভায় কারা যোগ দেবেন সেটা নিয়ে। ফজলুল হককে যুক্তফ্রন্টের কর্মীরা বাঁধা দিতে উদ্যত হলেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন গুলিস্তানের গভর্ণমেন্ট হাউস ঘেরাও করে মন্ত্রী পরিষদের শপথ গ্রহণকে যে করেই হোক ভন্ডুল করবেন। ঘটনার দিন রাতে মোহন মিয়া আমার বাসায় হাজির। তিনি বললেন ইব্রাহিম তোমার লোকজন দিয়ে হেলপ করো। মুবিজকে বাঁধা দিতে হবে। আমি সেই রাতে কর্মীদের বাসায় ঘুরে ঘুরে সবাইকে সংগঠিত করি এবং পরদিন সকালে গভর্ণমেন্ট হাউজের দিকে রওয়ানা দেই। সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের হয়ে শেখ মুজিব তাঁর লোকজন নিয়ে বাঁধা দিতে অগ্রসর হলেন। কিন্তু তিনি যখন শুনলেন আমাদের দল অনেক বেশী শক্তিশালী ও সংগঠিত তখন পিছিয়ে গেলেন এবং একটা মারামারির হাত থেকে আমরা সবাই রেহাই পেলাম। ফজলুল হক তখনকার মত নির্বিঘ্নে তাঁর মন্ত্রীদের শপথ করালেন।

আমার মনে আছে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর নবনির্বাচিত পরিষদ সদস্যদের প্রথম সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়েছিল শাহবাগ হোটেলে। এতদিন তাঁরাই ক্ষমতার বাইরে থাকা অবস্থায় এটিকে বলতেন শাদ্দাদের বেহেশ্ত। তাঁরা এটা নিয়ে অহেতুক নূরুল আমীনের কুৎসা রটিয়ে বেড়াতেন।

মোহন মিয়াকে সহযোগিতার জন্য তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) তাঁর ইত্তেফাক পত্রিকায় 'মুসাফির' নামে আমাকে আক্রমণ করেন এবং কয়েকদিন ধরে লেখালেখি করেন। তিনি খামোখাই আমার বিরুদ্ধে চটেছিলেন। তিনি বুঝতে পারেননি যুক্তফ্রন্টেও ছিল বহু দলত্যাগী নেতা কর্মীদের ভিড়। আপাত সুবিধা প্রাপ্তি ছিল তাঁর লক্ষ্য। আমি বলব এটা মানিক মিয়ার অপসাংবাদিকতা। মন্ত্রীসভা গঠনের সময় শেখ মুজিব শেরে বাংলার মুখের উপর বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে চটাং চটাং কথা বলেছিলেন। আর তার উত্তরে শেরে বাংলা দুঃখ করে বলেছিলেন, যে ছেলে আশি বছরের বুড়োকে বেইজ্জত করতে দ্বিধা করেনা, সে এদেশের সম্ভ্রমকে- লুটিয়ে দিতে দ্বিধা করবে না- এটা তোমরা দেখে নিও।

এই সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতার কথা পরবর্তীকালে অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্টের ইতিহাস হল এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়। ২১ দফার রফাদফা করে নেতারা রীতিমত মাঠে নেমে গেলেন। যুক্তফ্রন্টের শরীকদের মধ্যে

কোন মিল ছিল না। একজন ডাইনে গেলে আর একজন যেতেন বাঁয়ে। সোহরাওয়ার্দীর লোকজন সোহরাওয়ার্দীর অনুগত প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন কিভাবে ফজলুল হককে সরিয়ে দেয়া যায়।

একবার ফজলুল হকের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের শরীক আওয়ামী লীগ একটা ষড়যন্ত্র করে। বুড়িগঙ্গার ওপার থেকে কিছু গরীব লোককে খাদ্য দেবার প্রলোভন দিয়ে ঢাকায় এনে ভুখা মিছিল বের করে। আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য ছিল গভর্ণমেন্ট হাউস ঘেরাও করে ফজলুল হককে বেকায়দায় ফেলা। মিছিল যখন ঢাকা কোর্টের সামনে আসে তখন পুলিশ বাঁধা দেয়, পরে লাঠিচার্জ করে এবং গুলি ছোঁড়ে। গুলিতে দুজন গরীব মানুষ মারা যায়। এদের ভাগ্যে অবশ্য রাতারাতি শহীদ হওয়ার গৌরব প্রাপ্তি ঘটেনি। আওয়ামী লীগের এই মিছিল সংগঠিত করেছিলেন জিঞ্জিরার হামিদুর রহমান। তিনি আওয়ামী লীগ থেকে '৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য হয়েছিলেন।

এসময় আওয়ামী লীগ আরও একটা ন্যাক্কারজনক কাজ করেছিল। আদমজী জুট মিল তখন নির্মাণাধীন। এখানে কিছু অবাঙ্গালী শ্রমিক কাজ করত। আওয়ামী লীগ প্রচার করতে লাগল লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা অবাঙ্গালীরা এদেশ থেকে নিয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগের ঘৃণা ও বিদ্বেষের রাজনীতি এখান থেকেই শুরু। তাদের রাজনৈতিক পুঁজিই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী আর অবাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ। অবাঙ্গালীরা এদেশের যাবতীয় দুঃখ কষ্টের জন্য দায়ী, তাদের রুখতে হবে। অথচ দেশ বিভাগের আগে এদেশে একটাও পাটকল ছিল না। এদেশের পাটকে নির্ভর করে যেসব জুট মিল গড়ে উঠেছিল তা ছিল কলকাতায়। তখন কিন্তু হিন্দুদের এই শোষণের বিরুদ্ধে এরকম প্রতিবাদ ওঠেনি বা পরবর্তীকালেও কেউ কিছু বলেনি। অবাঙ্গালীরা ছিল মুসলমান। পাকিস্তানের জন্য তাঁরা সর্বস্ব ত্যাগ করেছিল। নিজেদের সহায় সম্পত্তি ফেলে এদেশে ছুটে এসেছিল। বাঙ্গালীদের মধ্যে তখনও কোন শিল্পপতি শ্রেণী গড়ে ওঠেনি। অথচ অবাঙ্গালীরা যখন কেউ কেউ দেশের শিল্পায়নে এগিয়ে এল তখন তারাই হল আওয়ামী লীগের প্রথম টার্গেট।

নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা শামসুজ্জোহার নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র আওয়ামী লীগ কর্মী আদমজী জুট মিলে হামলা চালায় ও অবাঙ্গালী মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই বিহারী বাঙ্গালী দাঙ্গায় বহুলোক হতাহত হয়েছিল। ফজলুল হকের বিরুদ্ধে এটা ছিল আর একটা আওয়ামী চক্রান্ত। এ ঘটনার ফলেই সোহরাওয়ার্দীর অনুগত মোহাম্মদ আলীর পরামর্শে গভর্ণর জেনারেল গোলাম

মোহাম্মদ ফজলুল হকের মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেন এবং প্রদেশে কেন্দ্রের শাসন জারী করেন।

এসময় রাষ্ট্রীয় কাজে একবার গোলাম মোহাম্মদ ঢাকায় আসেন। তখন রাজনৈতিক মহলে শলা-পরামর্শ চলছিল কেন্দ্রের শাসন তুলে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে পুনরায় গণতান্ত্রিক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার। বিমানবন্দরে গোলাম মোহাম্মদকে সংবর্ধনা জানাতে যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগ প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছিল। গোলাম মোহাম্মদ এসেছিলেন দেরী করে। সেদিন মালা নিয়ে ফজলুল হক ও আতাউর রহমান খান ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়েছিলেন গভর্ণর জেনারেল সাহেবের নেক নজর কাড়ার জন্য। দু'দলেরই উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রের সুদৃষ্টি অর্জন করে মন্ত্রীসভা গঠন করা। আমার কাছে সেদিন বিশেষ করে খারাপ লেগেছিল ফজলুল হকের মত একজন মানুষ কি করে একজন আমলার পিছনে ছুটতে পারেন। ক্ষমতার লোভ মানুষকে কোথায় নামিয়ে নিয়ে যায়!

বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন চৌধুরী মোহাম্মদ আলী। তিনিও ছিলেন একজন আমলা। লিয়াকত আলী খান ১৯৪৬ সালে অন্তর্বর্তী সরকারের যে বাজেট পেশ করে হুলুস্থুল করে ফেলেছিলেন তা প্রণয়ন করতে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সহযোগীতা করেন বিস্তর। তিনি তখন কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী। কেন্দ্রে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে পরিষদে সমর্থন করত ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টি আর নেজামে ইসলাম পার্টি। নেজামে ইসলাম পার্টি থেকেই মন্ত্রী হয়েছিলেন মৌলভী ফরিদ আহমেদ ও মাহফুজুল হক। ফজলুল হক চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রীসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছিলেন। কৃষক শ্রমিক পার্টির আর এক প্রভাবশালী সদস্য হামিদুল হক চৌধুরী হন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তখন প্রদেশের মূখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন কৃষক শ্রমিক লীগের আবু হোসেন সরকার।

তখন পাকিস্তানের রাজনীতিতে ষড়যন্ত্র ও কুটিলতা এত ছায়া ফেলেছিল যে কোন মন্ত্রীসভাই দীর্ঘস্থায়ী হত না। আসলে হতে দেয়া হত না। পাকিস্তানের রাজনীতিতে আমেরিকা এত বেশী প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করল যে এখানে দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীলতা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। ক্ষমতার মঞ্চে এবার এলেন সোহরাওয়ার্দী। তিনি হলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। এই প্রথম আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বরাবরের মত সোহরাওয়ার্দী মার্কিন ঘেঁষা নীতি অনুসরণ করলেন। আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী অবশ্য সোহরাওয়ার্দীর এই মার্কিন ঘেঁষা নীতি পছন্দ করতেন

না। এ কারণেই তাঁর সাথে সোহরাওয়ার্দীর বিরোধ শুরু হয় এবং তিনি তাঁর দলবল নিয়ে আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে আসেন এবং নতুন দল ন্যাপ তৈরী করেন। সন্তোষের কাগমারীতে এক সম্মেলন ডেকে মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের বিভাজন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করেন। পরে ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে ন্যাপের কাউন্সিল অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন স্থলে হামলা চালায় আওয়ামী লীগ। পরের দিন পল্টন ময়দানে আহূত ন্যাপের জনসভায়ও হামলা করে আওয়ামী লীগ এবং সেখানে প্রচুর হতাহত হয়।

সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হয়ে পাকিস্তানের জন্য এক বিরাট ক্ষতির কাজ করেছিলেন। ক্ষমতায় এসে তিনি পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা তুলে দেন। পরিষদ অধিবেশন ডেকে তিনি সংবিধানে রীতিমত সংশোধন এনেছিলেন। পাকিস্তান হয়েছিল পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে। এটা ছিল একসময় মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিরক্ষা ব্যূহ। এর জন্য ব্রিটিশ ভারতে মুসলমান নেতাদের অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এমনকি সোহরাওয়ার্দীও কলকাতার রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এই পৃথক নির্বাচনকে ভিত্তি করে। তিনি কি বুঝে এটা করেছিলেন জানি না তবে নির্বাচনে হিন্দু ভোট পাওয়ার তাৎক্ষণিক সুবিধার কথা তিনি ভেবে থাকতে পারেন।

আওয়ামী লীগ যে পাকিস্তানকে দুর্বল করার জন্য এক এক করে অতি সন্তর্পণে এগুচ্ছিল ভাষা আন্দোলনের পর পৃথক নির্বাচন তুলে দেওয়ার আয়োজন তারই প্রমাণ। তবে সোহরাওয়ার্দী কখনই পাকিস্তান ভাঙ্গায় জড়িত ছিলেন না। কিন্তু মোসাহেব ও পাকিস্তান বিরোধীদের কথায় তাঁর কান ভারী হয়েছিল সন্দেহ নেই।

এতদিন আওয়ামী লীগ বিরোধীদলে থাকাকালে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান শোষণের কল্পিত জিকির করত। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী যখন ক্ষমতায় গেলেন তখন তিনি বললেন, পূর্ব পাকিস্তান শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্বশাসন ভোগ করছে। সুতরাং নতুন করে পূর্ব পাকিস্তানের আর স্বায়ত্বশাসন দরকার নেই।

আসলে ক্ষমতায় থাকলে আওয়ামী লীগ কখনও শোষণের কথা বলত না। ক্ষমতা হারালেই শোষণ তারা খুঁজে বেড়াত। এই ছিল আওয়ামী লীগের রাজনীতি।

অথচ এই রাজনীতি পাকিস্তানকে দুর্বল করে দিচ্ছিল। দু'অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ঐক্যের বদলে বিভেদের বীজ পল্লবিত হচ্ছিল। পাকিস্তানের ক্ষমতার রাজনীতিতে সোহরাওয়ার্দী বেশী দিন টিকে থাকতে পারেননি। মাত্র ১৩

মাস প্রধানমন্ত্রীত্বের পর তাঁকে বিদায় নিতে হয়। সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় আওয়ামী কর্মীদের দাপটে সারাদেশ অস্থির হয়ে উঠেছিল। করাচীর সচিবলায় আওয়ামী কর্মীদের গুঞ্জনে মুখরিত থাকত। আমার মনে আছে মাত্র ১৩ মাসের মধ্যেই অবৈধ প্রভাব খাটিয়ে সর্বপ্রকার লাইসেন্স, পারমিট, পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে আমদানী- রফতানীর ব্যবসা, জাহাজের মাল চলাচলের স্থান ও রেলওয়ে ওয়াগন মঞ্জুরী সব কিছু হাতিয়ে নেয় তারা। করাচীর তাজ হোটেল ছিল বিখ্যাত হোটেল। এমন সব আওয়ামী লীগ কর্মী যাদের কোন সামাজিক অবস্থান ছিল না করাচীতে, সে সময় দেখেছি, তাজ হোটেল তাদের দখলে। একবার ব্যবসায়িক কারণে করাচীতে গিয়ে দেখি তাজ হোটেল আওয়ামী কর্মীতে গিজ গিজ করছে। সবাই তদবির প্রার্থী, লাইসেন্স- পারমিট আকাঙ্খী। এদের অনেককেই চিনতাম। তাদের ঘরে ঢুকে দেখি মদ ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রের ছড়াছড়ি।

এরপর প্রধানমন্ত্রী হন মুসলিম লীগের আই আই চুন্দ্রীগড়। ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তিনি পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি বহাল রাখতে সচেষ্ট হন। দুর্ভোগ্যবশত তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বের মেয়াদ ৩ মাস স্থায়ী হয়েছিল। পৃথক নির্বাচনী বিল পুনরায় উত্থাপনে মুসলিম লীগ চেষ্টা করে। তবে সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

আই আই চুন্দ্রীগড় সবুর সাহেব এবং আমাকে করাচীতে ডেকে পাঠান। আমরা হাজির হলে তিনি বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে পৃথক নির্বাচনের গুরুত্বের কথা বলেন এবং পৃথক নির্বাচনের পক্ষে প্রদেশে জনমত সৃষ্টির উপর জোর তাগিদ দেন।

করাচী থেকে ফিরে আমরা পৃথক নির্বাচনের পক্ষে কাজ শুরু করি। সারা প্রদেশে আওয়ামী লীগের এই পৃথক নির্বাচন বানচালের আত্মঘাতী উদ্যোগের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রচারণা চালাতে থাকি। তখন পৃথক নির্বাচনের পক্ষে একটি জনমত তৈরী হতে শুরু করেছিল। তা দেখে ভীত হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার ধরপাকড় শুরু করে এবং অন্যান্যের মধ্যে মুসলিম লীগের ফজলুল হক কাদের চৌধুরী ও সাইদুর রহমানকে গ্রেফতার করে। তখন ফজলুল কাদের চৌধুরী চাটগাঁ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। এসময় সিডিউল কাস্ট নেতা রসরাজ মন্ডল আমাদের উদ্যোগকে সমর্থন দেন। আমরা সারা প্রদেশে পৃথক নির্বাচন দিবস পালন করেছিলাম। পৃথক নির্বাচনের পক্ষে ঢাকার এক জনসভায় আমি বলেছিলাম, মুসলমানরা পৃথক জাতি এই নীতির ভিত্তিতেই পাকিস্তানের সৃষ্টি। যে শক্তি পাকিস্তানের হাসিলে বাঁধা সৃষ্টি করেছিল এবং যারা আজ পর্যন্ত ইসলামী

আদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে তারা এই ইসলামী আদর্শের বিলোপ সাধন ও যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য অশুভ আঁতাত করেছে। এই পদ্ধতি প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু ও মুসলমানকে এক জাতি বলে ধরে নেয়া হবে। এবং শেষ পর্যন্ত এমন এক সময় আসবে যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধবাদী দল পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু ও পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদেরকেও একজাতি বলে দাবী উত্থাপন করবে। আওয়ামী লীগ এসময় প্রদেশের সরকারে থাকা অবস্থায় মুক্ত নির্বাচনের পক্ষে হরতাল ডেকেছিল কিন্তু সে হরতাল সফল হয়নি।

১০

এদিকে ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে মুসলিম লীগের দ্বিতীয় কাউন্সিল অধিবেশন হয়। এবারও অধিবেশন স্থল ছিল করাচীর সেই বিখ্যাত খালেকদীনা হল। যেখানে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এবার আমরা করাচী গিয়েছিলাম উড়োজাহাজে। আমি উঠেছিলাম করাচীর তাজ হোটেলে।

এবারকার অধিবেশনে আমাদের সভাপতি নির্বাচিত হন সীমান্ত প্রদেশের আব্দুল কাইয়ুম খান। কাইয়ুম খান ছিলেন পাকিস্তানোত্তর কালে সীমান্ত প্রদেশের প্রথম মূখ্যমন্ত্রী। সীমান্ত প্রদেশে বরাবরই কংগ্রেসের একটা প্রভাব ছিল। এই প্রভাবের মূলে ছিলেন খান আব্দুল গফফার খান। দীর্ঘদিন সংগ্রামকরে তিনি সীমান্ত প্রদেশের মানুষকে গান্ধীর অহিংস রাজনীতিতে দীক্ষা দিয়েছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনকালে কাইয়ুম খানের গতিশীল নেতৃত্বের সামনে সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসের এতকালের সাজানো ঘর ভেঙ্গে পড়ে এবং রেফারেন্ডামের মাধ্যমে সীমান্ত প্রদেশের মানুষ পাকিস্তানে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

এই পাঠান নেতা যেদিন নতুন করে মুসলিম লীগের হাল ধরলেন সেদিন মনে আছে সারা করাচী শহরে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। পাকিস্তান হওয়ার পর কায়েদে আযমের ইন্তেকাল ও লিয়াকত আলী খানের শাহাদাতের ফলে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে যে এক ধরণের নির্জীবতা এসেছিল আমার মনে হয় কাইয়ুম খানের সভাপতি হওয়ার পর তা কাটতে শুরু করে।

মুসলিম লীগের কর্মীদের মধ্যেও নতুন করে প্রাণ- চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। আমি এবার পাকিস্তান মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হই। এসময় পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। কৃষক শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামী লীগের সদস্যদের মধ্যে পরিষদের একটি সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে রীতিমত মারামারি বেধে যায়। সেটা হাতাহাতি ও ঘুষোঘুষি পর্যন্ত পৌঁছায়। সে সময় পরিষদে সভাপতিত্ব করছিলেন ডেপুটি স্পীকার চাঁদপুরের শাহেদ আলী। তিনি কৃষক শ্রমিক পার্টির টিকিটে নির্বাচিত হয়েছিলেন। মারামারির এক পর্যায়ে শেখ মুজিব শাহেদ আলীকে লক্ষ্য করে পেপার ওয়েট ছুঁড়ে মারেন। শাহেদ আলী ছিলেন ডায়াবেটিসের রোগী। তিনি সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে যান। তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তিনি আঘাতজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন। আমি পুরো কাহিনী পরে মোহন মিয়ার মুখ থেকে শুনেছি।

পরিষদের মধ্যে আওয়ামী লীগের গুন্ডামী ছিল নজিরবিহীন ঘটনা। এভাবে একজন নির্বাচিত স্পীকারকে হত্যা করে আওয়ামী লীগ তার ফ্যাসিস্ট চরিত্রের ষোলকলা পূর্ণ করে। পরিষদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনেও ঘটে ভূমিকম্প। জেনারেল আইয়ুব রাজনীতিবিদদের এই নীতি বিবর্জিত কর্মকান্ডের ধুয়া তুলে পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করেন। এভাবে রাজনীতিবিদদের হাত থেকে পাকিস্তানের ক্ষমতা চলে গেল সামরিক বাহিনীর হাতে। সেই সাথে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় আমেরিকা একটি নতুন বন্ধু পেল। যে রাষ্ট্রটির জন্ম হয়েছিল ইসলামী আদর্শের উপর ভিত্তি করে সে রাষ্ট্রটিই তখন নেতৃত্বের অযোগ্যতার কারণে ইসলামের দুশমন আমেরিকার স্বার্থ রক্ষার বাহক হয়ে দাঁড়ালো।

আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসেই রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করলেন। সংবিধান স্থগিত করলেন। কাইয়ুম খান সোহরাওয়ার্দীর মত নেতাদের করলেন কারারুদ্ধ। সেই সাথে বলতে লাগলেন রাজনীতিবিদরাই পাকিস্তানের যত দুর্গতির জন্য দায়ী। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন পাকিস্তানের সৃষ্টিই হয়েছিল রাজনীতিবিদদের সংগ্রামের ফলে। আইয়ুব খান সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য নিয়ে পাকিস্তানের ক্ষমতায় এসেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ফৌজি পোশাক ছেড়ে পাকিস্তানের ক্ষমতায় দীর্ঘদিন টিকে থাকতে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন মুসলিম লীগ দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠান। তার একটি গণভিত্তি আছে। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচয়কে ব্যবহার করা যেতে পারে। আইয়ুব গোপনে মুসলিম লীগ ভাঙ্গতে উদ্যোগী হলেন। তাঁর এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গী হলেন বগুড়ার মোহাম্মদ আলী। তখন আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র নামে একটা অদ্ভুত রাজনৈতিক পদ্ধতি চালু করলেন। এ ধরণের ব্যবস্থার সাথে এদেশের মানুষের কোন পরিচয় ছিল না। সমকালীন পৃথিবীতে এর কোন নজিরও ছিল না। আসলে পাকিস্তানের দুর্বল রাজনৈতিক কাঠামোকে এ নতুন পদ্ধতি দুর্বলতর করতে শুরু করল।

আইয়ুব মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে একটা সংবিধানও তৈরী করেছিলেন। সেই সংবিধানের সূত্র ধরে ১৯৬২ সালে দেশে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে আইয়ুব তাঁর নিজের লোকদেরকে পাশ করিয়ে নেন।

আইয়ুব খান নির্বাচনের পর একটা দল গঠনেরও প্রয়োজন অনুভব করেন। মোহাম্মদ আলী নির্বাচনে জয়লাভের পর এই দল গঠনের উদ্যোগ নেন। তিনি তখন একটি সুর তোলেন Voice of the people is the voice of God. তাঁরই নেতৃত্বে করাচীতে মুসলিম লীগের একটা কনভেনশন ডাকা হয়। তিনি ঢাকায় এসে মুসলিম লীগ কর্মীদের খরিদ করতে শুরু করেন। এভাবেই মুসলিম লীগ

দু'টুকরো হয়ে যায় এবং সরকারীপন্থী কনভেনশন মুসলিম লীগ তৈরী হয়। যাঁরা সেদিন সরকারের সাথে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা যে সবাই খারাপ মানুষ ছিলেন এমন নয়। কিন্তু আমি বলব তাঁদের এই কার্যকলাপে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়ে পড়ে, সেই সাথে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ ইতিহাসও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠতে থাকে।

মুসলিম লীগের নির্বাচিত সভাপতি কাইয়ুম খান তখনও জেলে। এ বিপর্যয়ের দিনে নূরুল আমীন এই আত্মঘাতী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য মুসলিম লীগ কর্মীদের আহ্বান জানালেন। সেই আহ্বান বোধ হয় আপাত ক্ষমতার সিঁড়িতে উঠবার মত সুযোগপ্রাপ্ত অনেকের কাছেই ভাল লাগেনি। তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আইয়ুবের আশীবার্দ প্রাপ্ত হয়ে মুসলিম লীগের পুনরুজ্জীবন আমরা চাইনি। আমরা চেয়েছিলাম কাইয়ুম খানের নেতৃত্বে মুসলিম লীগকে নিয়ে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে নামতে।

নূরুল আমীনের বাসভবনে প্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত মুসলিম লীগ নেতাদের নিয়ে একটা মিটিং হয়েছিল। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেনঃ সর্বজনাব শাহ আজিজুর রহমান, সৈয়দ শামসুর রহমান, হাশিম্দুদ্দীন আহমদ, বি এম ইলিয়াস, পনিরুদ্দীন, জনাব মাসুদ, রুহুল আমীন, আব্দুল করিম, সিরাজুদ্দীন, খাজা খয়েরুদ্দীন, সৈয়দ শহিদুল হক, আজিজুর রহমান, আব্দুল গফুর, শাহ ইকরামুর রহমান, আলাউদ্দীন আহমদ, শাহ আবদুল বারী, আবুল কালাম আজাদ, আব্দুস সালাম, আসাদুল্লা, আহমেদুর রহমান, আব্দুল হাকিম, সফিকুর রহমান ও আমি।

এ সময় মুসলিম লীগের জন্য আর একটা আঘাত অপেক্ষা করছিল। কাইয়ুম খানকে বাদ দিয়ে মুসলিম লীগের একটা অংশ খাজা নাজিমুদ্দীনকে সভাপতি করে কাউন্সিল মুসলিম লীগ তৈরী করে। কাউন্সিল মুসলিম লীগ কাইয়ুম বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু এটা সত্য, সরকার বিরোধী মুসলীম লীগ অংশের উপর তারা পুরো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

আমি সেদিন মুসলিম লীগের কোন পক্ষকেই সমর্থন জানাতে পারিনি। ব্যক্তিগতভাবে সারাজীবন মুসলিম লীগের খেদমত করলেও মুসলিম লীগের বিপর্যয়ের দিনে হাত- পা গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া আমার আর কিছুই করার ছিল না। দু'পক্ষের সবাই ছিল আমার পরিচিত। হয়ত কোন প্রয়োজনে কারও আমন্ত্রণে সাড়া দিলেও সেটা ছিল ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের কারণে। আদর্শের প্রয়োজনে নয়।

কনভেনশন মুসলিম লীগকে ব্যবহার করে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী নতুন সংবিধানের আওতায় পরিষদের নেতা নির্বাচিত হন। আইয়ুব তাঁর ক্ষমতার ভিত্তিকে মজবুত করতে সচেষ্ট হন। পাশাপাশি দেশে এ সময় আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনও গড়ে ওঠে। তাঁর অগণতান্ত্রিক আচরণের প্রতিবাদে রাজনৈতিক লোকজন একত্রিত হন এবং এভাবেই সম্মিলিত বিরোধী দল এন ডি এফ- এর জন্ম হয়। ঠিক হয়, এন ডি এফের নেতারা নিজস্ব দলের পুনরুজ্জীবন না ঘটিয়ে আইয়ুবের বিরোধিতায় সম্মিলিতভাবে আন্দোলন করবেন। কিন্তু গোল বাধান শেখ মুজিব। তিনি তাঁর নেতা সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশ উপেক্ষা করে আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবন করতে উদ্যত হন। এ নিয়ে সোহরাওয়ার্দীর সাথে তাঁর মনোমালিন্য হয়। সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবকে যে কোন কারণেই হোক স্নেহ করতেন। কিন্তু শেষ বয়সে মুজিবের অসৌজন্যমূলক আচরণে সোহরাওয়ার্দী অত্যন্ত ব্যথিত হন। শোনা যায় এই বেদনা নিয়ে তিনি বৈরুত চলে যান। সেখানে তিনি ইন্তেকাল করেন। পরে শুনেছি শেখ মুজিবের এই আচরণে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন 'এই লোকটিই এখন আমার দেশের ক্ষতি করবার চেষ্টা করছে'।

সোহরাওয়ার্দীকে উপেক্ষা করার মধ্য দিয়ে মুজিব তাঁর ভারতমুখী রাজনীতির ভেলায় উঠে বসেন। এতদিন সোহরাওয়ার্দীর বিশাল ব্যক্তিত্বের সামনে শেখ মুজিব যা ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারেননি। এবার তাঁর সামনে সে সুযোগ এসে যায়।

১৯৬৫ সালে আইয়ুব প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আয়োজন করেন। নির্বাচনকে সামনে রেখে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্যের এক অপূর্ব নজির স্থাপিত হয়। সম্মিলিত বিরোধী দল (কপ) কায়েদে আযমের বোন ফাতেমা জিন্নাহকে আইয়ুবের বিরুদ্ধে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করায়। এটা সত্য, সত্যিকার অর্থে যদি কোন নির্বাচন হত তবে সেদিন ফাতেমা জিন্নাহই নির্বাচিত হতেন। কিন্তু নির্বাচনের রায় পূর্ব নির্ধারিত ছিল। তাই আইয়ুবই আবার প্রেসিডেন্ট হলেন।

১৯৬৫ সালে পাক- ভারত যুদ্ধ হয়। যুদ্ধটা ছিল কাশ্মীরকে নিয়ে। ভারত চেয়েছিল এ যুদ্ধের মাধ্যমেই পাকিস্তানকে শেষ করে দিতে। কিন্তু পাকিস্তানের উপর কোন সামরিক বিজয় লাভ তো দূরে থাক এ যুদ্ধে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় ভারত।

আইয়ুব খান এ যুদ্ধকে জিহাদ হিসেবে ঘোষণা করেন। এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই আইয়ুবের সফল নেতৃত্বের কারণে পাকিস্তান ভারতের চক্রান্ত

নস্যাতে সমর্থ হয়। আইয়ুবের রাজনৈতিক ব্যবস্থা আমরা সমর্থন করতে না পারলেও একথা স্বীকার করতে হবে পাকিস্তানের উন্নয়নে তাঁর গতিশীল ভূমিকার কথা। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের সত্যিকার উন্নতি যা হয়েছে তা তাঁর আমলেই।

আমার মনে আছে যুদ্ধকালীন গভর্ণর মোনেম খান তাঁর সরকারী দফতরে সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনার জন্য সবক'টি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে আহ্বান করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে শেখ মুজিব যা বলেছিলেন তা রীতিমত পিলে চমকানোর মত। তিনি গভর্ণরকে প্রস্তাব দেন পাকিস্তানের এই ক্রান্তিলগ্নে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করলে নাকি তিনি মোনায়েম খানকে সকল রকম সহযোগিতা দেবেন। শেখ মুজিবের এই উক্তি ছিল রীতিমত রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক। তখনকার পরিস্থিতিতে সরকার অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

১৯৬৬ সালে মুজিব তাঁর ৬ দফা পেশ করেন। এটাকে তিনি নাম দেন বাঁচার দাবী। ৬ দফার প্রত্যেকটি শর্ত পড়লে যে কোন বিবেকবান লোকই স্বীকার করবেন এ ব্যবস্থায় প্রকৃত অর্থে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের এক হয়ে চলা সম্ভব ছিল না। অথচ মুজিব সেই দাবীই করেছিলেন। আসলে ৬ দফার অন্তরালে তাঁর বিচ্ছিন্নতার গোপন ইচ্ছা লুকিয়ে রেখেছিলেন। ৬ দফায় ছিল বিচ্ছিন্নতার বীজ। ৬ দফা মুজিবের মস্তিষ্কপ্রসূত ছিল না। এটা তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট নেতা খোকা রায়।

৬ দফার সাথে সাথে মুজিব তাঁর পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী প্রচারণা আরও বৃদ্ধি করেন। বাঙ্গালী এমনিতেই আবেগপ্রবণ জাতি। নিজের কর্তব্য কর্মের চেয়ে পরচর্চা ও পরের উপর দোষ চাপানোতেই তারা আনন্দ পায়। তারা যখন দেখল শেখ মুজিব আপাতদৃষ্টিতে তাদের হয়েই কথা বলছেন, তখন তারা তাঁর কথায় বিশ্বাস করতে শুরু করে। শেখ মুজিব তাঁর পুরনো ধারায় প্রচার করতে থাকে যে, পশ্চিম পাকিস্তানীরাই পূর্ব পাকিস্তানকে লুটে নিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে থাকার কতকগুলো ঐতিহাসিক কারণ ছিল। যখন ভারত ভাগ হয় তখন পশ্চিম পাকিস্তানে তিনটি পূর্ণাঙ্গ প্রাদেশিক রাজধানী ছিলঃ করাচী, লাহোর ও পেশাওয়ার। পাঞ্জাবের যে সেচ ব্যবস্থা ছিল তা উপমহাদেশের কোথাও ছিল না। সিভিল সার্ভিস ও অন্যান্য সার্ভিসেও তাদের বহু যোগ্য অফিসার ছিল। এর মোকাবিলায় পূর্ব পাকিস্তানের উল্লেখ করবার মত তো কিছুই ছিল না। এ আপাত বৈষম্য কাটিয়ে উঠবার জন্য তো সময়ের প্রয়োজন। রাতারাতি তো কেউ সার্ভিসে উচ্চ পদ পেতে পারে না, হঠাৎ করেই একটা অঞ্চলের উন্নতি সম্ভব নয়। এটা স্বীকার করতেই হবে ষাটের দশকে এসে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব

পাকিস্তান উন্নয়নের দিক থেকে খুব কাছাকাছি চলে আসতে শুরু করেছিল। আমার মনে পড়ছে যাদের দশকের শেষে এসে ইউনিভার্সিটিতে আমার সিনিয়র শফিউল আযম প্রদেশের চীফ সেক্রেটারী হয়েছিলেন। প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই বাঙ্গালী অফিসাররা ডিসি হিসেবে নিয়োগ পেতে শুরু করলেন। সেনাবাহিনীতে বাঙ্গালীদের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছিল ৩১%। যেখানে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মিতে পূর্ব পাকিস্তানী বাঙ্গালী সৈন্য খুঁজে পাওয়া যেত না। কিন্তু শেখ মুজিবের কাছে এগুলোর কোন গুরুত্ব ছিল না। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে একটা পলিটিক্যাল এজিটেটর বা রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টিকারী। এ কথাটা পরে তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় ভারতীয় বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান লে. জেনারেল অরোরা। মুজিব যখন পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় নেতা হয়ে উঠতে শুরু করলেন তখন তাঁর সাথে এক অদ্ভুত সম্পর্ক গড়ে ওঠে অবাঙ্গালী কতিপয় শিল্পপতির। আমার মনে পড়ছে সিন্ধু মুসলিম লীগ নেতা ইউসুফ হারুন ছিলেন আলফা ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের মালিক। তাঁর পূর্বাঞ্চলীয় সদর দফতর ছিল ঢাকার গুলিস্তানে। ইউসুফ হারুন আলফা ইন্স্যুরেন্সের পূর্বাঞ্চলীয় জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে শেখ মুজিবকে পছন্দ করেন। তিনি তাঁকে নিয়মিত বেতন ভাতা দিতেন। শোনা যায় ইউসুফ হারুন তাঁর পার্টির খরচের জন্যও টাকা পয়সা দিতেন। বলতে গেলে মুজিব তাঁর পার্টির কাজ কর্ম করতেন আলফা ইন্স্যুরেন্সের অফিসেই বসে।

ইউসুফ হারুনের এই মুজিব প্রীতির একটা কারণ ছিল। ইউসুফ হারুন ছিলেন জমিদার এবং পারিবারিকভাবে তাঁরা ছিলেন ভূট্টো পরিবারের প্রতিদ্বন্দ্বী। ভূট্টো ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের জনপ্রিয় নেতা। হয়ত ইউসুফ হারুন মুজিবের জনপ্রিয়তাকে ভূট্টোর বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন।

মুজিবের সাথে আদমজীদেরও সম্পর্ক ছিল। আব্দুল আউয়াল বলে চাঁদপুরের এক ছাত্রলীগ নেতা ছিল আদমজী গ্রুপের কর্মচারী। তাকে সবাই আউয়াল আদমজী বলে ডাকত। এই আউয়ালের মাধ্যমে মুজিব আদমজীদের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করতেন। তখন পূর্ব পাকিস্তানে ভাবনা ফুড প্রসেসিং ইন্ডাষ্ট্রি ছিল বেশ নামকরা। এক পাঞ্জাবী শিল্পপতি ছিলেন এটার মালিক। এরা জ্যাম জেলী ইত্যাদি প্রস্তুত করত। একবার মোহন মিয়ার সাথে আমি ভাবনা ইন্ডাষ্ট্রির মালিকের এলিফ্যান্ট রোডের বাসায় দাওয়াত খেতে গিয়েছিলাম। তাঁর ড্রইং রুমে যেয়ে দেখি ঘরের দেয়ালে শেখ মুজিবের বিরাট এক ছবি। এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিলেন মুজিব আমাদের নেতা। সেই বাসায় তখন মুজিবের এক বোনের জামাইকেও দেখলাম। তিনি ছিলেন এদের

কর্মচারী। মুজিব এই পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীর কাছ থেকেও অর্থ গ্রহণ করতেন। এ ধরনের দু'একটি ঘটনার উল্লেখ এ কারণে করলাম যে শেখ মুজিব গোপনে এসব অবাঙ্গালী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করতেন অথচ তাদেরই বিরুদ্ধে শোষণের অভিযোগে রাজপথ মুখর করতেন। মুজিবের একটা সুবিধাও ছিল। অবাঙ্গালীদের শোষণের কথা বলে তিনি তাদের কাছে একটা প্রেসার এলিমেন্ট হিসাবে দাঁড়িয়ে গেলেন। একারণে অবাঙ্গালীরা অনেক সময় ভয়ে তাঁকে স্বেচ্ছায় টাকা পয়সা দিয়ে আসত। বলাবাহুল্য অস্তিত্ব রক্ষার ভীতিই কাজ করত তাদের এ ধরনের অর্থ প্রদানের পেছনে।

মুজিব যখন ১৯৬৯ সালে জেল থেকে মুক্ত হয়ে আইয়ুবের গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান যান তখন লাহোর থেকে গাড়ীসহ যাবতীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছিল আদমজী। আমি তখন লাহোরে। সেখানে আউয়ালের সাথে দেখা। সে আমাকে বলল বড় ভাই সব ব্যবস্থা করতে এসেছি।

১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার মত একটা গুরুতর ষড়যন্ত্র উদঘাটিত হয়। এটিই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। ভারতের সহযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার এই কাজে মুজিব ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবসহ ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

এই মামলায় শেখ মুজিব এতদসংক্রান্ত সব অভিযোগ অস্বীকার করেন। শেখ মুজিব দীর্ঘদিন ধরেই পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় স্বার্থরক্ষা করে চলেছিলেন। ভারতীয় স্বার্থ রক্ষা করার জন্যই তিনি পূর্ব পাকিস্তানে বাঙ্গালীর অধিকারের কথা বলতেন। আর ভারতও জানত বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ভিত যত মজবুত হবে পাকিস্তানের বুনিয়াদ তত দুর্বল হবে। সেই পথ ধরেই পাকিস্তান দ্বিখন্ডিত হয়ে যাবে যা ছিল ভারতের আরাধ্য। বাংলাদেশ হওয়ার পর শেখ মুজিব যে এই সব ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিলেন তা নিজেই স্বীকার করেছেন। তাঁর দল এ জন্য গৌরব বোধ করে। তিনি যে ভারতীয় স্বার্থের রক্ষক হিসেবে এদেশে কাজ করতেন তা অনেকেরই জানা। ১৯৭২ সালে ৮ ও ৯ এপ্রিল আওয়ামী লীগের দলীয় কাউন্সিলে দেয়া এক ভাষণে তিনি বলেছিলেন ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা সত্যিকারের স্বাধীনতা ছিল না। আমি কোনদিনই এ স্বাধীনতার উপর বিশ্বাসী ছিলাম না। আমি বহুপূর্ব থেকেই এদেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করে আসছিলাম। শেখ মুজিব আরও বলেছিলেন সর্বপ্রকার সাহায্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তার

জন্য ভারতের সঙ্গে পূর্বেই তাঁর চুক্তি হয়েছিল। সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ভারত সাহায্য ও আশ্রয় দেবে এসব চুক্তি তিনি আগে থেকেই সম্পন্ন করেছিলেন।

ষড়যন্ত্র মামলা যখন চলছিল তখন তাঁর পক্ষ নেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির কতিপয় বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী শিক্ষক। এসব শিক্ষকের সামাজিক অবস্থান অর্জিত হয়েছিল পাকিস্তান হবার ফলেই। কলকাতার জগতে এদের কোন স্থান ছিল না। অথচ এরাই মুজিবের সাথে মিলেমিশে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন।

এরকম কয়েকজন প্রফেসরের কথা আমার মনে পড়ছে। প্রফেসর রেহমান সোবহান, আব্দুর রাজ্জাক, আবু মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ, খান সরওয়ার মোরশেদ প্রমুখ। রেহমান সোবহান ছিলেন টু ইকনমির প্রবক্তা। একটা দেশে দুটো ইকোনমি কি করে চলে তা বোঝা বেশ মুশকিল হত। আসলে তাঁরা টু ইকোনমি চাননি। টু কান্ট্রিই চেয়েছেন। এই রেহমান সোবহানদের সাথে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগাযোগও ছিল মধুর। শোনা যায় ফোর্ড ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে তাঁরা সে সময় বহু অর্থ বানিয়েছেন।

শেখ মুজিবের মামলায় আরও যাঁরা সমর্থন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে দুজনের কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে। একজন পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এস এম মোরশেদ। আর একজন জুলফিকার আলী ভুট্টো। মোরশেদ সাহেবের বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদ। দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকায় আসেন। মোরশেদ ভাল লেখাপড়া জানতেন। কিন্তু পাকিস্তানের আদর্শে তাঁর কতটুকু বিশ্বাস ছিল সে কথা বলা মুশকিল। আমার মনে আছে ষাটের দশকে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করে তিনি বিচারপতির আসনে বসে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদীদের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পালনে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। তখনকার পরিস্থিতিতে পাকিস্তান বিরোধী সংস্কৃতিসেবীরা রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করে বিচ্ছিন্নতার ঢেউকে পল্লবিত করতে মাঠে নেমেছিল মাত্র। কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ও শোষক জমিদার। তাঁর জমিদারী এলাকায় গরু কোরবানী নিষিদ্ধ ছিল। তিনি এতদূর সাম্প্রদায়িক ছিলেন যে তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠারও বিরোধীতা করেছিলেন।

পাকিস্তানের মৌল আদর্শের চেতনায় আঘাত করবার জন্য এই সব সংস্কৃতিসেবীরা মাঠে নেমেছিলেন। তাঁদের সেই অপকৌশলের সাথী হয়েছিলেন মোরশেদ।

আমি এসময় আরও একটা জিনিস অবাক হয়ে দেখেছি মোরশেদের মত পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী এবং সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত একদল মানুষ পাকিস্তানের বিরোধীতা করতে শুরু করেন। অথচ এদেশের আশ্রয় লাভের সুবাদেই তাঁরা উপরের সিঁড়িতে ওঠার সুযোগ পেয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে থাকলে হয়ত এটা কোনক্রমেই সম্ভব হত না।

১১

টাঙ্গাইলে জনসভা করার পর কাইয়ুম খান গেলেন মওলানা ভাসানীর সাথে দেখা করতে। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। মওলানার সেই টিনের ঘরে গিয়ে তিনি প্রায় পাঁচ ঘন্টা কাটান। আমি তখন মওলানার নির্মীয়মাণ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক রুমে বসে ছিলাম। তখন বেশ রাত নেমে এসেছিল। কাইয়ুম খান মওলানার কাছ থেকে ফিরে এসেই বললেন ইব্রাহিম মশার কামড়ে একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছি। মওলানা ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক। শুধু তাঁর কথা শুনতে হয়, বলার সুযোগ পাওয়া যায় খুব কম। এরপর আবদুল কাইয়ুম খান দেখলাম মওলানার বেশ তারিফ শুরু করলেন। বিশেষ করে তাঁর আধ্যাত্মিক কর্মকান্ডের কথা বলতে গিয়ে তিনি তাঁর প্রশংসা করলেন। বললেন মওলানা খুব দীনদার মানুষ। তারপর কাইয়ুম খান বললেন মওলানা যা বলেছেন তাতো সাংঘাতিক কথা। আমি বাঙ্গালী হলে এসব কথা জোরেশোরে বলতে পারতাম। আমি বললে সবাই ভুল বুঝবে। মওলানা বললেন, নির্বাচনে তিনি কেন যোগ দিচ্ছেন না। এতো সব সাজানো নাকট। আর্মির সাথে মুজিবের বোঝাপড়ার পরে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ ষড়যন্ত্রের পিছনে মদদ যোগাচ্ছেন ভুট্টো। যদিও তিনি আমার খুব ঘনিষ্ঠ। ইন্ডিয়া আছে সুযোগের অপেক্ষায়। এই ভাগাভাগির নির্বাচনে যদি কোন উল্টাপাল্টা হয় তখন ইন্ডিয়া এগিয়ে আসবে। কাইয়ুম খানের কথাগুলো এখনও আমার কানে বাজে। সন্তোষের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি যা বলেছিলেন তা শুধুমাত্র কয়েকদিনের মাথায় পাকিস্তানের উত্তাল রাজনৈতিক মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। কাইয়ুম খানের মত তেজোদ্দীপ্ত নেতাও মওলানার সাথে আলোচনার পর সেদিন আমার কাছে পাকিস্তানের ভবিষ্যতের ব্যাপারে শুধু হতাশাই ব্যক্ত করেছিলেন।

এরমধ্যে বাসায় একদিন আমার এক আত্মীয় নাদের হোসেন এল। সে ইপিআর- এ চাকরি করত। খাওয়া- দাওয়ার পর সে আমাকে বলল সব তো ঠিক হয়ে গেছে ভাই, কেন শুধু শুধু মুসলিম লীগ করছেন। পাকিস্তানের দালালী করে এখন আর কি হবে! আমরা তো ভিতরে ভিতরে সব প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছি। প্রয়োজনে যুদ্ধ করে বেরিয়ে আসব।

আমি বললাম নাদের তুমি এসব কি বলছ? মানুষের কল্যাণের জন্য আমরা পাকিস্তান বানিয়েছিলাম। এখনও মুসলমানদের স্বার্থে রাজনীতি করছি। এই চাঁদ তারা- পতাকার জন্যে কত রক্ত ঝরেছে তাকি তোমরা জানো? আমি

নাদেরকে আরও বললাম কায়েদে আযম, শেরে- ই- বাংলা, সোহরাওয়ার্দীরা পাকিস্তান বানিয়েছিলেন। তাঁদের মত নেতারা পশ্চিম পাকিস্তানীদের ষড়যন্ত্র ধরতে পারলেন না। ধরলেন গিয়ে তোর মুজিব। নাদের অবশ্য সেদিন আর কোন কথা বাড়ায়নি। কিন্তু ষড়যন্ত্রের গভীরতা টের পেলাম যখন মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণের পর পূর্ব পাকিস্তানের ইপিআর বাহিনীর সদস্যরা দল বেধে বিদ্রোহ করে বসল। শুধু তাই নয় পুলিশ ও আর্মির রিটায়ার্ড বাঙ্গালী সদস্যরাও একই ধুয়া তুলে বিদ্রোহ শুরু করল।

সর্বত্রই মুজিব তাঁর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে ফেলেছিলেন। পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন চলছিল পরিকল্পিত এক ছক কায়েমের জন্য। নাদেরের কথাবার্তা কোন বিচ্ছিন্ন উপাখ্যান নয়, বাংলাদেশ হওয়ার পর ভারতীয় কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন '৭০- এর নির্বাচনের আগে তারা মুজিবকে টাকা ও অন্যান্য বৈষয়িক সাহায্য দিয়েছেন। তখন পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিলাম নাদেরের কথার তাৎপর্য।

নভেম্বর মাসের ঘটনাবহুল দিনগুলোতেই পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলে ঘটল স্মরণকালের ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এক সাইক্লোন। প্রাকৃতিক আক্রোশের কবলে পড়ে প্রায় ১০ লাখ বনি আদম প্রাণ হারায়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তখন চীন সফরে ছিলেন। তাই তাৎক্ষণিকভাবে তিনি উপদ্রুত অঞ্চলে পৌঁছতে পারেননি। মুজিবের আওয়ামী লীগ এটা নিয়ে বলাবলি শুরু করল কেউ বাঙ্গালীদের দেখতে আসেনি। উপদ্রুত অঞ্চলে গিয়ে মুজিব প্রচার করতে লাগলেন, আমার বাঙ্গালীদের এই দুর্দশার দিনে যারা পাশে এসে দাঁড়ায়নি তারা বাঙ্গালীদের শত্রু। অথচ আমি জানি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রশাসনকে উপদ্রুত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ত্রাণ তৎপরতা চালাতে। বিদেশ থেকে এত বিপুল সাহায্য এসেছিল যা কল্পনাই করা যায় না। প্রকৃতির রূদ্র রোষের বিরুদ্ধে মানুষ এমনি খুব অসহায়। তারপর আরম্ভ হল নজিরবিহীন একের পর এক ঝড়- বৃষ্টি। কিন্তু '৭০- এর সাইক্লোনকে পুঁজি করে শেখ মুজিব মিথ্যাচারের যত রকমের কৌশল আছে সব ব্যবহার করলেন। তাঁর সব প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য একটাই ছিল সে হল পশ্চিম পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে এত বিদ্বেষ ছড়ান হচ্ছিল যে ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ জনগণের মধ্যে আমাদের সম্পর্কে তিলমাত্র বৈরীভাব ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানে বহু বাঙ্গালী স্থায়ীভাবে থেকে যেতে শুরু করেছিল। করাচীর বহু বাঙ্গালী পরিবারকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানতাম যারা সেখানেই স্থায়ীভাবে থেকে গিয়েছিল। এখনও প্রায় বিশ লাখ

বাঙ্গালী গোলাম মোহাম্মদ ব্যারেজে বসবাস করছে। এরা নানা পেশায় নিয়োজিত। কখনও তাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানীরা টু শব্দটিও করেনি। বাংলাদেশ হওয়ার পর ১৯৯০ সালে আমি যখন রাষ্ট্রীয় অতিথী হিসেবে পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মীদের এক পুরষ্কার প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদান করি, তখন করাচী লাহোর ও পিন্ডির ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে ছিলাম। লিফটম্যান, কুক, বেয়ারার সার্ভিস বয় অনেককেই দেখলাম বাঙ্গালী, জিজ্ঞাসা করলে বলল আমরা আর ফিরে যাইনি। আসলে এখন বোঝায় যায় না এরা বাঙ্গালী। মনে আছে '৬৫ সালের পাক- ভারত যুদ্ধের পর যখন লাহোরে যাই তখন আমাদের বাঙ্গালীদের নিয়ে ওখানকার লোকের কি উচ্ছাস। ভারতের সাথে যুদ্ধে বাঙ্গালীদের বীরত্বে তারা অবাক হয়ে গিয়েছিল। আমাদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাও বেড়ে গিয়েছিল অনেক গুণ। আমি যখন লাহোরের বিখ্যাত আনারকলি মার্কেটে যাই কেনাকাটার জন্য তখন ইস্ট পাকিস্তান থেকে এসেছি শুনে তাদের সে কি সমাদর! বিনা পয়সায় নানা ফল আমার হাতে তুলে দিল। হোটেলে খেতে গিয়েছি পয়সা নিল না। এমন কি কাপড়ের দোকানেও প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অনেক কম দামে আমার কাছে কাপড় বিক্রি করল।

লাহোরে ঐতিহাসিক শাহী মসজিদ দেখতে গেলাম। আমার সাথে ক'জন বাঙ্গালী বন্ধু ছিলেন। মসজিদ দেখার পর মনে হলো এখানে না এলে লাহোর সফরই বৃথা যেত। কিন্তু সেখানে যে আরেকটি অবাক করা ঘটনা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল তা আগে ভাবতে পারিনি। মসজিদের সিঁড়িতে দু'জন লোক দেখলাম আমাদের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। এঁদের একজন শুভ্র কেশ আর অন্যজন মধ্যবয়সী। আমরা তাঁদের পাশ দিয়ে যাবার সময় শুভ্রকেশী ভদ্রলোক বিনয়ের সাথে আমাকে জিজ্ঞাস করলেন, 'কিয়া আপলোগ মাশরেকি পাকিস্তানছে তশরিফ লায়ে হ্যায়?' আমি বললাম, জ্বি হ্যাঁ, কিউ কই খাস বাত? ভদ্রলোক মনে হল একটু বিব্রত বোধ করলেন আমার কথায়। বললেন, 'নেহি এইসি কই খাস বাত নেহি। লেকিন মাশরেকি পাকিস্তানী ভাইয়োছে মিলনে কো লিয়ে হাম দো রোজছে ইহা চক্কর লাগা রাহা হ্যায়। ইস জংমে আপ লোগোকা বাহাদুরি, জুরত, হিম্মত আওর আল্লাহকা রাহমে কোরবান হোনেকা জো জজবা দেখা হ্যায় উসকা কই মিসাল নেহি হ্যায়। হামারা দিলমে এক খায়েশ পয়দা হুয়া হ্যায় কে হাম আপনা মাশরেকি পাকিস্তানী ভাইয়োকো মেহমান বানায়ে। আল্লাহপাককে হুকুমছে আপ লোগ মিল গেয়ে।'

ওরা দু'জন আমাদের পেছনে এমনভাবে লাগল যে শেষ পর্যন্ত ওদের সাথে ওদের বাসায় যেতে হল। রীতিমত ভিআইপি ট্রিটমেন্ট। ওদের

মেহমানদারীর কোন তুলনা হয় না। আজও যখন এসব কথা মনে হয় তখন এই বিনম্র দুই পশ্চিম পাকিস্তানী মুসলমান ভাইয়ের যে মহানুভবতা আমি নিজের চোখে দেখেছি তা কোন অর্থ কিংবা বৈষয়িক সুবিধার বিনিময়ে পাওয়া যেতে পারে না। পশ্চিম পাকিস্তানীদের এরকম ব্যবহারের ভুরি ভুরি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

লাহোরে বসেই শুনেছিলাম বাঙ্গালী সৈনিকদেও বীরত্বের কথা। ডিনামাইট বুকে বেঁধে শিয়ালকোটে ভারতীয় ট্যাংকের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা রক্ত দিয়ে পাকিস্তানের জমিন রক্ষা করেছিল সেদিন।

আমি আজও আশ্চর্য হয়ে ভাবি মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে বাঙ্গালীদের সেই আত্মত্যাগের ইতিহাস কি করে প্রতিহিংসা পরায়ণতায় পর্যবসিত হল।

১৯৬৫ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্তে বাঙ্গালী সৈন্যরা যখন রক্ত দিচ্ছে তখন পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙ্গালী বীরত্বকে নিজের বিজয় গাঁথা হিসেবে মেনে নিয়েছিল। ইতিহাসের পরিহাস, পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা যখন ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে শত্রুর বিরুদ্ধে রক্ত ঝরাতে শুরু করল তখন উল্টো ব্যাখ্যা দেয়া হতে থাকল। '৬৫ সালের যুদ্ধের পর যখন ভারত দেখল সামনা সামনি যুদ্ধে পাকিস্তানকে কাবু করা যাবে না তখন তারা নিল চানক্যের পথ। ভাই ভাইয়ের মধ্যে বিরোধী উসকে দিয়ে তারা ইতিহাসের সুবর্ণ সুযোগ লুফে নিল।

নভেম্বরের প্রলয়ংকরী ঝড়ের পর পূর্ব পাকিস্তানের অনেক নেতাই নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। এঁদের মধ্যে মওলানা ভাসানী ছিলেন অন্যতম। সাইক্লোনের পর উপকূল অঞ্চলে নির্বাচন অনুষ্ঠানের অবস্থাও ছিল না। কিন্তু মুজিব নির্বাচন পিছানোর ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। তিনি একে ষড়যন্ত্র বলে রা রা করে উঠলেন। পাকিস্তানের সামরিক কর্তারা নির্বাচন পিছানোর গোপন সিদ্ধান্ত নিয়েও পরে সেখানে থেকে পিছিয়ে গেল। পরে শুনেছি এর পিছনে অনেক দুরভিসন্ধি কাজ করেছিল। মুজিবের সাথে ইয়াহিয়ার এই মর্মে একটা আঁতাত হয়েছিল নির্বাচনে জিতলে তিনি হবেন প্রধানমন্ত্রী আর ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্টই থেকে যাবেন। মুজিব তাতে বাদ সাধবেন না। ক্ষমতার রাজনীতিতে কত বিচিত্র ও অদ্ভুত ঘটনা ঘটে তা ভেবেই পাওয়া যায় না। এই জন্যই দেখেছি পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সে সময় আর্মি যেন একটা গা ছাড়া ভাব দেখাতে শুরু করল। আমরা বলেছিলাম ভোট কেন্দ্রগুলোতে আর্মি দিতে। যাতে নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা যায়। সামরিক প্রশাসন আমাদের কথায় আমল দেয়নি। যার ফলে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ব্যাপক গুন্ডামী করেছে। ভোট কারচুপি

করেছে। নির্বাচনের সময় বিরোধী দলগুলোর মিটিংএ হামলা করেছে। যেহেতু নির্বাচনের ফলাফলে আওয়ামী লীগ জিতেছিল এবং তখনকার রাজনৈতিক পরিবেশ হয়ে গিয়েছিল বিষাক্ত সে কারণে এ সব কথা চাপা পড়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষ শুধু এটুকুই বুঝতে পেরেছে। নির্বাচনের রায়ের পর কেন ক্ষমতা আওয়ামী লীগের হাতে হস্তান্তার করা হচ্ছে না। এ সময় ইয়াহিয়া খান নিজেই অনেকবার পূর্ব পাকিস্তানকে অধিকতর স্বায়ত্বশাসন দেয়ার কথা বলেছেন। আওয়ামী লীগ এতকাল স্বায়ত্বশাসনের কথা বলত। দেশের মানুষ দেখল স্বয়ং প্রেসিডেন্টই যখন স্বায়ত্বশাসনের কথা বলছেন তখন আওয়ামী লীগের দোষ কি। ইয়াহিয়ার এ ধরণের ভূমিকা প্রকারান্তরে মুজিবের বিচ্ছিন্নতার দাবীকেই পু করেছে মাত্র।

ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন হল। আর্মির অদূরদর্শিতা ও মুজিবের ব্যাপারে সীমাহীন উদাসীন মনোভাব এবং ডানপন্থী দলগুলোর নজিরবিহীন অনৈক্যের মুখে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ১৬০টি আসনের মধ্যে ১৫৮টিতেই জয় লাভ করল। বাকী দুটো আসনের একটিতে জিতেছিলেন নূরুল আমীন আর অন্যটিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের ভোটে জিতেছিলেন রাজা ত্রিদিব রায়।

পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। এই নির্বাচন ছিল অবিভক্ত পাকিস্তানের সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচন। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতাই অবিভক্ত পাকিস্তানকে বিভক্তির দিকে ঠেলে দিল।

নির্বাচনে জিতেই মুজিব ও ভুট্টো দু'জনেই তাঁদের গোপন পরিকল্পনা নিয়ে আগ্রসর হলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে যেমন আওয়ামী লীগের কোন অস্তিত্ব ছিল না তেমনি পূর্ব পাকিস্তানেও পিপিপি কোন সমর্থন পায়নি। যার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে বসে মুজিব ও পশ্চিম পাকিস্তানে বসে ভুট্টো ষড়যন্ত্র শুরু করলেন।

মুজিবের দাবী ছিল সামরিক আইন প্রত্যাহার করে অবিলম্বে ক্ষমতা তাঁর কাছে হস্তান্তর করা। ইয়াহিয়া মুজিবের সাথে তাঁর ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র বিষয়ে খোলাখুলি আলাপ করতে চেয়েছিলেন। এই ব্যাপারটি নিয়েই বাধল গোলযোগ। মুজিব বললেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে ইয়াহিয়ার উচিত তাঁর কাছে ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া। শাসনতন্ত্র নিয়ে আলাপ করার ইয়াহিয়ার কোন এক্তিয়ার নেই। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা সত্য হলেও এর মধ্যেই ছিল মুজিবের গোপন ইচ্ছা। ড. কামাল হোসেন প্রমুখকে দিয়ে তিনি একটা শাসনতন্ত্রের খসড়া তৈরী করে ফেলেছিলেন। এটা ছিল তাঁর গোপন স্বাধীন বাংলাদেশের পরিকল্পনার ভিত্তিতে

প্রণীত যার মানে অবিভক্ত পাকিস্তানের দাফন- কাফন সম্পন্ন করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। ওদিকে ভুট্টো আরও এক পা এগিয়ে দুটো কনস্টিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলীর কথা ঘোষণা করলেন। দু'জন প্রধানমন্ত্রীর কথাও বললেন। যার মানে পাকিস্তান দ্বিখন্ডিত হয়ে যাওয়া।

মুজিব ও ভুট্টো দু'জনের কেউই পাকিস্তানের সংহতি কামনা করেননি। দু'জনেই আপাতদৃষ্টিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন গরীবের বন্ধু ও ত্রাতা হিসেবে। মূলতঃ এরা ছিলেন মীর জাফর।

নির্বাচনের পর পরই একদিন আমি আবুল হাশিমের বাসায় বসা। হঠাৎ দেখি মুজিব ও জহিরুদ্দীন হাশিম সাহেবের সাথে দেখা করতে এসেছেন। বোধ হয় নির্বাচনে জিতে সৌজন্য সাক্ষাত করতে এসেছিলেন তাঁরা।

হাশিম সাহেব চোখে দেখতেন না। মুজিবের গলার আওয়াজ পেয়েই তিনি বললেন মুজিব তুমি এসেছ। আমি খুব খুশী হয়েছি।

পাকিস্তান আন্দোলনের সময় মুজিব হাশিম সাহেবের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছিলেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের পর তিনি তাঁকেই গুরু হিসেবে মানতেন। হাশিম সাহেবকে তিনি সব সময় স্যার স্যার বলে ডাকতেন। হাশিম সাহেব বললেন মুজিব আমি শুনেছি কাইয়ুম ও দৌলতানার মুসলিম লীগ তোমাকে ভুট্টোর বিরুদ্ধে সমর্থন দিতে রাজি হয়েছে। খেলার মাঠে ভাল দল কখনও মারামারি করে না। তুমিতো ভাল খেলেছো এবং সামনেও ভাল খেলবে আশা করি। তোমার প্রতি আমার অনুরোধ তুমি কোন প্রোভোকোশনে যাবে না। আমি দীর্ঘদিন রাজনীতি করেছি। আমি জানি তোমাকে অসৎ পরামর্শ দেয়ার লোকের অভাব নেই, আশা করি সেটা থেকে তুমি দূরে থাকবে। তুমি তো জান আমি এখানে এসেছি সর্বহারা মুহাজির হয়ে। পশ্চিমবঙ্গে আমার সবই ছিল। ওখানে আমি থাকতে পারিনি। আমার আত্মীয়- স্বজনরাও ওখানে অনেকে আছে। যতদূর জানি তাদের অবস্থা ভাল না। তুমি নিজেও পাকিস্তান আন্দোলন করেছ। হয়ত পাকিস্তান পেয়েও আমাদের অনেকের অনেক স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। তা সত্ত্বেও এ দেশ আমরাই তৈরী করেছি। আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় এটা আরও সুন্দর হবে।

আবু হাশিম মুহাম্মদ (সাঃ)- এর একটা বাণী শুনালেন, দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। তোমরা পাকিস্তানের কোন ক্ষতি করো না।

আমার মনে পড়ছে মুজিব যতক্ষণ ছিলেন তিনি প্রায় নীরব ছিলেন। হাশিম সাহেবের কথার কোন প্রতিবাদ বা বিরোধিতা করেন নি। তবে এসব উপদেশ শোনার মত তাঁর কোন অবস্থা ছিল বলে মনে হয় না।

দিন যত যেতে লাগল মুজিবের আচরণ তত জঙ্গী হয়ে উঠতে লাগল। একদিকে তিনি ইয়াহিয়ার সাথে বারগেনিং করছেন অন্যদিকে তাঁর লোকজন কুচকাওয়াজ করছে, সশস্ত্র ট্রেনিং নিচ্ছে, আওয়ামী লীগের তরুণ কর্মীরা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রূপরেখা তৈরী করছে। এসব কিন্তু চলেছে মুজিবের প্রশ্রয়ে ও ইন্ধনে। ২রা মার্চ ইউনিভার্সিটিতে নোয়াখালীর আ স ম রব, স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তুলল। ইউনিভার্সিটিতে সে রাজনীতি করতে করতে বড় নেতা হয়ে ওঠে।

এই সার্বিক অব্যবস্থা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ৩রা মার্চ '৭১ সালে ইয়াহিয়া ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন। সে অধিবেশনের পরিপ্রেক্ষিতে ভুট্টো ডিগবাজী দিলেন। তিনি অধিবেশন স্থাগিত করে দিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ভুট্টো। পরিষদ সদস্যদের এই মর্মে হুঁশিয়ার করলেন, যে ঢাকার অধিবেশনে যোগ দেবে তার পা ভেঙ্গে দেয়া হবে। তিনি বলেছিলেন অধিবেশন ডেকে কোন লাভ নেই। এমন কি তা যদি পাকিস্তানের স্বার্থের বিরুদ্ধেও যায়। আপাতদৃষ্টিতে ভুট্টোর কথায় যুক্তি ছিল কিন্তু তাঁর প্রাণপণ চেষ্টা ছিল মুজিব যাতে কোনভাবেই ক্ষমতায় যেতে না পারেন। ভুট্টো পাকিস্তানের তরক্কির জন্য এ দাবী করেননি। তাঁকে ইন্ধন যুগিয়েছিল সামরিক বাহিনীর কিছু উচ্চাভিলাষী জেনারেল। মুজিব আর ভুট্টো কেউ কাউকে বিশ্বাস করতেন না। দু'জন একে অপরকে অবিশ্বাস করতেন।

ভুট্টোর চাপে ইয়াহিয়া পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। ইয়াহিয়ার এই সিদ্ধান্তই পূর্ব পাকিস্তানে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

ইয়াহিয়া তখন বাঘের পিঠে সওয়ার। তিনি না পারছিলেন ভুট্টোকে খুশী করতে না পারছিলেন মুজিবের দাবী মানতে। কারও দাবীই মানার মত ছিল না। কেননা তাঁদের যে কারও দাবী মানতে গেলেই অবিভক্ত পাকিস্তান থাকত না। ইয়াহিয়া মুজিবের সাথে পরামর্শ করে পরিষদের অধিবেশন দিয়েছিলেন। কিন্তু মুজিব রাজপথে এসে তাঁর সুর পাল্টে ফেললেন। তিনি আবার তাঁর স্বভাবসুলভ মিথ্যাচার করে বললেন এটা বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। তিনি তাঁর কর্মীদের আইন ভাঙ্গার জন্য উসকে দিতে শুরু করলেন।

এরমধ্যে একদিন সবুর সাহেব মুজিবকে টেলিফোন করে তাঁর ধানমন্ডির বাসায় নিয়ে আসেন। আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সবুর সাহেব বললেন, মুজিব তোমার সাথে পরামর্শ করেইতো ইয়াহিয়া অধিবেশনের দিন পিছিয়েছেন। এখন তুমি কেন এটাকে পুঁজি করে অরাজকতা সৃষ্টি করছ? তুমি ইয়াহিয়ার সাথে

কোন ভাষায় কথা বলেছিলে? বাংলা, ইংরেজী না উর্দুতে? মুজিব এসব প্রশ্নের সরাসরি কোন উত্তর দিলেন না। তিনি দেখলাম এক অস্পস্টতার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখলেন।

৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে মুজিব উত্তেজনা সৃষ্টিকারী এক ভাষণ দিলেন। মুজিবের ভাষণের মধ্যে রাজনীতিসূলভ তেমন কোন বক্তব্য ছিল না। যা ছিল তা উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলার বারূদে আগুন জ্বালাবার জন্য যথেষ্ট। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা এই ভাষণকেই স্বাধীনতার ভাষণ বলে চালিয়েছিল। এই ভাষণের পর দেখলাম আওয়ামী লীগের সশস্ত্র ক্যাডাররা বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনতার দাবীতে জ্বালাও পোড়াও শুরু করল। অনেক জায়গায় আর্মির সাথে তারা রীতিমত সশস্ত্র লড়াইয়ে অবতীর্ণ হল। পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা এ সময় আওয়ামী লীগের টার্গেটে পরিণত হল। একদিন শুনতে পেলাম আওয়ামী লীগের সশস্ত্র কর্মীরা ঢাকার আর্মসের দোকানগুলো লুট করে নিয়ে গেছে। বুঝতে বাকী থাকল না এসব কিছুর জন্য দায়ী হচ্ছে আওয়ামী লীগ। শাহবাগে হাসান আসকারী, সুলতানুদ্দীনের (সাবেক গভর্ণর) মত মুসলিম লীগ নেতাদের বাসায় আওয়ামী কর্মীরা আগুন লাগিয়ে সব কিছু লুট করে নিয়ে যায়।

আমার মনে পড়ছে টঙ্গী ও গাজীপুরে বিনা উস্কানীতেই সশস্ত্র আওয়ামী লীগ কর্মীরা আর্মির উপর হামলা চালিয়েছিল। আর্মির পাল্টা হামলায় কয়েকজন আওয়ামী লীগ কর্মী নিহত হয়। পরবর্তীকালে গাজীপুরের আওয়ামী লীগ কর্মীরা একে স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে দাবী করে এবং গাজীপুর চৌরাস্তার কেন্দ্রস্থলে এই ঘটনার স্মরণে একটা মূর্তি নির্মাণ করে। একেই বলা হয়ে থাকে মুক্তিযুদ্ধ ভাস্কর্য।

আর একটা আশ্চর্যের ব্যাপার আওয়ামী লীগের সশস্ত্র কর্মীরা যেন পরিকল্পিতভাবেই অবাঙ্গালী মুসলমান ভাইদের উপর এ সময় হামলা শুরু করল। তাদের বাড়ী ঘর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য স্থাপনাগুলো যেন বেছে বেছে আওয়ামী লীগের ক্যাডার কর্মীদের আক্রমণের বস্তু হয়ে দাঁড়াল। এ সবের উদ্দেশ্য একটা বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। খুলনার খালিশপুর, যশোরের ঝুমঝুমপুর, রংপুরের সৈয়দপুরের মত এলাকায় বিহারীরা অধিক সংখ্যায় বাস করত, তাদের উপর নির্বিচারে আওয়ামী লীগ গণহত্যা চালিয়েছিল। এমনকি ময়মনসিংহে মসজিদে আশ্রয় নেয়া বিহারীদের উপর গিয়ে চড়াও হয়েছে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা। চাটগাঁয়ে রেল স্টেশনের নিকটবর্তী রেস্ট হাউসে নিয়ে বিহারীদের যেভাবে জবাই করা হয়েছে তা শুনে আমি পরবর্তীকালে হতবাক হয়ে

গিয়েছি। শুধু তাই নয়, বিহারী মেয়েদের উপর চালান হয়েছে পাশবিক নির্যাতন। এগুলো ২৫শে মার্চ রাতে আর্মি ক্র্যাক ডাউনের বেশ আগের ঘটনা।

মার্চ মাসের এই অরাজক দিনগুলোতে ইয়াহিয়া ঢাকায় এলেন মুবিজের সাথে শেষ বোঝাপড়া করতে। পূর্ব পাকিস্তানে অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে এটা ছিল তাঁর শেষ সফর। সারা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে তখন চলছে হরতাল, মিছিল আর অসহযোগ। বেসামরিক প্রশাসন বলতে কিছু ছিল না। পুলিশ আর ইপিআর সদস্যরা ছিল সবাই বাঙ্গালী। দেশের সর্বত্র গোপনে আওয়ামী ক্যাডাররা সশস্ত্রভাবে ঘোরাফেরা করতে লাগল, পাশাপাশি তারা বিভ্রান্ত তরুণদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করল। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যে বাংলাদেশ তৈরী হবে তার প্রস্তুতি তখনই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইয়াহিয়া মুজিবের সাথে ১৬ থেকে ২৪শে মার্চ পর্যন্ত আলাপ- আলোচনা চালিয়েছিলেন। এ আলোচনায় ইয়াহিয়া মুজিবকে সব রকমের ছাড় দিয়ে শুধু অখন্ড পাকিস্তান অক্ষত রাখতে চেয়েছিলেন। ছয় দফার দাবীগুলোও ইয়াহিয়া মেনে নিতে রাজী হয়েছিলেন।

ইয়াহিয়া পাকিস্তান ভাঙ্গতে চাননি তবে মুজিবের দাবীর প্রতি ছিলেন সহানুভুতিশীল। মুজিব গোপনে পাকিস্তান ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র করেছিলেন এটা আজ ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু প্রকাশ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়ার মত মানসিক শক্তি তাঁর ছিল না। ফলে ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনার প্রথম দিকে মুজিব আপাতদৃষ্টিতে হলেও একটা রফা করতে চেয়েছিলেন সেটা ছিল এরকমঃ মুজিব হবেন প্রধানমন্ত্রী। ভুট্টো হবেন উপ- প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৫ জন করে মন্ত্রীসভার সদস্য থাকবেন। পাকিস্তানের আপদকালীন সময়ে পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষাকারী এর চেয়ে উত্তম কোন ফর্মূলা হতে পারত বলে আমার মনে হয় না। এরকম একটা আপোস ফর্মুলা নিয়ে যখন মুজিব- ইয়াহিয়া আলোচনা এগুচ্ছিল তখন আওয়ামী লীগের হার্ড লাইনার নেতারা বাদ সেধে বসলেন। এদের মধ্যে তাজউদ্দীন ছিলেন অন্যতম। তিনি আমার ছোট ভাইয়ের সাথে লেখাপড়া করতেন।

পাকিস্তান আন্দোলনের সময় ঢাকায় তিনি আমার সাথে কাজ করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি হয়ে যান ভারতপন্থী। এমনই ভারতপন্থী তিনি হয়ে গিয়েছিলেন যে বাংলাদেশ হওয়ার পর মুজিবের মত মানুষও তাঁর ভারতপ্রীতির জন্য বিরক্ত হয়ে মন্ত্রীসভা থেকে তাঁকে সরিয়ে দেন।

আলোচনা চলাকালে এই তাজুদ্দীন ও তাঁর সহযোগীদের চাপে মুজিব হঠাৎ করেই একদিন (২১শে মার্চ) ইয়াহিয়ার সাথে এক অনির্ধারিত বৈঠকে

মিলিত হন। এ সময় তাঁর সাথে তাজউদ্দীনও ছিলেন। তাঁরা ইয়াহিয়াকে সোজাসুজি জানিয়ে দেন আওয়ামী লীগ এখন আর কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার ধারণায় বিশ্বাসী নয়। তাঁরা চান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ভিন্ন ভিন্নভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। এর মানে হচ্ছে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়া। এইভাবেই মুজিব- ইয়াহিয়া আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

এ আলোচনার পুরো বিষয়বস্তু নিয়ে আজ দেশের মধ্যে এক ধরণের বিভ্রান্তি রয়েছে। যারা বলে থাকেন আর্মি মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি বলেই পাকিস্তান ভেঙ্গে গিয়েছে- এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আর্মি ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চেয়েছিল। অন্যদিকে মুজিব পাকিস্তান ভাঙ্গতে চেয়েছিলেন। এরকম একটা অবস্থায় যাঁরা অখন্ড পাকিস্তান দেখতে চেয়েছিলেন তাঁরা কোনক্রমেই মুজিবের দাবী মেনে নিতে পারতেন না।

আমার মনে আছে ২৩শে মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস। এ দিনেই ফজলুল হক ১৯৪০ সালে লাহোরের মুসলিম লীগ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তিনি মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের জন্য লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। তখন কাইয়ুম খান ঢাকায়। উনি উঠেছিলেন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে, আমি তাঁর সাথে দেখা করতে গেলাম। চারদিকে আর্মি সশস্ত্র অবস্থায় পাহারা দিচ্ছে। কাইয়ুম খান আমাকে নিয়ে হোটেলের ছাদে উঠে ঢাকার আকাশের দিকে তাকিয়ে আক্ষেপের সাথে বললেন দেখো ইব্রাহিম আজ পাকিস্তান দিবস। একটাও পাকিস্তানের চাঁদ তারা পতাকা দেখছ? বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলাম হ্যা, তাঁর কথাই সত্যি।

পরের দিন ২৪শে মার্চ যখন কাইয়ুম খান চলে যান তখন আমি প্রথম জানতে পারি আর্মিকে বিদ্রোহ দমনে নামানোর সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।

কাইয়ুম খান চলে যাওয়ার আগে আমাকে বললেন মুজিবকে এত করে বুঝালাম পাকিস্তানের কোন ক্ষতি করো না। তিনি একেবারে বেপরোয়া, আমাদের কথায় সাড়া দিলেন না। তারপর আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন ইব্রাহীম আর ঢাকায় আসতে পারব কিনা জানি না। তোমাদের সাথে আর কখনও দেখা হবে কিনা বলতে পারছি না। তোমাদের আল্লাহর হাতে সঁপে দিয়ে গেলাম।

১২

কাইয়ুম খানের সাথে এই আমার শেষ দেখা। বাংলাদেশ হওয়ার পরও তিনি বেশ কিছুদিন বেঁচে ছিলেন। কিন্তু আমার আর কখনও সুযোগ হয়নি তাঁর সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ করার।

২৫শে মার্চ পাকিস্তান আর্মি ঢাকা শহরে বেরিয়ে আসে। আর্মি ক্র্যাক ডাউনের পরিকল্পনা কিভাবে করেছিল বলতে পারব না। এ ধরনের রাজনৈতিক জটিলতা কখনও সামরিকভাবে মোকাবেলা সম্ভব নয়। আর তাছাড়া তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আর্মির কোন ভূমিকা পালনের অনুকুলে ছিল না। আমার মনে হয় না আর্মি তাদের অপারেশনের আগে কোন রাজনৈতিক নেতার সাথে আলাপ করেছিল। পাকিস্তান পন্থী বহু রাজনীতিবিদ ছিলেন যাঁদের সাথে আর্মি আলাপ করলে এ ধরনের রাজনৈতিক জটিলতা মোকাবেলা অধিকতর সহজ কাজ হত। ২৫শে মার্চেই দেখলাম পুরো ঢাকায় একটা আতঙ্কের ভাব। অনেকেই ঢাকা থেকে নীরবে সরে পড়েন। শেখ মুজিব নিজেই পাকিস্তান আর্মির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। (পরে শুনেছি শেখ মুজিব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঢাকাস্থ প্রতিনিধির মধ্যস্থতায় আর্মির কাছে ধরা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এর দ্বিবিধ করণ হতে পারে। প্রথমতঃ নিজেকে নিরাপদ করা। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়ার মত বড় ঝুঁকি থেকে দূরে সরে থাকা।) কিন্তু আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পান। আমি এ জিনিসটা সহজে বুঝতে পারি না আর্মি যখন ক্র্যাক ডাউন করার সিদ্ধান্ত নিল তখন কেন আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আর্মিও তখন এক ধরনের সিদ্ধান্তহীনতার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিল। যদি বিদ্রোহ দমন করাই উদ্দেশ্য হয় তবে এ সব নেতাদের পালিয়ে যেতে দিয়ে ভারতের মাটিতে বসে ষড়যন্ত্রের সুযোগ দেয়া হল কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর হয়ত মহাকালই দিতে পারবে। আরও একটা জিনিস আমি উল্লেখ না করে পারছি না, বাংলাদেশ হওয়ার পর একটা প্রচারণা সব সময় আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছি, আর্মি নাকি নিরীহ বাঙ্গালীদের উপর হামলা চালিয়েছিল। যেখানে বাংলাদেশের জন্য নতুন পতাকা উড়ানো হচ্ছে, সশস্ত্র সামরিক কুচকাওয়াজ চলছে, সামরিক বাহিনীর সাথে বিভিন্নস্থানে যুদ্ধ চলছে সেখানে কি করে আর্মি নিরীহ মানুষের উপর হামলা চালাল তা আমি আজও বুঝতে পারি না।

মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণকে আওয়ামী লীগ দাবী করে স্বাধীনতার ভাষণ। তা যদি সত্য বলে ধরে নিতে হয় তাহলে একটা প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্রোহ ঘোষণার অনেক পরে আর্মি বিদ্রোহ দমন করতে নেমেছিল।

২৫শে মার্চ রাতে আমি আমার ওয়ারীর বাসায় অবস্থান করছিলাম। রাত বারটা/একটার দিকে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়। বেশ গোলাগুলির আওয়াজ পাচ্ছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল কোর্ট বিল্ডিং-এর দিক থেকে গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কোর্ট বিল্ডিং-এর পিছনে পুরনো ঢাকার তাঁতীবাজার এলাকা। বাড়ীর দোতলার ছাদে উঠে বুঝতে পারলাম কি! দেখলাম মাঝে মাঝে আগুনের গোলার মত কি যেন ঢাকার আকাশ আলোকিত করে ফেলেছে। এগুলো ছিল কামানের গোলা। আমাদের মহল্লায় দেখলাম কিছু তরুণ কাঠের গুড়ি ফেলে রাস্তা বন্ধ করার চেষ্টা করছে। বুঝলাম এরা আওয়ামী লীগের কর্মী। সম্ভাব্য আর্মির আগমণের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিচ্ছে। পরদিন সকালে আমি কৌতুহলবশতঃ কোর্ট বিল্ডিং-এর দিকে বাসা থেকে হাঁটতে হাঁটতে রওনা হলাম। তখন কারফিউ ছিল না। গিয়ে দেখি ঐ এলাকার সবাই সরে পড়েছে। শুনলাম নদীর ওপার জিঞ্জিরার দিকে গেছে। শাখারী বাজার, তাঁতীবাজার এলাকার ভিতরে ঢুকে দেখি আর্মি এসব এলাকায় গুলি চালিয়েছে। কয়েকটা বাড়ী দেখলাম পোড়া। এ সব বাড়ীর মধ্যে কয়েকটা লাশ তখনও অল্প আগুনে পুড়ছিল।

তারপর গেলাম ইউনিভার্সিটির দিকে। এখানেও আর্মি হামলা করেছিল। আমি গিয়ে শুনতে পেলাম ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর জি সি দেব নিহত হয়েছেন। তাঁকে চিনতাম। তিনি অনেকটা ঋষির মত ছিলেন দেখতে। জি সি দেব ধুতি আর পাঞ্জাবী পরে চলাফেরা করতেন। তাঁর মৃত্যুতে আমি দুঃখিত হয়েছিলাম। জ্ঞানী ব্যক্তিদের মৃত্যুতে দেশেরই ক্ষতি হয়। কিন্তু এসব আমাদের জাতীয় জীবনে যে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছিল তারই এক দুঃখজনক পরিণতি। যখন কোন গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তখন এরকম অবস্থাই সৃষ্টি হয়। আরও শুনতে পেলাম আর্মি রাজারবাগের পুলিশ লাইন ও পিলখানার ইপিআরদের আস্তানায় হামলা চালিয়েছে।

পরের দিন ২৭শে মার্চ গেলাম নদীর ওপারে জিঞ্জিরাতে। আমি গিয়েছিলাম আমার ব্যবসায়িক পার্টনার ও বন্ধু বিভূতি ভূষণ সাহার সাথে দেখা করতে। বি বি সাহা হিসেবে তিনি সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বাড়ী ছিল তাঁতীবাজারে। আর্মির হামলার পর তিনি বৌ ছেলে মেয়ে ও পরিবারের অন্যান্য

সদস্যদের নিয়ে ইন্ডিয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে প্রথমে জিঞ্জিরা যান। যাওয়ার আগে আমার কাছে একটা চেক ও চিরকুট পাঠিয়ে দেন। তাতে লেখা ছিল চেকটা ব্যাংক থেকে ক্যাশ করে ১০,০০০/- টাকা যেন তাঁর কাছে আমি পৌঁছে দেই। আমি সেই টাকা নিয়ে গিয়েছিলাম। জিঞ্জিরায় গিয়ে দেখি এলাহী কারবার। ঢাকা শহর থেকে যারা পালিয়ে এসেছিল তারা দেখি অনেকেই এখানে এসে সমবেত হয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদেরও দেখলাম। তাদের অনেককে চিনতাম। আমি আশ্চর্য হলাম এখানে আওয়ামী লীগ নেতারা বসে দিক নির্দেশনা দিচ্ছে, কে কোথায় কোনদিকে ইন্ডিয়া যাবে সে সব বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে। আমার কাছে মনে হল পুরো ব্যাপারটাই পরিকল্পিত। তারা আগেই আঁচ করেছিল আর্মি হামলা করবে। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে তাই তাদের কি করতে হবে তারা সবকিছু ঠিক করে রেখেছিল। আর্মি এখানেও খবর পেয়ে হামলা করেছিল। তবে পরে ২৮শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর লে.জে.টিক্কা খান সবুর সাহেবকে ডাকলেন। ২৫শে মার্চের ঘটনার পরবর্তী অবস্থা মোকাবেলার জন্যই বোধ হয় আর্মি রাজনীতিবিদদের সাথে আলাপ-আলোচনার কথা ভেবেছিল। তাদের হয়ত এই বোধোদয় হয়েছিল রাজনীতিকদের সহযোগিতা ছাড়া এরকম পরিস্থিতি মোকাবেলা করা যাবে না। তিনি মুসলিম লীগের তিন গ্রুপসহ অন্যান্য নেতাদের সাথে কথা বলেন। কাইয়ুম মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে সবুর সাহেবের সাথে আমি, মফিজুদ্দীন আহমেদ, হেকিম ইরতেজাউর রহমান এবং সিরাজগঞ্জের আফজাল হোসেন ছিলাম।

তিনি আমদের দেখেই প্রথমে বললেন আপনারাইতো পাকিস্তানের এই দুর্গতির জন্য দায়ী। মুসলিম লীগ পাকিস্তান বানিয়েছিল আর সেই মুসলিম লীগ এখন তিন ভাগে বিভক্ত। এখনও যদি নিজেদের মধ্যে দলাদলি আর মারামারি বন্ধ না করেন তাহলে পাকিস্তান টিকবে? আপনারা এক হন। তিনি দুঃখ করে বললেন পাকিস্তান পাঞ্জাবীরা বানায়নি। পাকিস্তান হয়েছিল ৭৮% বাঙ্গালীর ভোটে। আজ তারাই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। টিক্কা খান আরও বললেন পাকিস্তান শেষ হয়ে গিয়েছে। একে বাঁচানো যাবে না। তবে আমি যতদিন আছি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করছে তাদের বিরুদ্ধে আর্মি শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে লড়াই করে যাবে। আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন। আমি চলে যাওয়ার আগে দেখে যেতে চাই আপনারা সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন।

টিক্কা খান সম্বন্ধে পাকিস্তান বিদ্বেষীরা এমন অপপ্রচার চালিয়েছিল যে তাঁকে যে কারও কাছেই মনে হবে এক নিষ্ঠুর ঘাতক হিসেবে। তিনি এতই খারাপ

ছিলেন যেন হিটলার-মুসোলিনী তাঁর কাছে কিছুই না। অথচ তিনি ছিলেন একজন দৃঢ় চিত্তের মানুষ, জেনারেল হবার মত অনেক যোগ্যতা তাঁর ছিল। তিনি ভাল লেখাপড়াও জানতেন।

২৫শে মার্চের ঘটনা ছিল একটা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্তের সাথে তিনি ঘটনাক্রমে জড়িত হন। এটা যে কোন দেশে যে কোন জেনারেলের পক্ষে এরকম সমস্যা মোকাবেলা করা লাগতে পারে। টিক্কা খানের সাথে আলোচনার সময়ই আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি মওলানা ভাসানী সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি? তিনি এখন কোথায় আছেন? টিক্কা খান স্বতঃস্ফুর্তভাবে বললেন, He is very much with us. I have asked Sodri Isphahani to bring him to me. তাঁর কথায় আমি আশ্বস্ত হলাম। তাহলে মওলানা আমাদের সাথে আছেন। তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যাবেন না। কিন্তু ইতিহাস তৈরী হচ্ছিল ভিন্ন পথে। পাকিস্তানের ভাগ্যও ছিল মন্দ। পরে শুনেছি আর্মির মধ্যেও ছিল দুটো গ্রুপ। একটা মার্কিনপন্থী অন্যটা চীনপন্থী। টিক্কা খান ছিলেন চীনপন্থী। তিনি বলেছিলেন ভাসানীকে পাকিস্তানের পক্ষে কাজে লাগাতে। অন্যদিকে মার্কিন গ্রুপের ভূমিকা ছিল রহস্যময়। তারা পাকিস্তানের সংহতির ব্যাপারে কতদূর আন্তরিক ছিল তা বলা মুশকিল। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে মার্কিন ভূমিকা ছিল অস্পষ্ট। পাকিস্তানকে তারা অখন্ড দেখতে চেয়েছিল এটা সুস্পষ্টভাবে বলা যাবে না। ভূরাজনৈতিক স্বার্থের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের মত একটা শক্তিশালী মুসলিম দেশ কামনা করত না নিশ্চয়ই। পশ্চিমী সভ্যতার ইসলাম বিরোধী এ চেতনা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনও মুক্ত ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানে আর্মির ভিতরে মার্কিন স্বার্থের প্রতিভূ ছিলেন রাও ফরমান আলী ও তাঁর অনুসারীরা। তাঁরা বোধ হয় ভাসানীর সাথে টিক্কা খানের যোগাযোগের খবর আগেই পেয়েছিলেন। সদরি ইস্পাহানীকে ফরমান আলীর নির্দেশে আর্মির লোকেরা আটক করে। সন্তোষে মওলানা ভাসানীর বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। মওলানা ঐ রাতেই সন্তোষ ত্যাগ করে সিরাজগঞ্জ হয়ে আসামের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আসামের ভিতর দিয়ে চীনে চলে যাওয়া। আসামে তিনি গিয়ে উঠেছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রীসভার শিক্ষামন্ত্রী মঈনুল হকের বাসায়। আমরা যখন পাকিস্তান আন্দোলন করি এই মঈনুল হক ছিলেন নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি, তখন থেকেই তাঁর সাথে ছিল প্রীতির সম্পর্ক। মওলানা তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন নেপাল হয়ে চীনে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু মঈনুল হক তা না করে ইন্দিরা গান্ধীকে পুরো ঘটনা অবহিত

করেন। ইন্দিরা তখন ভাসানীকে দিল্লীতে ডেকে নিয়ে গৃহবন্দী করে রাখেন। আমি এ ঘটনা পরবর্তীকালে মশিউর রহমান জাদু মিয়ার কাছ থেকে শুনেছি। ইন্দিরা মনে করেছিলেন পাকিস্তান ভাঙ্গার যে শ্রেষ্ঠতম সুযোগ তিনি পেয়েছেন ভাসানীকে দিয়ে তাঁর সেই উদ্দেশ্য সফল হবে না। তাই তিনি তাঁকে আটকিয়ে রেখেছিলেন।

মশিউর রহমান নিজেও ২৫শে মার্চের ঘটনাবলীর পর হিন্দুস্থান গিয়েছিলেন। তিনি মওলানাকে মুক্ত করার চেষ্টাও করেছিলেন কিন্তু সফল হননি। তাছাড়া হিন্দুস্থানের অবস্থাও তাঁর কাছে ভাল লাগেনি। সেখানে রুশ- ভারতের পাকিস্তান বিরোধী ষড়যন্ত্র ও কার্যকলাপ দেখে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে এসেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরেও যখন ইন্দিরা ভাসানীকে আটকে রাখেন তখন মশিউর রহমান ঢাকায় মওলানাকে মুক্ত করার আন্দোলন শুরু করেন। পরিশেষে জনমতের চাপে ইন্দিরা তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। আগেই বলেছি টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে আপোসহীন ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কড়া স্ট্যান্ট নেয়ার ফলেই পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহ প্রাথমিকভাবে এক প্রচন্ড ধাক্কা খায়। আমি আজও ভাবি যে স্ট্যান্ট টিক্কা খান নিয়েছিলেন তা অনেক দেরীতে হয়েছিল। এটা যদি আগরতলা ষড়যন্ত্রের সময়ই নেওয়া যেত তাহলে হয়ত '৭১ ট্রাজেডি নাও ঘটতে পারত।

এপ্রিল মাসের ৪ তারিখে আর্মির ব্রিগেডিয়ার বশীর সূত্রাপুর থানার ওসিকে টেলিফোন করে আমাকে তাঁর অফিসে জরুরীভাবে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিলেন। বশীর ছিলেন ঢাকা শহরের যাবতীয় আর্মি অপারেশনের দায়িত্বে। ওসি আমাকে টেলিফোন করে জানালেন আমি যেন পরদিন ১০টার সময় তৈরী থাকি। তিনি এসে আমাকে নিয়ে যাবেন।

বশীর সাধারণতঃ আগে গোয়েন্দা মারফত খোঁজ- খবর নিতেন। তারপর পাকিস্তান বিরোধী কোন তথ্য বা ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ব্যক্তিকে গিয়ে সোজাসুজি ধরে নিয়ে আসতেন। শুনেছি পাকিস্তান বিরোধী হিসেবে তিনি যাঁকে ধরতে পেরেছেন তিনি আর রেহাই পাননি।

সত্যি বলতে কি বশীর আমাকে খোঁজ করায় আমি একটু দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ি। আমি সব সময় পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলাম। মনের মধ্যে তাই আমার কোন জড়তা ছিল না। তখন সময়টা ছিল সন্দেহ আর অবিশ্বাসপূর্ণ। কে কি কাজ করছে, কার বিরুদ্ধে কে ষড়যন্ত্র করছে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না।

আমি সোজাসুজি সবুর সাহেবের বাসায় চলে যাই। সেখানে গিয়ে তাঁকে বলি সবুর ভাই বশীর আমাকে ডেকেছেন। বশীর যাকে ডাকেন তিনি তো আর

ফিরে আসেন না। আপনি একটু খোঁজ- খবর নেন। আমি যখন সবুর সাহেবের বাসায় যাই তখন দেখি তাঁর ড্রয়িং রুমে পাকিস্তান টেলিফোনের চীফ ইঞ্জিনিয়ার লোকমান হোসেনের স্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা বসে আছে। তাদের দেখলাম সবাই কাঁদছে। আর্মি লোকমান হোসেনকে এর আগের রাতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

সবুর সাহেব আমাকে বললেন ইব্রাহিম তুমি আমার সাথে চল। সবুর সাহেব যখন কেন্দ্রের যোগাযোগ মন্ত্রী তখন এই লোকমান হোসেনকে তিনি টেলিফোন বিভাগের প্রধান বানিয়েছিলেন। সবুর সাহেব তাকে খুব স্নেহ করতেন। রাও ফরমান আলী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন আগে থেকেই, সবুর সাহেব তাঁর সাথে টেলিফোনে সময় নিয়ে নিয়েছিলেন।

সবুর সাহেব রাও ফরমানের কাছে জানতে চাইলেন লোকমানকে কেন আটক করা হয়েছে। রাও ফরমান জবাবে বললেন আপনি লোকমানের জন্য এসেছেন? তিনি তো একটা ইন্ডিয়ান এজেন্ট। তিনি চীফ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে নিজের ক্ষমতায় পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে সব টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করেছে। অন্যদিকে দিল্লীর সাথে আওয়ামী লীগ নেতাদের যোগাযোগ করে দিয়েছে, মুজিবের সাথেও দিল্লীর কানেকশন লাগিয়ে দিয়েছে কয়েকবার। পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে আমরা কয়েকদিন ঠিকমত যোগাযোগ রাখতে পারিনি। আপনি যদি টেপ শুনতে চান শুনতে পারেন। এসব টেপ আমাদের ইন্টেলিজেন্স পাঠিয়েছে। সবুর সাহেব এসব কাহিনী শুনে অবাক। তারপরও তিনি রাও ফরমানকে বললেন লোকমানকে আমি ভাল ছেলে হিসাবে জানি। তাকে আমিই টেলিফোন বিভাগের প্রধান বানিয়েছিলাম। যা হোক, আপনার কাছে বলছি আপনারা আর যাই করুন তাকে প্রাণে মারবেন না।

রাও ফরমান আলী সবুর সাহেবকে বললেন লোকমানকে আমি বাঁচাতে পারবো না। আমাকে এই অনুরোধ করবেন না। আপনি যদি ওর জন্য কিছু করতে চান, তাহলে ইন্টেলিজেন্সের মেজর জেনারেল আকবরের সাথে কথা বলুন।

সবুর সাহেব তখন আমার কথা জিজ্ঞাস করলেন। কেন বশীর তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ইব্রাহিম আমাদের লোক। রাও ফরমান আলী তখন বশীরকে টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন আমাকে নাকি বশীর ডেকেছেন কিছু ইনফরমেশন নেওয়ার জন্য। সবুর সাহেবকে রাও ফরমান আলী আশ্বস্ত করে বললেন ভয়ের কোন কারণ নেই। পরে সবুর সাহেব আমাকে বললেন তুমি গিয়ে বশীরের সাথে দেখা কর। সাথে সাঈদুর রহমানকে নিয়ে যাও। কোন অসুবিধা হলে সাঈদুর রহমানকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। সাঈদুর রহমান রংপুর

মুসলিম লীগের নেতা ছিলেন। তিনি তখন ঢাকায় অবসর জীবনযাপন করছিলেন। আমি তখনকার মত বাসায় চলে গেলাম। সবুর সাহেব লোকমানের জন্য জেনারেল আকবরের সাথেও দেখা করেছিলেন। আকবরকে বুঝিয়ে তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। পরে লোকমানকে জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। বাংলাদেশ হওয়ার পর যখন জেল উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় তখন অনেকের সাথে তিনিও বেরিয়ে আসেন। তখন জেলখানার সমস্ত বন্দীকে অরোরার নির্দেশে মুক্তি দেয়া হয়। ইন্ডিয়ান আর্মি ৩ মাস যাবত অরোরার নেতৃত্বে এ দেশ শাসন করেছিল। মুজিব ফিরে আসার পরও জেনারেল অরোরা ও মুজিবের যুক্ত নির্দেশে দেশ পরিচালিত হয়েছে। তবে বাংলাদেশের জনগণ অরোরাকে বাধ্য করেছে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে।

আমি পরের দিন সাইদুর রহমানকে নিয়ে ব্রিগেডিয়ার বশীরের দফতরে দেখা করতে গেলাম। যাওয়ার আগে সুত্রাপুর থানা ওসিকে জানিয়ে গেলাম আমি বশীরের কাছে যাচ্ছি। তুমি এলে এস। বিগ্রেডিয়ার বশীর তখন বসতেন বর্তমান সংসদ ভবনের উত্তর দিকের একটা বিল্ডিং- এ। আমি যাওয়ার পর সেখানকার কর্তব্যরত মেজরের সাথে দেখা করে সব কথা বললাম। তিনি তখন আমাকে বশীরের ঘরে নিয়ে গেল। বশীরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে তিনি প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলেন Where is your friend and Indian spy Mr. Ruhul Amin Nijami. আমার পিছনে সাঈদুর রহমানও ঢুকেছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন, Go and seat outside. আমি বশীরের কান্ডকারখানায় থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। তাঁকে বললাম নিযামী আমার বন্ধু ছিলেন। তিনি আমাদের সাথে পাকিস্তানে আন্দোলনে যথেষ্ট কাজ করেছিলেন। তারপর তিনি কি করেছেন আমি তেমন বলতে পারি না। বশীর রাগত কন্ঠে বললেন ওসব শুনতে চাই না। সে এখন কোথায় আছে? বললাম, তা কি করে বলব। বশীর বললেন তুমি জানো। আমাদের কাছে খবর আছে তুমি তাকে লুকিয়ে রেখেছ। তুমি তাকে বের করে আনো। বললাম, কেন আমাকে দোষারোপ করছেন। তিনি কিছুক্ষণ নীরব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন তুমি মিথ্যা বলছো, আমি জানি কিভাবে অবস্থার মোকাবেলা করতে হয়। I will kill that Indian agent. আমি বললাম মারতে চাইলে মারো। আমাকে এসব কথা বলে লাভ কি?

আর কথা না বাড়িয়ে বশীর আমাকে বিদায় করে দিলেন। এভাবে বন্ধুর জীবন বাঁচাবার জন্য মিথ্যা কথা বলে বাসায় ফিরে এলাম।

১৩

রুহুল আমিন নিজামী ছিলেন আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। তাঁর বাড়ী ছিল চাটগাঁর মীরেশ্বরাই। ঢাকায় তিনি স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স ও ঝিনুক পুস্তিকা নামে দুটো বড় পুস্তক প্রকাশনীর মালিক ছিলেন।

নিজামী পাকিস্তান আন্দোলনের সময় চাটগাঁর ফজলুল কাদের চৌধুরীর সাথে বহু কাজ করেছেন। তিনি আমাদের মুসলিম ছাত্রলীগের কর্মী ছিলেন। পরে তিনি লাল হয়ে যান। মানে কমিউনিস্ট চিন্তা ভাবনার দিকে ঝুঁকে পড়েন।

আমার মনে আছে ১৯৫০ সালের শেষের দিকে আমি যখন কৃষি দফতরে কাজ করছি তখন আমাকে ঢাকা থেকে বদলী করে একবার চাটগাঁয়ে পাঠানো হয়। আমি চাটগাঁয়ে যেয়ে প্রথমে উঠি নিজামীর কাছে। নিজামী ও কয়েকজন মিলে চাটগাঁ শহরের লাভলেনে একটা বাড়ীতে মেস করে থাকেন। সেই মেসে অন্য অনেকের সঙ্গে আমিও ছিলাম।

নিজামীর সাথে থাকবার সময়ই লক্ষ্য করি মূলত কমিউনিস্ট পার্টির কাজ কর্ম চলে সেখানে। মাঝে মাঝে কর্মীদের জন্য মার্কসবাদের ক্লাস নেওয়া হতো। দেখতাম নিজামীর ভারত ও রাশিয়া থেকে আনা কিছু ফিল্ম স্থানীয় সিনেমা মালিকদের সাথে বিশেষ ব্যবস্থায় চাটগাঁর ছবিঘরগুলোতে দেখানো হতো। মূলত মার্কসবাদের প্রচারই ছিল এসব প্রদর্শনের লক্ষ্য।

আমি লক্ষ্য করলাম নিজামী আর আগের মত নেই। তিনি পুরোপুরি কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। এই মেস থেকেই সেকালে নিজামী মাসিক উদয়ন নামে একটা সিনেমা পত্রিকা চালাতেন।

আমাদের চাটগাঁ সার্কেলের কৃষি অফিসের পরিচালক ছিলেন আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী। তিনি ছিলেন সিলেটের মুসলিম লীগ নেতা আবুল মতিন চৌধুরীর ছোট ভাই। মুয়ীদ ছিলেন অত্যন্ত পরহেজগার ব্যক্তি। তাঁর ছিল আবার তাবলীগ জামাতের প্রতি আগ্রহ। তিনি যখন কোথাও যেতেন যিকির করতে করতে যেতেন। আমাকে সাথে পেলে তিনি আমাকেও যিকির করতে নির্দেশ দিতেন। তিনি আমাকে কয়েকবার তাবলীগ জামাতের চিল্লায় নিয়ে গেছেন।

রাতে কমিউনিস্টদের গোপন আস্তানায় কাটানো, দিনে তাবলীগ জামাতের লোকদের সাথে উঠাবসা এবং চাকরী করা, সেই তরুণ বয়সে আমার জন্য কষ্টকর হত। এরমধ্যে একদিন চাটগাঁর উপর দিয়ে বড় এক ঝড় বয়ে গেল।

ঝড়টা হয়েছিল বিকেলের দিকে। খুব কালো মেঘ করে ঝড়টা এসেছিল মনে আছে। আমি তখন নিজামীর মেসের দোতলায় বসে আছি। চারদিকে মেঘের গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ আর বজ্রবিদ্যুতের ঘনঘটা। এর মধ্যে শুনলাম কে যেন নাম ধরে ডাকছেঃ ইব্রাহিম, দেখে যাও মধুবালা আমাদের পত্রিকায় চিঠি লিখেছেন আর তাঁর ছবি পাঠিয়েছেন। মধুবালা ছিলেন সেকালের বিখ্যাত নায়িকা। আমি ডাক শুনে যখন তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসেছি, অমনি ঝড়ের তান্ডবে নিজামীর মেসের উপর তলার ছাদ বিরাট শব্দ করে ভেঙ্গে পড়ল। আর সামান্য একটু দেরি হলেই আমার জীবন বিপন্ন হতে পারত। আশ্চর্যের ব্যাপার এত বড় ঝড় হয়ে গেল অথচ লাভলেন ও তার আশেপাশের কোন বাড়ীই সেদিন ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি। শুধু নিজামীর মেসটা ছাড়া। ঝড় শেষ হলে বাড়ীটার চার পাশে অনেক লোক জমায়েত হল। দেখলাম তারা বলাবলি করছে কমিউনিস্টদের উপর আল্লাহর গজব নাজিল হয়েছে। নইলে অন্য কোথাও ক্ষতি হল না কেন! আমি পরদিন সেই ভাঙ্গাবাড়ীর স্তূপ থেকে সামান্য জিনিসপত্র উদ্ধার করে আমার এক আত্মীয়ের বাসায় গিয়ে উঠি। কিছুদিন পর আমি অবশ্য চাকরী ছেড়ে দিয়ে ঢাকায় ফিরে আসি। নিজামীর সাথে আমার সম্পর্ক তখনকার মত ছিন্ন হয়ে যায়। একদিন শুনলাম তিনি ইন্ডিয়া চলে গেছেন। তিনি কেন গেলেন কি জন্য গেলেন কিছুই বুঝতে পারলাম না। তবে আন্দাজ করেছিলাম তিনি তাঁর বামপন্থী রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট কোন কাজের সূত্র ধরে ইন্ডিয়া যেতে পারেন। বেশ কিছুদিন এভাবে চলে গেল। প্রায় বছর তিনেক হবে। একদিন হঠাৎ দেখি ভারত থেকে এসে আমার কাছে উপস্থিত। আমি তখন জি ঘোষ লেনের উল্টো দিকে কারকুনবাড়ী লেনে মুসলিম লীগের কর্মীদের নিয়ে একটা নাইট স্কুল খুলেছিলাম। অনেক শ্রমজীবী মেহনতী মানুষ এই স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। কারকুনবাড়ী লেনের প্রখ্যাত তিলের তেলের ব্যবসায়ী জি ঘোষের বাড়ীর একটা অংশ ছিল এটি। নিজামীর কোন থাকার জায়গা ছিল না, তাঁকে সেই স্কুলে থাকার ব্যবস্থা করে দিলাম।

সারাদিন তিনি বাইরে থাকতেন। রাতে সেখানে এসে শুয়ে থাকতেন। কি করতেন কিছুই বুঝতে পারতাম না। শুনলাম নিজামী প্রকাশনার লাইনে জড়িত হয়ে কাজ করার চেষ্টা করছেন। মাঝে মাঝে ক্লাবে তাঁর সাথে গুটিকয় অপরিচিত লোকের আনাগোনা দেখতাম। কিন্তু কিছুই ধরতে পারতাম না। একদিন দেখলাম তিনি বাহাদুর শাহ পার্কের উল্টো দিকে এখন যেখানে কো- অপারেটিভ ব্যাংক বিল্ডিং তার তিন তলা ভাড়া নিয়ে স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স খুলে বসেছেন। তবে তাঁর কোন প্রেস ছিল না। তাঁর কাজ ছিল শুধু ভারতীয় হিন্দু সাহিত্যিকদের বই- পত্র

ছাপিয়ে বাজারজাত করা। তার পাশাপাশি তিনি পূর্ব পাকিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সব ধরনের বইয়ের এজেন্সী নিয়ে নিলেন। বলতে গেলে ভারতীয় ও রুশ বইয়ে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বাজার সয়লাব করে ফেললেন। এছাড়া কলকাতা থেকে প্রকাশিত বেতার জগৎ পত্রিকারও এজেন্ট ছিলেন নিজামী। অনেকেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন ভারতীয় লেখকদের কোন অনুমোদন ছাড়াই কিভাবে তিনি বই প্রকাশ করেন? তিনি কোন রকম দ্বিরুক্তি না করেই বলতেন সব বইয়ের কপিরাইট আমি কিনে নিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে সেটা ছিল সর্বৈব মিথ্যা। নিজামী ভারতে থাকাকালে দাদাদের পরামর্শ অনুযায়ীই এ জাতীয় ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। মূলত পাকিস্তানের মুসলিম সংস্কৃতির বুনিয়াদকে বরবাদ করে দেওয়ার গোপন পরিকল্পনা নিয়েই ভারত থেকে ফিরে এসেছিলেন নিজামী।

আমি মুসলিম লীগ করতাম এ কথা তিনি ভাল করেই জানতেন। তবু তিনি আমার সাথে সম্পর্ক বরাবরের মত উষ্ণ রেখেছিলেন। আমার ধারণা আমার মত লোকের সাহায্য নিয়ে পাকিস্তান বিরোধী কাজ চালানো যত সহজ হত হয়ত অন্যভাবে সেটা সম্ভব হত না।

নিজামী যখন কো- অপারেটিভ বিল্ডিংয়ে তাঁর স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্সের অফিস করেন তখন তাঁর অফিসে আমার জন্য একটা রুম ছেড়ে দেন। রুমটা আমি ভাড়া নিয়েছিলাম আমার ব্যবসায়িক কাজ চালানোর জন্য। কাকতালীয়ভাবে হলেও আমরা দু'জন দুমেরুর লোক হওয়া সত্ত্বেও পাশাপাশি দিন কাটাচ্ছিলাম শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্কের সূত্র ধরে। আমি লক্ষ্য করেছিলাম ভারতীয় বই প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল না। আর সে বইগুলো এত সস্তায় বাজারজাত করতেন যে অন্য কোন প্রকাশকের পক্ষে তা করা মোটেও সম্ভব হত না। আমার এখন মনে হয় রীতিমত ভারতীয় সাবসিডি পেতেন তিনি।

একদিন তাঁকে বললামঃ নিজামী তুই তো ভারতীয় বই- এ দেশটা শেষ করে দিচ্ছিস। তুই তো কিছু ইসলামী বই বের করতে পারিস। তিনি আমার কথায় রাজী হলেন।

মওলানা আকরাম খাঁর কোরআনের বাংলা তরজমা ছাড়াও স্বল্পমূল্যে নামাজ শিক্ষাও অবশেষে তিনি বের করলেন। আসলে এগুলো ছিল তাঁর আইওয়াশ। তাঁর গোপন কাজকর্ম চালিয়ে যাবার জন্য এগুলো সাইন বোর্ডের মত কাজ করেছিল। এরপর তিনি স্টেডিয়াম মার্কেটে স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্সের জন্য বিরাট এক বিক্রয় কেন্দ্র খুলে বসলেন। খোলার আগে আমাকে বললেন, ইব্রাহিম তুই যদি সবুর সাহেবকে দিকে দোকানের উদ্বোধনটা করিয়ে দিতে পারিস তাহলে

খুব ভাল হয়। সবুর সাহেব আমার অনেক কথাই শুনতেন। আমার অনুরোধে তিনি স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্সের দোকান উদ্বোধন করেন। সবুর সাহেব তখন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নেতা ও যোগাযোগ মন্ত্রী।

এর কিছুদিন পর ঘটল বিপত্তি। পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স- এর কাছে সব খবর পৌঁছেছিল। নিজামীর দেশ বিরোধী চক্রান্তের কথা তারা যেন কি করে জেনে ফেলেছিল। মোহন মিয়া সাহেবের বড় ভাই আবদুল্লাহ জহিরুদ্দিন লাল মিয়া তখন কেন্দ্রের শিক্ষামন্ত্রী। ইন্টেলিজেন্স বোধ হয় তাঁকে সব কথা বলেছিল। তিনি ঢাকায় এসে খুব কড়া একটি স্ট্যান্ড নেন। তাঁর নির্দেশে নিজামীর সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং সে সময় প্রায় ৫ লক্ষ টাকার বই সরকার সিজ করে।

নিজামী কি করে যেন রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে হাত করে পূর্ব পাকিস্তানের সব রেলওয়ে স্টেশনের বুক স্টলগুলো লিজ নিয়েছিলেন। সেখানেও তিনি মার্কস, লেনিনের বই বিক্রি করতেন।

পূর্ব পাকিস্তানের কয়েক জায়গায় স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্সের বড় বড় শাখা ছিল। লাল মিয়া নির্দেশ দিয়েছিলেন নিজামীর যেখানে যা আছে সব বাজেয়াফত করার। এরপর তাঁকে সরকার গ্রেফতার করে। পরে বহুদিন দরবার করে আমি তাঁকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনি। সরকারী পদক্ষেপের ফলে নিজামী সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। বাকীতে অনেক বই ছাপানোর কারণে অনেক টাকা দেনা হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। প্রেসের দেনায় আর বাইন্ডারের তাগাদার ভয়ে তিনি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতেন।

আমার কাছে একদিন তিনি এসে বললেন ইব্রাহিম আমার সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। আমার আর কোন উপায় নেই। জানতাম তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কাজ করছেন। ভারতীয় ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য এদেশে তিনি ছিলেন এক শক্ত শিখন্ডি। তারপরেও অবচেতন ভাবেই তাঁর প্রতি আমি কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়তাম। আমাদের বন্ধুত্বটা এত শক্ত ছিল যে তাঁর দুর্দিনে তাঁর উপকার করা যায় কিনা সেই ভেবে আমি নিজামীকে নিয়ে ইসলামাবাদ গেলাম জহিরুদ্দিন লাল মিয়ার সাথে দেখা করতে। তাঁর দফতরে ঢুকতেই তিনি আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বললেন ইব্রাহিম তোমার সম্পর্কে ঢাকায় এসব কি শুনে আসলাম। তুমি আমাদের মুসলিম লীগের এত বড় ওয়ার্কার, তুমি নাকি নিজামীকে প্রোটেকশন দিচ্ছ? কোথায় সে ভারতীয় স্পাই রুহুল আমীন নিজামী- সে

পাকিস্তানের কত বড় সর্বনাশ করেছে সেকি তুমি জান? মুসলিম কালচারটা শেষ করার জন্য সে এত বড় ফাঁদ পেতেছে।

নিজামী তখন আমার পাশে বসা ছিলেন। আমি বললাম, জহির ভাই, আমি এসব কিছু জানি না। তিনি আমাকে বলেছেন সস্তা দামে বই লোকে বেশ খাচ্ছে। লাল মিয়া যেন ফুঁসে উঠলেন আমার কথায়। সস্তা দামে বই খাচ্ছে। সে বেতার জগৎ পত্রিকার ভারতের সোল এজেন্ট। ইন্ডিয়ায় তার দোকান আছে, ইন্ডিয়া থেকেই সে সব টাকা পয়সা পায়। সে শুধু পূর্ব পাকিস্তানে নয় পশ্চিম পাকিস্তানেও স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্সের শাখা খুলেছে। সর্বত্রই বিস্তার করছে ষড়যন্ত্রের জাল।

আমি তখন জানতাম না নিজামী পশ্চিম পাকিস্তানেও তাঁর শ্যেন দৃষ্টি দিয়েছেন। আমি লাল মিয়ার দৃঢ়তার সামনে তেমন কিছু বলতে পারলাম না। শুধু বললাম ইসলামাবাদে অন্য কাজে এসেছিলাম, ভাবলাম আপনার সাথে দেখা করেই যাই। এক পর্যায়ে লাল মিয়া নিজামীর দিকে লক্ষ্য করে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ভদ্রলোক কে? আমি বললাম উনি আমার বন্ধু। পশ্চিম পাকিস্তানেই ব্যবসা করেন। লাল মিয়া নিজামীকে চিনতেন না। আমি যদি নিজামীর সত্যিকার পরিচয় দিতাম তাহলে হয়ত লাল মিয়া তখুনি নিজামীকে জেলে পুরতেন।

আসবার সময় লাল মিয়া আমাকে বললেন, বুঝলে ইব্রাহিম, আমি যত দিন আছি নিজামীকে আমি ছাড়ব না। সে পাকিস্তানের দুশমন।

নিজামীর উপকারের জন্য আমি লাল মিয়ার কাছে গিয়েছিলাম। তাঁর জীবন বাঁচাবার জন্যও এবার বশীরের সামনে কৌশলী ভূমিকা নিতে হল আমাকে। বশীরের ওখান থেকে ফেরার পর আমার বাসার জানালা দিয়ে তাঁকে বললাম নিজামী তোকে মেরে ফেলবে। তুই তাড়াতাড়ি সরে পড়। নিজামী তখন আমার বাসার পাশেই থাকতেন।

ওয়ারীতে আমার গলির পরের গলি ওয়ার স্ট্রীটে লায়লা মঞ্জিল বলে একটা বাড়ী ছিল। ঐ বাড়ীতে থাকতেন চিত্র পরিচালক সুভাষ দত্ত। ২৫শে মার্চের ক্রাকডাউনের পর তিনি চলে যান অন্যত্র। বাড়ীটার মালিক ছিলেন এক এসপি। তিনি তখন বরিশালে। তাঁর ছেলেকে বললাম তোমাদের বাড়ীটাতো ফাঁকা। আমার এক বন্ধু বিপদে পড়েছেন তাঁকে একটু থাকতে দাও। তারা কোন আপত্তি করলনা। সন্ধ্যার মধ্যে নিজামী তাঁর বৌ ছেলেমেয়েসহ ঐ বাড়ীতে চলে গেলেন। কিন্তু নিজামীর ভাগ্য আদৌ প্রসন্ন ছিল না।

আমার মনে হয় আর্মির লোকজন আগে থেকেই এ পাড়ায় ঘোরাঘুরি করছিল।

নিজামী যে বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তা তারা সময় মত জেনে গিয়েছিল। রাত ১২টার দিকে নিজামীর বৌ পাশের এক বাড়ী থেকে আমার কাছে কাঁদো কাঁদো কন্ঠে টেলিফোন করে জানালেন আপনার বন্ধুকে আর্মি উঠিয়ে নিয়ে গেছে। এখন কি হবে? ঐ রাতে আমি তখন কি করব, অনেকটা হতবুদ্ধি হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা। এডভোকেট আবু সালেক আমার পাড়াতেই থাকতেন। আমি তাঁকে নিয়ে রাত দেড়টার দিকে বের হলাম। তখন জগন্নাথ কলেজে আর্মি একটা ক্যাম্প করেছিল। এই ক্যাম্পের চার্জে ছিলেন মেজর নাসিম। নাসিমকে আমি আগে থেকেই চিনতাম।

আমরা দু'জন এত রাতে আর্মি ক্যাম্পে যাওয়ায় সবাই হতবাক। আমাদের হাতে কারফিউ পাস ছিল। মেজর নাসিম তখন ছিলেন না। এক সেপাইকে জিজ্ঞাসা করলাম নাসিম সাহেব কোথায়? তাঁর সাথে আমাদের জরুরী কথা আছে। সে বলল কিছু আসামী নিয়ে সদরঘাটে নদীর পাড়ে গেছেন? আমি মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। নিজামী এতক্ষণ আছেত?

গিয়ে দেখি নদীর পাড়ে তাঁর অচেতন দেহ ফেলে রাখা হয়েছে। মনে হয় পানির মধ্যে তাঁকে ভাল করে চুবানো হয়েছিল স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য। দেখলাম নাক মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে। আর্মি তাঁকে মেরে ফেলার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছিল। আর কিছুক্ষণ পরে গেলেই হয়ত তাঁকে গুলি করে নদীতে ভাসিয়ে দিত।

আমি নাসিমকে বললাম ওকে তো মেরেই ফেলেছেন। ওরতো আর কিছু নেই। ও আমার আত্মীয়। ওকে আমার কাছে দিয়ে দিন। বশীরকে বলবেন নিজামীকে মেরে ভাসিয়ে দিয়েছি।

আমার কাকুতি মিনতিতে নাসিম নিজামীকে ফেরত দিয়ে দিলেন। কিন্তু আসবার সময় বললেন দেখো আমাকে বিপদে ফেল না। নিজামী একটা ইন্ডিয়ান স্পাই, ওকে শুধু তোমার কথায় ছেড়ে দিলাম।

আমি বললাম, নাসিম তোমার কোন অসুবিধা হবে না। তুমি নিশ্চিত থাকো। আমি তাঁকে এদেশেই রাখব না। তারপর আমি আর সালেক নিজামীকে কোন রকম ধরাধরি করে ওয়ারীতে আমার বাসায় নিয়ে এলাম। আমাদের পাড়ায় এক ডাক্তার থাকতেন। সেই রাতে তাঁকে ডেকে নিয়ে এলাম। নিজামীকে তিনি ভাল করে দেখে বললেন আঘাত এত গুরুতর নয়। ভাল হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

আমরা সারারাত ধরে তাঁকে নার্সিং করলাম। পেট আর বুক চেপে তাঁর ভিতরের পানি বের করলাম। ভোরবেলা দেখি তিনি চোখ মেললেন। আমি সেইদিনই তাঁকে পিআইএর ফ্লাইটে করাচী পাঠিয়ে দিলাম। সঙ্গে তাঁর ভাই গিয়েছিল। করাচীতে তিনি কয়েকদিন ছিলেন। ওখান থেকে তিনি লন্ডন চলে যান।

এর কিছুদিন পর তিনি দেখি লন্ডন থেকে আমার কাছে এক চিঠি লিখেছেন। অনেক কথার মধ্যে চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, লন্ডনে এসে তিনি যা দেখেছেন এবং বাংলাদেশ পন্থীদের কথায় যা বুঝেছেন তাতে তিনি নিশ্চিত পাকিস্তান টিকবে না। তিনি লিখেছিলেন, তুই সরে পড়, না হলে আমার চেয়েও তোর খারাপ পরিণতি হবে।

বাংলাদেশ হওয়ার পর নিজামী ঢাকায় ফিরে আসেন। আমি তখন জেলে। তিনি সস্ত্রীক বেশ কয়েকবার কারাগারে আমার সাথে দেখা করেছিলেন। প্রতিবারেই নিয়ে আসতেন পর্যাপ্ত খাবার ও দামী সিগারেট। আমি জেলে থাকতেই আমার মেয়ে লায়লা খায়রুন্নাহার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করে। এই খবর শুনেও নিজামী অনেক মিষ্টি নিয়ে আমার সাথে জেলে দেখা করতে আসেন।

নিজামীর জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাথে আমি জড়িত ছিলাম। তাঁর জীবনের অনেক ওঠানামার সাথেও আমি একাকার হয়ে মিশে গিয়েছিলাম। নিজামী ১৯৮৬ সালে মারা যান। তাঁর ব্রেন টিউমার হয়েছিল। চিকিৎসার জন্য কমিউনিস্টরা তাঁকে রাশিয়ায় পাঠিয়েছিল। কিন্তু তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর কাকতালীয়ভাবে আমি তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। তাঁর কমিউনিস্ট বন্ধুরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কাঠ দিয়ে বানানো এক কফিন বক্সে ঢুকিয়ে মাটি চাপা দিয়ে রাখবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্টরা মারা গেলে যেমনভাবে শেষকৃত্য করা হয়। অনেক টাকা দিয়ে তাঁর বন্ধুরা সেগুন কাঠের এক কফিন বানিয়েছিল। এ ব্যবস্থা মনপুত না হওয়ায় তাঁর কয়েকজন আত্মীয় আমাকে এসে ধরল এই বলে যে, তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন ভাল কথা। তাই বলে তাঁর জানাযাটাও হবে না? এমন হতেই পারে না। আমি তাড়াতাড়ি করে চলে গেলাম বনানী গোরস্থানে। ওখানেই তাঁরা নিজামীকে মাটি চাপা দিবার আয়োজন করছিলেন।

আমি তাঁদেরকে বললাম, নিজামী আমার বহুকালের পুরনো বন্ধু। তাঁর জানাযা ছাড়া বনানীতে আমি তাঁর লাশ দাফন করতে দেবো না। তাঁর অনেক

কমিউনিস্ট বন্ধুই আমাকে চিনতেন। তাঁরা আমার কথায় থতমত খেয়ে গেলেন। অনেকে ভাবলেন এ আবার কোথা থেকে এল?

চাপের মুখে তাঁরা আমার কথা শুনতে বাধ্য হলেন। আমি এক মওলানা সাহেবকে ডেকে নিয়ে এলাম। তিনি তার জানাযা পড়ালেন এবং ইসলামী কায়দায় তাঁকে অবশেষে দাফন করা হল। এভাবেই নিজামীর মৃত্যুতেও আমি তাঁর সাথে একাত্ম হয়ে রইলাম।

১৪

সবুর সাহেব যেদিন লোকমানের জন্য জেনারেল আকবরের সাথে দেখা করেন তার কয়েকদিন পর তিনি আমাকে নিয়ে আবার আর্মি ইন্টেলিজেন্সের মেজর জেনারেল আকবরের সাথে দেখা করলেন। আমাদের সাথে ছিলেন শাহ আজিজুর রহমান ও খাজা খায়রুদ্দীন। আর্মি শাহ সাহেবের বাসায় হামলা করেছিল। এর একটা কারণ ছিল ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ইয়াহিয়া স্থগিত করলে হাইকোর্টের আইনজীবীরা তার প্রতিবাদে এক দীর্ঘ মিছিল করে। সেই মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শাহ সাহেব। শাহ সাহেব এটা কেন করেছিলেন আজও আমি তা বলতে পারব না। আমার অনেক আইনজীবী বন্ধুকে এখনও প্রশ্ন করতে শুনি শাহ সাহেব এটা কেন করেছিলেন? এতে পাকিস্তানের কি ফায়দা হয়েছিল? শাহ সাহেব কি তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাতারাতি হিরো বনবার চেষ্টা করেছিলেন না গণতান্ত্রিক রাজনীতির খাতিরে করেছিলেন তা এখনও একটা রহস্য হয়ে আছে। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে সেদিন তাঁর ভূমিকা মুজিবের হাতকেই শক্তিশালী করেছিল মাত্র। আর্মি শাহ সাহেবের এই ভূমিকা লক্ষ্য করে থাকবে। তাঁর এই কার্যকলাপের জন্য আর্মি একদিন রাত দেড়টার সময় তাঁর বাড়ী আক্রমণ করে। তিনি তখন সচিবালয়ের উল্টোদিকে এস এন বাকের নামে এক ব্যবসায়ীর বাড়ীতে ভাড়া থাকতেন। আর্মি গোলাগুলি শুরু করলে শাহ সাহেবের গাড়ীর ড্রাইভার এবং বাড়ীর ভৃত্য গুলিতে নিহত হয়। তিনি বাড়ির পিছন দরজা দিয়ে কোনক্রমে নিজের জীবন হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে বাড়ীওয়ালার বাড়ীতে উঠেন। বাকেরই তাঁকে নিয়ে সবুর সাহেবের বাসায় যান। বাকের সবুরের ঘনিষ্ঠ লোক ছিলেন।

আমরা সবাই মিলে মেজর জেনারেল আকবরের সাথে দেখা করলাম। সবুর সাহেব শাহ সাহেবকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, আর্মি ওঁর বাড়িতে হামলা করেছে। ওতো আমাদের লোক। এরপর শাহ সাহেব নিজেই আকবরের সাথে আলাপ জমিয়ে ফেললেন। পাকিস্তান আন্দোলনে কি কি করেছিলেন, জিন্নাহ সাহেবের মিটিংয়ে তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন, এসবের একটা ফিরিস্তিও দিলেন। অবশেষে শাহ সাহেব বললেন, সবুর সাহেব ও খায়রুদ্দীন সাহেব আমাকে জানেন। তাঁদের থেকেও আমার সম্পর্কে জানতে পারেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমি কাজ করতে যাব কেন? পাকিস্তান আমি নিজ হাতে গড়েছি। আমার

সম্পর্কে বোধ হয় আপনাদের একটা ভুল বুঝাবুঝি হয়ে গেছে। পাকিস্তানের কল্যাণে আমি সবকিছু করতে রাজী।

মেজর আকবর শাহ সাহেবের কথায় খুশীই হলেন বোধ হয়। তিনি তখন তাঁকে বললেন, Go and stay at your home. এরপর অবশ্য শাহ সাহেবের আর কোন অসুবিধা হয়নি। পরে সরকার তাঁকে জাতিসংঘে পাঠিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা নিয়ে কথা বলবার জন্য। যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হামিদুল হক চৌধুরী।

আর্মি এখন পাকিস্তান বিরোধী লোকদের খুঁজে খুঁজে বের করছে। এরমধ্যে খবর পেলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটির বাংলার প্রফেসার আহমদ শরীফকে আর্মি খুঁজছে। আহমদ শরীফ ছিলেন আমার অনেকদিনের পরিচিত। তাঁর বড় ভাই উকিল আহমদ সোবহান ছিলেন আমার বন্ধু। সোবহান আমাদের সাথে পাকিস্তান আন্দোলনের সময় মুসলিম লীগের কর্মী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে অনেকের ভাবনায় রূপান্তর ঘটলেও সোবহান পুরোপুরি পাকিস্তানের আদর্শে অটুট রয়ে যান। বাংলাদেশ হওয়ার পর মুজিব যখন বেরুবাড়ী ভারতের হাতে তুলে দেন তখন সোবহান হাইকোর্টে এর বিরুদ্ধে কেস করে দিয়েছিলেন।

ঘটনাক্রমে আহমদ শরীফ পরবর্তীকালে আমার আত্মীয় হয়ে যান। এ আত্মীয় হওয়ার পিছনে একটা ছোট মজার গল্প আছে। আমার চেয়ে বয়সে ছোট আমার এক খালাত ভাই ছিল। নাম সাদত হোসেন চৌধুরী। সাদত ছিল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ইংরেজীর শিক্ষক। তার চেহারা ছিল খুব সুন্দর। ঢাকা এলে সে আমার বাসায় উঠত। একবার ঢাকায় এলে দেখলাম তাঁর মুখে একটা ফোঁড়া তাই তাকে নিয়ে মিটফোর্ড হাসপাতালে যেতে হল। যেই না হাসপাতালের গেটের সামনে গিয়েছি অমনি আমাদের রিকশার সাথে অন্য একটা রিকশার ধাক্কা লগল। তাতে সাদত নীচে পড়ে যায়। সাদতের দুর্ভাগ্য, পড়ে গিয়ে তার আঘাতটা লাগে ফোঁড়ার উপর। ফলে প্রচন্ড ব্যথা পায়। ফোঁড়া ফেটে পুঁজ ও রক্ত একসাথে বের হতে থাকে। আমি তাড়াতাড়ি তাকে ধরে নিয়ে হাসপাতালের উল্টো দিকে আমার পরিচিত ডা. আব্দুল্লাহর চেম্বারে যাই। হাসপাতালে আর আমাদের যাওয়া হয়নি। ডা. আব্দুল্লাহ সাদতের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দেন। কিন্তু সে ডা. আব্দুল্লাহর নজরে পড়ে যায়। আব্দুল্লাহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন এই সুন্দর ছেলেটি আপনার কি হয়? আমি বললাম আমার খালাতো ভাই। তিনি যখন শুনলেন সে অবিবাহিত তখন চটজলদি সাদতের জন্য একটা বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে দেন। আব্দুল্লাহর বোনের জামাই ছিলেন আহমদ শরীফ। আব্দুল্লাহর অবিবাহিত

দুই বোন ছিল। এরা আহমদ শরীফের আরমানিটোলার বাসায় থেকে ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করত। এদের মধ্যে যে বড় তার জন্য আব্দুল্লাহ পাত্র খুঁজছিল। আব্দুল্লাহর বড় ভাই ছিল বাফার মাহমুদ নুরুল হুদা। পরে আমি আমার স্ত্রীসহ আহমদ শরীফের বাসায় তাঁর শালীকে দেখতে গিয়েছিলাম। সাদতের বিয়ে সেখানেই হয়েছিল। আহমদ শরীফের আর এক ভায়রা উকিল আহমুদের রহমান থাকতেন আমাদের পাড়ায় ওয়ার স্ট্রিটে। চিত্র নায়ক মাহমুদ কলি আহমেদুর রহমানের ছেলে।

আর্মি ক্র্যাকডাউনের পর আহমদ শরীফ তাঁর ভায়রা আহমেদুর রহমানের বাসায় এসে ওঠেন। ডা. আব্দুল্লাহর ছোট ভাই হঠাৎ টেলিফোন করে বললেন ইব্রাহিম ভাই আহমদ শরীফকে তো আর্মি খুঁজছে। তাঁর ইউনিভার্সিটির বাসায় আর্মি হানা দিয়েছে। আপনাদের সাথে তো আর্মির যোগাযোগ আছে। ওনার জন্য কিছু একটা করেন। না হলে ওঁর জীবন বিপন্ন হতে পারে।

আহমদ শরীফ ছিলেন নাস্তিক। আল্লাহ্-রাসুল কোন কিছুই বিশ্বাস করতেন না। ইউনিভার্সিটিতে তিনি উল্টাপাল্টা বক্তব্য দিয়ে ছাত্রদের বিভ্রান্ত করতেন বলে জানতাম। ইসলাম আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভটা ছিল সবচেয়ে বেশী। এরকম একটা লোক পাকিস্তানের জন্য বিপদজনক হতে বাধ্য।

আদর্শের দিক দিয়ে বিন্দুমাত্র মিল ছিল না তাঁর সাথে আমার। কিন্তু একটা লোকের ক্ষতি হতে পারে সেটা আমি কখনও মেনে নিতে পারিনি।

আমি তখনই আহমদ শরীফকে নিয়ে আব্দুল্লাহর ছোট ভাইকে আমার বাসায় আসতে বললাম। আহমদ শরীফ আমার বাসায় এলেন। তাঁকে খুব বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল। তিনি আমাকে বললেন ইব্রাহিম আর্মিতো আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ইউনিভার্সিটিতে আমার বাসায় রেড করেছে। আমি এখন কি করি বলুন? আমার তো পালানোরও তেমন জায়গা নেই। আপনাদের অনেক যোগাযোগ আছে। যদি একটা কিছু করতে পারেন আমার জন্য। আমি তাঁকে বললাম আত্মীয় হিসেবে আপনার জন্য যতটুকু করার দরকার তা অবশ্যই করব। কিন্তু আপনার নীতি ও আদর্শ আমাদের কারও পছন্দ নয়। আপনার বড় ভাই একজন ঈমানদার মুসলমান। আপনার আব্বাকেও আমি জানতাম। আপনাদের পুরো পরিবারের কেউই এরকম নয়। খামোখা কেন আপনি এভাবে ঈমানদার মানুষের মনে ব্যথা দেন।

আহমদ শরীফ তখন বললেন, এ সব কথা কে আপনাকে বলেছে? আমার বিরুদ্ধে কে এসব রটনা করে? আমি কেন আল্লাহর বিরুদ্ধে যাব? আমি তো তাঁর

কথা শুনে অবাক। বললাম পত্র পত্রিকায় তো এসব দেখি। আহমদ শরীফ তাঁর বিরুদ্ধে সব অভিযোগ অস্বীকার করলেন।

আমি জানিনা তিনি জান বাঁচানোর জন্য এসব বলেছিলেন কিনা। তবে লক্ষ্য করলাম মৃত্যু ভয় কেমন করে একজন নিষ্ঠাবান নাস্তিককে বিচলিত করে। আমি তাকে বললাম আল্লাহ রহমত থাকলে আর্মি আপনাকে কিছুই করতে পারবে না। আর্মির সাথে দেন-দরবার নিয়ে আমি কয়েকবার সবুর সাহেবকে বিরক্ত করেছিলাম আহমদ শরীফের ব্যাপারে। তাই এবার ফরিদ আহমদের সাথে যোগাযোগ করি। টেলিফোনে পুরো ব্যাপারটি অবহিত করতেই তিনি আমাকে বললেন শরীফকে আমার কাছে নিয়ে এসো। কোন অসুবিধা হবে না। শরীফের বড় ভাই আহমদ সোবহান ছিলেন মৌলভী ফরিদ আহমদের পূর্ব পরিচিত। শরীফের ব্যাপারে তাই তাঁর আন্তরিকতার অভাব হল না। মৌলভী ফরিদ আহমদের কাছে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তিনি বললেন প্রফেসর সাহেব আপনার কোন চিন্তা নেই। নাস্তিক্যবাদী বিশ্বাস ছাড়া আপনার অনেক কিছুই আমার পছন্দ। আপনি কেন আল্লাহর সাথে শত্রুতা করেন? এই বিপদে আল্লাহ ছাড়া আপনাকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। তারপর ফরিদ আহমদ অনর্গল উর্দু আর ইংরেজীতে আর্মির কারও সাথে ফোনে কথা বললেন। বোধ হয় ব্রিগেডিয়ার বশীরই হবেন। তিনি আর্মির কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলেন তারা শরীফের বিরুদ্ধে কোন এ্যাকশনে যাবে না এবং তাঁর ইউনিভার্সিটি গমনাগমনে কোন বাঁধা দেবে না। শরীফও মৌলভী ফরিদ আহমদকে আশ্বস্ত করলেন তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোন কথা বলবেন না বা কোন কাজে অংশ নিবেন না।

মৌলভী ফরিদ আহমদ আমাকে আর আহমদ শরীফকে নিয়ে ইউনিভার্সিটির বাংলা ডিপার্টমেন্টে গেলেন। সেখানে প্রফেসর মুনীর চৌধুরী, ড. কাজী দীন মোহাম্মদ ও ড. নীলিমা ইব্রাহিম বসা ছিলেন। তাঁরা তখন নিয়মিত ইউনিভার্সিটিতে আসা-যাওয়া করতেন। ক্লাসও নিচ্ছেন। মৌলভী ফরিদ আহমদ আসছেন শুনে সেখানে এ্যারাবিক ডিপার্টমেন্টের ড. মুস্তাফিজুর রহমান ও হিস্ট্রির ড. মোহর আলীসহ আরও অনেক প্রফেসর এলেন। তিনি তাঁদের সবাইকে বললেন আপনাদের কোন অসুবিধা নেই। কোন প্রয়োজন বোধ করলেই আমাকে জানাবেন। পাকিস্তানের স্বার্থে আপনারা ইউনিভার্সিটি চালু রাখুন। আহমদ শরীফ সম্বন্ধে তিনি বললেন, তাঁর ব্যাপারে আমি পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে আর্মির সাথে কথা বলেছি। ইনশাআল্লাহ তাঁর কোন অসুবিধা হবে না। তিনি এখন থেকে আপনাদের সাথেই থাকবেন। উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে আহমদ শরীফ তাঁর লেখা একটা বই

আমার নামে উৎসর্গ করেছিলেন। মৌলভী ফরিদ আহমদ এসময় যে কত অসংখ্য মানুষকে আর্মির হাত থেকে উদ্ধার করে এনেছেন তার লেখাজোখা নেই। তাছাড়া এমনিতে তিনি ছিলেন মহৎপ্রাণ রাজনীতিবিদ। মানুষের উপকার করা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

ইউনিভার্সিটিতে তিনি যখন ছাত্র তখন থেকেই তিনি বাগ্মী ও ভাল এ্যাথলেট হিসেবে নাম করে ফেলেছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ছাত্র সংসদের ভিপি নির্বাচিত হয়েছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি ছিলেন একজন জানবাজ সৈনিক। পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি নেজামে ইসলাম পার্টির টিকেটে কয়েকবার জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। চুন্দ্রীগড়ের ক্যাবিনেটেও জনশক্তি মন্ত্রী ছিলেন। তিনি পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবেও অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। একবার হল কি ফজলুর রহমান জোয়ার্দার নামে আমার এক পরিচিত শিল্পপতিকে আর্মি তাঁর ভাই ও দুই ছেলেসহ ধরে নিয়ে গেল। তাঁর বাড়ী ছিল কুষ্টিয়ায়। তিনি থাকতেন ঢাকা কলেজের কাছে আমার এক বোনের বাড়ীর পাশে। নওয়াবপুর রোডে তাঁর একটা মার্কেট ছিল। সেই মার্কেটের এক অংশ আওয়ামী লীগের ক্যাডাররা '৭০-এর নির্বাচনের সময় দখল করে নির্বাচনী ক্যাম্প বানায়। আওয়ামী লীগের ক্যাডারদের মাস্তানীর সামনে জোয়ার্দার সাহেব কিছুই বলতে পারেননি। আর্মি এই জিনিসটা লক্ষ্য করেছিল। তাদের ধারণা হয়েছিল আওয়ামী লীগ অফিস করার জন্য যে দোকান ছেড়ে দেয় সে নিশ্চয় বড় আওয়ামী লীগার। কিন্তু আর্মি ভিতরের খবর জানত না। আর তাছাড়া আর্মি যে তথ্যের উপর জোয়ার্দারকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাও পুরোপুরি সঠিক ছিল না।

জোয়ার্দারের পাশের বাড়ী থেকে আমার বোন আমাকে টেলিফোন করে সব জানাল। আমার বোন গাড়ীতে করে জোয়ার্দারের স্ত্রীকে নিয়ে আমার কাছে হাজির হল।

আমি এর মধ্যে হেকিম ইরতেজাউর রহমানকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিলাম।

আমার বোন আর হেকিম সাহেবকে নিয়ে গাড়ীতে করে আবার মৌলভী ফরিদ আহমদের কাছে হাজির হলাম। তাঁকে বললাম সর্বনাশ হয়ে গেছে, জোয়ার্দার আমাদের লোক। তাঁর মার্কেটকে আওয়ামী লীগের ক্যাডাররা জোর করে অফিস বানিয়েছিল। এই অপরাধে তাঁকে, তাঁর ছেলে ও তাঁর ভাইকে নিয়ে গেছে। ফরিদ ভাই আপনি কিছু একটা করুন।

তাড়াতাড়ি করে তিনি ব্রিগেডিয়ার বশীরের কাছে টেলিফোন করলেন আর বললেন আমি এক্ষুণি আসছি। মৌলভী ফরিদ আহমদ আমাদের সবাইকে নিয়ে ব্রিগেডিয়ার বশীরের কাছে গেলেন। তিনি প্রায় কৈফিয়তের স্বরে তাঁকে বললেন তোমরা যদি এভাবে নিরীহ মানুষকে ধরে নিয়ে আসো তাহলে আমরা পাকিস্তান বাঁচাবো কি করে? তোমরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যারা কাজ করছে তাদেরকে নিয়ে যা খুশি তাই করো। আমরা কিছু বলব না। তাঁর মার্কেট আওয়ামী লীগের ক্যাডাররা দখল করেছে তাদের তোমরা কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারনি। তোমরা ধরে নিয়ে এসেছ নির্দোষ মালিককে। একজনের অপরাধে কি আর একজনকে শাস্তি দেয়া যায়?

ফরিদ আহমদের কথাবার্তায় সেখানকার যত আর্মি অফিসার ছিলেন সবাই প্রায় জড়ো হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ছোটখাটো বক্তৃতা দেখলাম দারুণ কাজ করল। সেদিন রাত ১১টার দিকে আর্মি জোয়ার্দারসহ সকলকে ছেড়ে দিলে আমরা তাদের নিয়ে চলে এলাম। মৌলভী ফরিদ আহমদ সেই রাত পর্যন্ত আমাদের সাথে ছিলেন। মৌলভী ফরিদ আহমদের জনহিতৈষনার সামুদ্রিক ব্যপ্তির মধ্যে এ হচ্ছে দু একটা ছোটখাটো ফোটা মাত্র। বাংলাদেশ হওয়ার পর পাকিস্তানীপন্থী হিসেবে মৌলভী ফরিদ আহমদকে হত্যার মধ্যে দিয়ে এ জাতি একজন মহৎ সন্তানের সেবা থেকে বঞ্চিত হল।

২৫শে মার্চ রাতে আর্মি যত লোক না মেরেছিল তার চেয়ে বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল অনেক বেশী। আমার মনে হয় তারা প্রাথমিকভাবে একটা ভীতি সৃষ্টি করে বাংলাদেশপন্থীদের মনে তাদের আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শংকা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। ওয়ারীতে আমার জানা মত কোন লোক মারা যায়নি। পুরাতন ঢাকার দক্ষিণ মৈষুন্ডি, নারিন্দা, রোকনপুর, কলতা বাজার, রায় সাহেব বাজার, লক্ষ্মী বাজার, ফরাশগঞ্জ, গেন্ডারিয়া, ফরিদাবাদ, ধুপখোলা, বংশাল, নাজিরা বাজার, নয়াবাজার, ইসলামপুর, পাটুয়াটুলী, বাবুবাজার, চকবাজার, নওয়াবগঞ্জ, পুরো লালবাগ থানা এলাকায় কোন লোক মারা যায়নি। এমনকি কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়নি। গোপীবাগে ৩জন, স্টেডিয়াম হল ঘরে এবং নিকটবর্তী ক্লাব সমূহে ৭/৮জন মারা গিয়েছিল। ৩০জনের মত মারা গিয়েছিল বলে আমি খবর পেয়েছিলাম। আর কিছু লোক মারা গিয়েছিল ইউনিভার্সিটি এলাকায়। কিছু পিলখানার ইপিআর ও রাজারবাগের পুলিশ হতাহত হয়েছিল। তারা অবশ্য আর্মির বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল।

২৫শে মার্চের পর আওয়ামী লীগ নেতারা তাদের পূর্ব পারিকল্পনা মাফিক ভারতে পাড়ি দিতে শুরু করেন। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা ও বিএসফ- এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তাঁরা ভারত পৌঁছেছিলেন। এ ব্যাপারে বিএসএফ- এর গোলকনাথ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আওয়ামী লীগ নেতারা ভারতে গিয়েই সংগঠিত হতে শুরু করেন। তাজুদ্দীন, কামরুজ্জামান ইন্দিরা গান্ধীর সাথে কথা বলেছিলেন। তাঁরা বলেন ইন্দিরা গান্ধীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানেই বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠিত হয়। ২৫শে মার্চে ক্র্যাকডাউনের পর মাত্র দুসপ্তাহের মধ্যে কাজ শুরু হয়। এত অল্প সময়ে সংগঠিত হয়ে সরকার গঠন ও স্বাধীনতা যুদ্ধ করা পৃথিবীর ইতিহাসে খুবই বিরল। ভিয়েতনাম ও আফগানিস্তানেও দীর্ঘস্থায়ী স্বাধীনতার যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এত দ্রুততার সাথে প্রবাসী সরকার তারা গঠন করতে পারেনি।

একাত্তর পরবর্তীতে পাকিস্তানপন্থী বিবেচনায় নিজ হাতে নিজের বাপ-চাচা- খালু- ফুপা এবং ভাইকে হত্যা করেছে অনেকে। এ রকম উদাহরণ আমি ভুরি ভুরি দিতে পারি। আমাদের নোয়াখালীর ফুলগাজী থানার মুসলিম লীগ সভাপতিকেও নিকট জনেরা হত্যা করে।

নোয়াখালীর রামগঞ্জ থানার রোস্তম আলী নামে এক গেরিলা নিজ হাতে গুলি করে হত্যা করে তার ফুপাকে। তাঁর দোষ ছিল তিনি মুসলিম লীগ করতেন। বাংলাদেশ হওয়ার পর আমি যখন ঢাকা জেল থেকে নোয়াখালী জেলে স্থানান্তরিত হয়েছিলাম তখন এই রোস্তম আলীর সাথে আমার পরিচয় হয়। বাংলাদেশ হওয়ার পর রোস্তম তার থানায় এত লুটতরাজ চালিয়েছিল যে আওয়ামী লীগের জামানায়ও প্রশাসন তাকে জেলে পাঠাতে বাধ্য হয়। জেলের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের সংস্পর্শে এসে তাদের চিন্তা ভাবনায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। সে পরে দাড়িও রেখেছিল। শুনেছি সে এখন জামায়াতের বিশিষ্ট কর্মী। ২৫ তারিখের তিনদিন পর আমার মনে আছে নরসিংদীর মুসলিম লীগের সভাপতি মিয়া আব্দুল মজিদ এলেন আমার বাসায় দেখা করতে। তিনি ২৫ তারিখের ঘটনার মধ্যে ঢাকায় আটকা পড়েছিলেন। আমি তাঁকে বললাম তুমি আরও দু'তিন দিন ঢাকায় থেকে যাও। দেশের অবস্থা তো ভাল না। তিনি আমার কথা না শুনে একরকম জোর করে নরসিংদী চলে গেলেন। পরে শুনেছি ঐ রাতেই আওয়ামী লীগের সশস্ত্র কর্মীরা গুলি করে তাঁকে হত্যা করে।

একই রাতে নরসিংদী মুসলিম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারী আব্দুল কুদ্দুসের বাড়ী ঘেরাও করে ওরা। পাশের বাড়ীতে থাকতেন তাঁর ভগ্নিপতি। তিনিও মুসলিম লীগের কর্মী ছিলেন। তাঁকেও তারা হত্যা করে।

২৮শে মার্চ দিবাগত রাতে নারায়ণগঞ্জ মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীকে তাঁর বাসায় সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা হত্যা করে। মোহাম্মদ আলী ছিলেন বাংলাদেশ মুসলিম লীগের এক নিবেদিত প্রাণ কর্মী। প্রায় একই সময় মুন্সীগঞ্জের মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট খলিল শিকদার ও জয়েন্ট সেক্রেটারী দুদু মিয়াকে হত্যা করে সেসব লোক। খলিল শিকদারের বাড়ী প্রথমে লুটপাট করা হয়, তাঁর গোলা থেকে ধান নিয়ে যাওয়া হয়, অবশেষে তাঁর বন্দুক দিয়েই তাঁকে হত্যা করা হয়।

এ রকম উদাহরণ অনেক দেওয়া যেতে পারে। ২৫শে মার্চের অব্যবহিত আগে এবং ২৫শে মার্চের পর আর্মি ক্র্যাকডাউনের আগ পর্যন্ত পাকিস্তানপন্থীদের উপর হত্যাযজ্ঞ ও নিপীড়ন নেমে এসেছিল। ২৫শে মার্চের পর আর্মি যখন বগুড়া শহরে ঢোকে তখন একটা বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে। বগুড়া মুসলিম লীগের তখন সভাপতি ছিলেন ফজলুল বারী। বারী সাহেব মোনায়েম খানের সময় স্থানীয় সরকার মন্ত্রী হয়েছিলেন। তাঁর বাড়ীর সামনে রাস্তা থেকে আওয়ামী লীগের কর্মীরা আর্মির উদ্দেশ্যে গুলি ছুঁড়ে। আর্মি তাদের ধাওয়া করলে তারা বারী সাহেবের বাসায় গিয়ে ওঠে।

আর্মি তাদের খুঁজতে গিয়ে বারীর বাসায় হামলা করে। শুনেছি, বারী সাহেব বাড়ীর বাইরে এসে আর্মির কাছে নিজের পরিচয় পর্যন্ত দিয়েছিলেন। আর্মি তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে সেখানেই তাঁকে গুলি করে। তিনি এক দুঃখজনক মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে পাকিস্তানের আদর্শের এক নিষ্ঠাবান সৈনিক পাকিস্তান আর্মির হাতেই মারা যান। এটা আর্মির এক চরম নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর্মির এরকম নির্বুদ্ধিতার নজির একেবারে কম ছিল না। নিজের দেশের মানুষের সাথে মানবিক সম্পর্ক আর্মির গড়ে ওঠার কথা ছিল। আসলে তা কখনই হয়নি। এসময় একদিন খবর পেলাম আর্মি যশোর আওয়ামী লীগের নেতা মশিউর রহমানকে মেরে ফেলেছে। তিনি আমার পুরনো বন্ধু। ৭০- এর নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগ থেকে এমএনএ হয়েছিলেন। ৫৪ সালে তিনি একবার এমপি হন। আতাউর রহমান খান যখন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী তখন তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্য হয়েছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনে আমাদের সাথে কাজ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আমি উৎসুক হয়ে জানার চেষ্টা করেছি আর্মি কেন তাঁকে মারতে গেল।

২৫শে মার্চের আগে অসহযোগের সময় তিনি তাঁর দলবল নিয়ে যশোর ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করে ফেলেন। এ সময় যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিদ্রোহ করে মেজর জলিল বের হয়ে তাদের সাথে যোগ দেন। মশিউর রহমানের উস্কানিতে শুধু যশোর ক্যান্টনমেন্ট ঘিরেই রাখা হয়নি, বাইরে থেকে ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে সব খাবার ও রসদ সরবরাহও বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ রকম অবস্থায় যশোর ক্যান্টনমেন্টের পাক আর্মির প্রধান ব্রিগেডিয়ার হায়াত তাঁকে অনুনয়- বিনয় করে বলেছিলেন আমরা তো আপনার দেশের সৈনিক। আমাদের কারও বিরুদ্ধে শত্রুতা নেই। যেই সরকারে যাবে আমরা তাকেই সার্ভ করব। আপনারা ক্ষমতায় আসেন আমরা আপনাদের আদেশ পালন করব। খামোখা আমাদের বৌ- ছেলেমেয়ে- বাচ্চার খাবার বন্ধ করে দিয়ে কেন আমাদের কষ্ট দিচ্ছেন? এটি কি কোন ইনসাফ হল? মশিউর ব্রিগেডিয়ার হায়াতের কথায় কোন কর্ণপাতই করেননি।

আমি আজও ভেবে কুল পাই না মশিউরের মত একজন শিক্ষিত মানুষের দ্বারা এরকম অর্বাচীনের মত কাজ কি করে সম্ভব হল! আসলে আওয়ামী লীগারদের মাঝে সে সময় এমন একটা অদ্ভুত ক্রেজ তৈরী হয়েছিল অবাঙ্গালী হলেই খারাপ। সুতরাং তাকে যেভাবে হোক মারতে হবে।

মশিউর শুধু যশোর ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করেই ক্ষান্ত হননি, নিকটবর্তী ঝুমঝুমপুরে বিহারীদের উপর নির্মম হত্যাকান্ডের উস্কানিও দিয়েছিলেন। ২৫শে মার্চের পর আর্মি যখন যশোর শহরে বিদ্রোহ দমন করতে ঢুকে তিনি তখন আর্মির হাতে ধরা পড়েন। পুরনো বন্ধু হিসেবে তাঁর মৃত্যুতে দুঃখিত হয়েছিলাম। শুনেছি আর্মি তাঁকে খুব নির্যাতন করে হত্যা করেছিল। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি একদিন আমার বাসায় কুমিল্লার আওয়ামী লীগ নেতা এডভোকেট মফিজুল ইসলাম এসে হাজির। তিনি ৭০- এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন। ২৫শে মার্চের পর অনেকের মত তিনিও ভারতে পালিয়ে যান। কুমিল্লা থেকে তিনি চলে যান আগরতলায়। তাঁর সাথে তার স্ত্রীও ছিলেন।

মফিজও আমাদের সাথে পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলেন। মফিজের নিজামীর সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। কুমিল্লায় তিনি মুসলিম ছাত্রলীগের কর্মী ছিলেন। পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি চাটগাঁর মীরেশ্বরাই আবুতোরাব হাইস্কুলের হেডমাস্টার হয়েছিলেন। হেডমাস্টার হিসেবে তিনি বেশ নামও করেছিলেন। পরে কি মনে করে শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে ওকালতি পাস করে কুমিল্লা বারে যোগ দেন। তখন তিনি মুসলিম লীগ করতেন। তাঁর দল পরিবর্তনের পিছনে একটা কারণ

আছে। কুমিল্লায় মুসলিম লীগের নেতা নুরুদ্দীন মোহাম্মদ আবাদের সাথে তিনি একটা ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। এর পরিণতিতে তিনি মুসলিম লীগ থেকে সরে যান এবং আওয়ামী লীগে যোগ দেন।

সেই মফিজ যখন আমার কাছে এলেন তখন আমি তো অবাক। তিনি হাউ মাউ করে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন দোস্ত কি ভুল যে করেছি ইন্ডিয়া গিয়ে। সব নিজ চোখে দেখে এসেছি।

আমি বললাম সবকিছু খুলে বলুন। মফিজ বললেন, আগরতলা গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে উঠি আমার এক আত্মীয়ের বাসায়। সেই আত্মীয় আমার চৈতন্য জাগিয়ে দিয়েছে। সে আমাকে বলেছে এটা কি করছ? পাকিস্তান ভেঙ্গে তোমাদের কি লাভ? আমরা এখানকার মুসলমানরা তো তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছি। কি সর্বনাশ করতে যাচ্ছ তোমরা। শুধু তাই নয়, সে আমাকে আগরতলার অনেক মুসলমান পরিবারের কাছে নিয়ে গেছে। তাদের মুখেও একই কথা। এটা নাকি মুসলমানদের বিরুদ্ধ ষড়যন্ত্র। তারা আমাকে বলেছে দেখেছ এখানকার মুসলমানদের অবস্থা! তোমরা এসেছ এটা আমাদের জন্য কোন আনন্দের সংবাদ নয়। আনন্দে মেতে উঠেছে এদেশের হিন্দুরা কারণ তারা এর মধ্যে পাকিস্তান ভাঙ্গার আলামত দেখতে পাচ্ছে। মফিজ আরও বললেন ইন্ডিয়ার মুসলমানরা পূর্ব পাকিস্তানীদের সুনজরে দেখছেনা মোটেই। তাদের ধারণা আমরা নাকি গাদ্দার।

শুধু এইটুকু হলেও তো ভাল ছিল। আগরতলা থেকে কলকাতা যাব ভাবছি এ সময় এক পত্রিকায় দেখলাম আমাদের প্রবাসী সরকার ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। চুক্তির ধারাগুলো দেখেই আমি আঁৎকে উঠেছি। ইব্রাহিম এরপর কোন স্বাধীনতা থাকে? তিনি আমাকে পত্রিকার কাটিং দেখালেন। আমি চুক্তিগুলোর ধারা পড়ে দেখলাম। তখন আমার মানসিক অবস্থা যে কি তা বুঝাতে পারব না।

মনে মনে তখন ভাবছি মুজিব কি এই স্বাধীনতার কথা আমাদের কাছে বলেছিলেন। চুক্তিগুলো এরকমঃ

১. মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডে থাকবে।
২. বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সে দেশে ভারতীয় বাহিনী থাকবে।
৩. বাংলাদেশের নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী থাকবে না।

৪. অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বিধানের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একটা প্যারামিলিশিয়া গঠিত হবে।
৫. দুদেশের মধ্যে অবাধ সীমান্ত বাণিজ্য চালু থাকবে।
৬. মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেয়নি এমন সব সরকারী কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হবে এবং শূন্যস্থান প্রয়োজন বোধে ভারতীয় কর্মকর্তাদের দিয়ে পূরণ করা হবে।
৭. বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নকালে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাহায্য গ্রহণ করা হবে।

এ চুক্তির পুরোটা পরবর্তীকালে ভারত সরকার বিশ্ব জনমতের চাপে কার্যকর করতে পারেনি এটা সত্য। তবে এ চুক্তি পড়লে বোঝা যাবে ভারত কেন আওয়ামী লীগকে সাহায্য করেছিল।

আমি তখন মফিজকে সবুর সাহেবের কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি তাঁর কাহিনী সবুর সাহেবের কাছে খুলে বললেন। সবুর সাহেব সব শুনে বললেন মফিজ তুমি এতদূর যখন এসেছ তখন আমি তোমাকে আর্মির কাছে নিয়ে যাই চল। তাদের কাছে গিয়ে যদি পুরো ঘটনাটা বল তাহলে ষড়যন্ত্রের গতিপ্রকৃতি তাদের কিছুটা বুঝতে সুবিধা হবে। মফিজ কিন্তু তাতে না করে বসলেন। বললেন ওরা আর আমাকে আস্ত রাখবে না।

মফিজকে আমি তখন নিয়ে আসি। পুরো যুদ্ধের সময়টা তিনি আমার কাছেই কাটান। লক্ষ্মীবাজারে রুচিরা বলে আমার একটা আবাসিক হোটেল ছিল। সেই হোটেলের একটা রুমে আমি তাঁকে রেখে দিয়েছিলাম। কয়েকদিন পর তিনি তাঁর স্ত্রীকে কুমিল্লা থেকে নিয়ে এসেছিলেন।

১৫

অক্টোবরের শেষের দিকে যখন পাকিস্তান সরকার উপনির্বাচন করারা ঘোষণা দেয় তখন সর্বদলীয় সিদ্ধান্তে আমাকে ফেনীর আসন থেকে এম এন এ প্রার্থী মনোনীত করা হয়। সে কথা শুনে মফিজ আমার কাছে ছুটে আসেন। তিনি আমাকে বললেন, দোস্ত তুমি এসব বিপদের মধ্যে নিজেকে জড়িও না। পাকিস্তান থাকবে না, পাকিস্তানকে আমরাই শেষ করে দিয়েছি। এখন কেন এভাবে বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছ?

আমি তাঁকে বললাম আমার রক্তের বিনিময়ে হলেও পাকিস্তানের আদর্শ রক্ষার জন্য লড়াই করব। এ কথা বলা প্রয়োজন, পশ্চিম পাকিস্তানী কিছু নেতা ও আমলা এক পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন না। পূর্ব বাংলার শতকরা ৯৭ জন- এর ভোটে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল। সন্তানের মত জনকের স্নেহ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গড়েছি। ভারতের ষড়যন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করব না। আদর্শ রক্ষা করব, আমি তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। বাংলাদেশ হওয়ার পর আমি যখন জেলে তখন মফিজ আমার মুক্তির জন্য অনেক ছোটাছুটি করেছিলেন।

মফিজের মত এ সময় নোয়াখালীর ওবায়দুল্লাহ মজুমদার ইন্ডিয়া থেকে পালিয়ে চলে আসেন। তিনি ৭০- এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের টিকেটে ছাগলনাইয়া- পরশুরাম- ফুলগাজী এলাকা থেকে এম এন এ হয়েছিলেন। এটা ছিল আমার নির্বাচনী এলাকা। ২৫শে মার্চের পর তিনি সীমান্তের ওপারে চলে যান। এ এলাকারই সীমান্তের ওপারে মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্ব দেন মেজর জিয়াউর রহমান।

এ সময় মুক্তিযোদ্ধারা আমার নির্বাচনী এলাকার ভিতর শুভপুর ও রেজু মিয়া ব্রিজ বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেয়। এ দুটো খুব দীর্ঘ সেতু ছিল। মুহুরী নদীর উপর ছিল এ দুটো সেতু। এক শুক্রবারে তারা শুভপুর ব্রিজ উড়িয়ে দেয়। পরের শুক্রবার রেজু মিয়ার ব্রিজ। ব্রিজ দুটো ওড়ানোর পর স্বাভাবিকভাবে এ এলাকায় আর্মির চলাচল বেড়ে যায়। রেজু মিয়া ব্রিজ ওড়ানোর পরের দিন রাস্তায় পুঁতে রাখা মাইনে আর্মির একটা ট্রাক ওড়ে যায়। এতে ৯ জন পাকিস্তানী সৈন্য মারা যায়। আরও হতাহত হতে পারত। কিন্তু আর্মি সে দিন সামনের দিকে মুভ না করে ফেরীতে ফিরে যায়। পরের দিন এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় যেখানে ট্রাক উড়ে গিয়েছিল তার দুপাশের গ্রামে আর্মি ঢুকে পড়ে। এক পাশে ছিল আমাদের পানুয়া। অন্যদিকে হরিপুর পানুয়া। আমাদের বাড়ীর সামনে এসেও আর্মি ফিরে যায়। আমাদের বাড়ীর সামনে দীঘির পাড়ে ছিল গোরস্থান। ওখানে আমার বাবা- দাদারা

শুয়ে আছেন। কবরগুলো পাথর দিয়ে খোদাই করা। কবরের গায়ে কোরআন শরীফের আয়াত খোদাই করা আছে। আর্মি বোধ হয় এসব দেখে কি মনে করে ফিরে যায় এবং হরিপুর গ্রামে গিয়ে ঢুকে পড়ে। প্রতিহিংসার কারণে কিছু নিরপরাধ গ্রামের মানুষকে মেরে ফেলেছিল তাতে আমি অবাক হয়ে যাই। আমি এদের অনেককেই চিনতাম। এ ঘটনা সে সময়কার তৈরী পরিস্থিতিতে গ্রামবাসীদের মনে আর্মি সম্বন্ধে স্রেফ বিরূপ ধারণাই জন্ম দিয়েছিল। এরকম সময়েই ওবায়দুল্লাহ মজুমদার একদিন দেখতে পান আমাদের এলাকার কতিপয় আলেমকে চোখ বাধা, হাত বাধা অবস্থায় হত্যা করার জন্য ভারতে নেয়া হয়েছে। ওবায়দুল্লাহ গিয়ে দেখতে পান পাহাড়ের কাছে লাইন দিয়ে পড়ে আছে তাঁরই এলাকার কিছু পরিচিত লোক এবং সম্মানিত কিছু আলেমের লাশ। হাজার হোক ওবায়দুল্লাহ ছিলেন রাজনীতিবিদ। এসব কান্ড তাঁর ভাল লাগেনি। তিনি তাদের কাছে বললেন আমি একটু ঘুরে আসি। তিনি তাড়াতাড়ি করে ফিরে এসে তাঁর স্ত্রীকে লোক দিয়ে ফেনী পাঠিয়ে দেন এবং নিজেও অন্য রাস্তা দিয়ে ফেনী চলে আসেন। ফেনীতে তিনি একদিন থাকার পর ঢাকায় এসে অবজারভার পত্রিকার সম্পাদক আবদুস সালাম সাহেবের সাথে দেখা করেন। সালাম তাঁকে হামিদুল হক চৌধুরীর কাছে নিয়ে যান। ওবায়দুল্লাহ পরে সবুর সাহেবের সাথেও দেখা করেন। আমার সাথেও তাঁর দেখা হয়। তাঁর কাছেই শুনি এই লোমহর্ষক ঘটনা। তিনি আক্ষেপ করে বলতে থাকেন আমি বহুদিন ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতারা যে গোপনে এত বড় ষড়যন্ত্র করেছে তার কিছুই বুঝতে পারিনি। শুধু আলেম হওয়ার অপরাধে তাদেরকে বাংলাদেশ বিরোধী চিহ্নিত করে এমন কাজ করতে পারে তা আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

ওবায়দুল্লাহ পরে হামিদুল হক চৌধুরী ও সবুর সাহেবের সহযোগিতায় আর্মির বড় কর্তাদের সাথেও দেখা করেন। সেখানে তিনি আর্মিকে বলেছিলেন আপনারা পাকিস্তানের স্বার্থে আমাকে যে কোন কাজে লাগাতে পারেন।

পরবর্তীকালে পাকিস্তান সরকার যখন পূর্ব পাকিস্তানে মালেক সাহেবের নেতৃত্বে একটা অসামরিক সরকার গঠন করে তখন ওবায়দুল্লাহ ডা. মালেক মন্ত্রীসভার সদস্য হয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আওয়ামী লীগের রাজনীতির অর্থই যে ছিল ভারতের অনুকূলে কাজ করা অর্থাৎ পাকিস্তান ভাঙ্গা ওবায়দুল্লাহর সেই চৈতন্য হয়েছিল অনেক দেরীতে, যখন পাকিস্তান মৃত্যু শয্যায় শায়িত। মফিজ ও ওবায়দুল্লাহর মত আওয়ামী লীগের অনেক এমপি ও এমএনএ

কেবল ভারতে গিয়েই ষড়যন্ত্রটা টের পেয়েছিলেন। তাঁর আগে তারা কিছুই বুঝতে পারেননি। ভারত গিয়ে অনেকে অনেক কিছু বুঝেও তেমন কিছু করে উঠতে সাহস পায় নি। কেননা তাতে তাদের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা ছিল। তাই তারা নিয়তিকেই এক রকম মেনে নিতে বাধ্য হয়। প্রবাসী সরকারকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করত ইন্ডিয়া। তাদের নির্দেশের বাইরে আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের রা' করবারও উপায় ছিল না। যত দিন যেতে থাকল ইন্ডিয়ার পরিকল্পনা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকল।

আমার বাড়ী থেকে কয়েক শ' গজ দূরে গণেশের এক প্রাসাদোপম বাড়ী ছিল। এই বাড়ী নিয়ে এক কাহিনী আছে। ভাওয়ালের রাজা নিরুদ্দেশ হওয়ার ১২ বছর পর যখন জন সমক্ষে সন্যাসী হিসেবে আবির্ভূত হন তখন তিনি এখানে এসে উঠেছিলেন। গণেশ চক্রবর্তী ছিল তাঁর পূর্ব পরিচিত। ভাওয়ালের রাজার নিরুদ্দেশ হওয়ার চমকপ্রদ গল্প, মামলা করে তাঁর জমিদারী এস্টেট ফিরে পাওয়ার অভিনব কাহিনী আমি পরে গণেশের কাছ থেকে শুনেছিলাম। গণেশ ২৫শে মার্চের পর ভারতে পালিয়ে যায়। আর্মি যখন খাজুকে নিয়ে আসে তখন বিহারীরা লুটতরাজ চালাচ্ছিল গণেশের বাড়ীতে। আমি মেজর নাসিমকে বললাম এগুলো তোমাদের চোখে পড়ে না? সে তখন তার ফোর্স নিয়ে গণেশের বাড়ীর দিকে ছুটে যায়। বিহারীরা আর্মি আসার কথা শুনে তাড়াতাড়ি গা ঢাকা দেয়। বিহারীদের হাত থেকে গণেশের বাড়ীতে লুটতরাজ তখনকার মত ঠেকাতে পারলেও বাংলাদেশ হওয়ার পর গণেশের বাড়ী আবার লুটতরাজের শিকার হয়। এবার তার বাড়ীতে লুটতরাজ চালায় আওয়ামী লীগাররা। এই গণেশ কয়েকটা বড় বড় গরু পুষত। এই গরুগুলো জবাই করে তারা বিজয় উৎসব পালন করে। এইভাবে গণেশের বাড়ী দুবার লুট হয়।

আওয়ামী লীগ মনে করেছিল এভাবে যদি হত্যা ও সন্ত্রাস চালানো হতে থাকে তাহলে আর্মি অবশ্যই নেমে আসবে এবং তাদের উপর আক্রমণ করবে। আর্মির সেই আক্রমণকে পুঁজি করে তখন সকলের কাছে নিপীড়নের কাহিনী বলে রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়া যাবে। আওয়ামী লীগের এ কৌশল অনেকখানি সফল হয়েছিল।

এ সময় একদিন আর্মি এসে আমার বাড়ী সার্চ করে। কি করে যেন আর্মি খবর পেয়েছিল আমার শ্যালক সাহাদত চৌধুরী সাধন আওয়ামী লীগের সমর্থক। আর্মির ধারণা হয়েছিল আমি কিছু আওয়ামী লীগের সমর্থকদের প্রোটেকশন দিচ্ছি। প্রকৃত ঘটনা ছিল সাধনসহ তার কয়েকজন বন্ধু বিপদ টের পেলে আমার

বাসায় এসে উঠত। জানতাম এরা পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী নয়। পাকিস্তানের যে কোন বড় ক্ষতি হতে পারে এদের দ্বারা। সশস্ত্র অবস্থায়ই এরা সব সময় ঘোরাফেরা করত। তবুও একটা লোককে আর্মি মেরে ফেলবে তার দোষ যত প্রমাণিতই হোক না কেন এটা আমি কখনও মেনে নিতে পারিনি। সাধনের সাথে জনকন্ঠের মাসুদ খান, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, রাজা আর ঝিলু ঘোরাফেরা করত। আর্মি যেদিন আমার বাড়ী এসেছিল সেদিন সকালে সাধন ও মাসুদ আমার বাড়ীতে অবস্থান করছিল। আর্মির ঘোরাফেরা দেখে কলাবাগানে এক আত্মীয়ের বাসায় তাদের সরিয়ে দিয়েছিলাম।

সেদিন বিকেলেই দেখি আমার বাড়ীর সামনে আর্মির একটা ট্রাক এসে থামল। তারপর ট্রাক থেকে চোখ বাধা অবস্থায় এক তরুণকে নামানো হল। সম্ভবত আর্মি চেয়েছিল ছেলেটিকে গুলি করে লাশটা রাস্তার উপর ফেলে যাবে। চোখ বাধা হলেও ছেলেটাকে আমার কাছে পরিচিত মনে হল। কাছে গিয়ে দেখি এতো আমাদের খাজু। রাজার ছোট ভাই। খাজু ছিল আমার প্রতিবেশী প্রাক্তন মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন আহমদের ছেলে। তিনি আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড় হলেও আমার সাথে তাঁর বরাবর একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল। গিয়াসউদ্দিন যুক্তফ্রন্টের সময় খাদ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। মোহন মিয়া যখন মুসলিম লীগ ত্যাগ করে যুক্তফ্রন্টে যোগ দেন তখন তাঁর সাথে তিনিও মুসলিম লীগ ছাড়েন। আর্মি ট্রাকে বসা মেজর নাসিমকে বললাম এ তোমরা কি করছ? খাজু আমার মুসলিম লীগের কর্মী। তাকে নিয়ে আমি কাইয়ুম খানের সাথে মিটিং পর্যন্ত করেছি। আরও অনেক লোক জমা হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেক বিহারীও ছিল। তাঁরাও বলল খাজু মুসলিম লীগের লোক। আর্মি খাজুকে ছেড়ে দিল। আমি তখন নাসিমকে বললাম, তোমরা কেন এভাবে পাকিস্তানের শত্রু খুঁজে বেড়াচ্ছ। এভাবে কি দেশকে শত্রু মুক্ত করা যাবে।

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের প্রেক্ষাপটে এক মহান আদর্শের অনুপ্রেরণায় আমরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম পাকিস্তান আন্দোলনে। বৈষয়িক স্বার্থের গ্লানি আমাদেরকে সেদিন স্পর্শ করেনি। ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জল সে সব দিনের স্মৃতি আজও যখন মনের আয়নায় ভেসে ওঠে তখন আপ্লুত না হয়ে পারা যায় না। কেননা, আমাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল একটি স্বাধীন স্বদেশ ভূমির স্বপ্ন। আমরা চেয়েছিলাম এমন এক রাষ্ট্র কাঠামো যা কোন ভৌগোলিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার মধ্যেই সীমিত থাকবে না। সেদিন আমাদের প্রত্যয়ের ভাষা মূর্ত হয়েছিল কবিকন্ঠেঃ 'মোরা মুসলিম সারা জাহান ভরিয়া গড়িব পাকিস্তান।' শুধু কি তাই। আমরা চেয়েছিলাম কাঙ্খিত রাষ্ট্র হবে 'যারা নীড় হারা' 'যারা আশ্বাস হারা' তাদের

আবাসভূমি। এক কথায় পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি হবে 'সারা জাহানের মজলুমানের মঞ্জিল মহীয়ান'। সেদিন চাঁদ তারা খচিত পতাকার তলে জড় হয়েছিল সর্বস্তরের মানুষ। কত শত ত্যাগ তিতিক্ষা আর জানমালের কোরবানীর বিনিময়ে অর্জিত হয়েছিল ৪৭- এর স্বাধীনতা- তার মূল্যায়ন সম্ভব নয় এই সীমিত পরিসরে। তবে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে আজাদী আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে শেখ মুজিবরসহ আওয়ামী লীগের অনেককেই পেয়েছি সংগ্রামের সাথী হিসেবে। পাকিস্তান আন্দোলনের রক্তক্ষয়ী পটভূমি সম্পর্কে তাঁরা অবহিত নন এমনটি ভাবতে কুন্ঠা জাগে। আরও যেটা বিস্ময়কর সেটা হল ৪৭- এর পূর্বে যাদের ভান্ড ছিল শূন্য অথচ পাকিস্তানের বদৌলতে ধানমন্ডি- গুলশানে যারা জাঁকিয়ে বসেছেন, তারাই রাতের আঁধারে হাত মিলিয়েছে প্রতিবেশী দেশটির- হোমরা চোমড়াদের সাথে। সাতচল্লিশের স্বাধীনতা অর্জনের পরক্ষণেই ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত পাকিস্তান নামক কষ্টার্জিত রাষ্ট্রটি ধ্বংসের প্রমত্ত নেশায় মেতে ওঠে। শিক্ষকের ছদ্মবেশে বন্ধুর মুখোশে অনবরত প্রচার চালাতে থাকে দুগ্ধপোষ্য রাষ্ট্রটির বিরুদ্ধে। আমার বন্ধুরা ষাটের দশকের ঢাকার সাথে তুলনা দিতেন পিন্ডি, লাহোরের। আফসোসের বিষয় ৪৭- এর পূর্বে ঢাকার চিত্র তাদের স্মৃতি থেকে কেন জানি চিরতরে হারিয়ে গিয়েছিল। আমার কাছে পুরো বিষয়টা আজ অবধি অবোধগম্য রয়ে গেছে।

সত্তরের সেই উত্তাল দিনগুলোতে মনে হত বাঙ্গালী খুব আবেগপ্রবণ জাতি। পিছনের কথা তারা বেশীদিন মনে রাখে না। বারবার তাই তাদের জীবনে বিপর্যয় ধেয়ে আসে।

একাত্তরের জুলাই মাসের দিকে রাও ফরমান আলী একবার মুসলিম লীগসহ পাকিস্তানপন্থী কয়েকটা দলের নেতাদের তাঁর অফিসে ডাকেন। তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা করার জন্যই তিনি আমাদের ডেকেছিলেন। এ সভায় আর্মির কয়েকজন সিনিয়র জেনারেলও ছিলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে জেনারেল রহীম একটা দামী কথা বলেছিলেন। মোমেনশাহীর হালুয়াঘাট সীমান্তের একটা উদাহরণ টেনে জেনারেল রহিম বললেন, সেখানে আমাদের আর্মি আছে। তারা বর্ডার পাহারা দিচ্ছে। ট্রেঞ্চ খুঁড়েছে। সবই চলছিল ঠিকঠাকভাবে। হঠাৎ একদিন রসদ সরবরাহে বাধা সৃষ্টি হল। কতিপয় তরুণ পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো ইন্ডিয়ান আর্মিকে। জেনারেল রহীম বললেন, আমরা কাদের সাথে তাহলে যুদ্ধ করব। আমরা কাদের জন্য বুকের রক্ত দেব। একদিকে ইন্ডিয়ান আর্মি অন্যদিকে আমরা দেশের বিভ্রান্ত তরুণেরা। এরকম অবস্থায় কি যুদ্ধ চলতে পারে? দেশের সর্বত্রই তখন হালুয়াঘাট সীমান্তের অবস্থা বিরাজ করছিল। তাছাড়া আমার মনে হয়

আর্মির মধ্যেও কোন সংহত পরিকল্পনা ছিল না। এর কারণ ছিল আর্মি হেড কোয়ার্টারের সিদ্ধান্তহীনতা। আর্মি হেড কোয়ার্টারের সিনিয়র জেনারেলদের যে অংশ ভুট্টোর সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন তাঁরা কখনোই চাননি পূর্ব পাকিস্তানে আর্মি কোন সুষ্ঠু প্রতিরোধ গড়ে তুলুক। ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা চেয়েছিলেন। পাক আর্মির কয়েকজন জেনারেলও এ চক্রান্ত বাস্তবায়নে ভুট্টোর সহযোগী হন। ফলে পূর্বাঞ্চলে আর্মি যত অপারেশন চালিয়েছে, সীমান্তে যুদ্ধ করেছে তা অনেকটা সিদ্ধান্তহীনভাবে হয়েছে। তারা একদিকে দেখেছে দেশের মানুষ তাদের প্রতি মোটেই সহানুভূতিশীল নয়, অন্যদিকে হেড কোয়ার্টারের কোন দিক নির্দেশনা নেই। এরকম পরিস্থিতিতে পূর্বাঞ্চলের আর্মি হয়ে পড়েছিল অসহায়। অন্যদিকে আমরা পাকিস্তানপন্থীরা নিজেদের বিপন্ন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যথার্থই আন্দাজ করতে পারছিলাম। এসত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রতি গভীর অনুরাগ আমাদেরকে সচল রেখেছিল। পাকিস্তানের জন্য সন্তান প্রতিম ভালবাসাই আমাদের পরিচালিত করেছিল। এসময় ইয়াহিয়া হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নিলেন পূর্ব পাকিস্তানে একটা বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার। তাঁকে এ বুদ্ধি কে দিয়েছিল জানি না। তবে আর্মির মধ্যে এ অনুভুতি জেগে থাকতে পারে যে সামরিক সরকারের স্থলে কোন বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা গেলে হয়ত পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। তাছাড়া ইন্ডিয়া এ সময় শরণার্থী সমস্যা ও পাকিস্তান বাহিনীর নিপীড়নের মিথ্যা কাহিনী প্রচার করায় বিদেশে পাকিস্তান বিরোধী প্রোপাগান্ডা বৃদ্ধি পায়। তার মোকাবেলার জন্য হয়ত আর্মি এ ধরণের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

কিন্তু এরকম সিদ্ধান্তে তখনকার বিস্ফোরনন্মুখ পরিস্থিতিতে কোন পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ দেশের দু'অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্যের নামে আওয়ামী লীগ যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল তা দূর করা সহজ সাধ্য ছিল না।

জেনারেল টিক্কা খানের স্থলে নতুন গভর্ণর নিযুক্ত হলেন ডাক্তার এএম মালেক। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন দাঁতের ডাক্তার। রাজনীতিতে তাঁর হাতেখড়ি শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। কলকাতার ডক শ্রমিকদের তিনি ছিলেন নেতা। পাকিস্তান হাসিলের পর মালেক সাহেব লিয়াকত আলী খানের মন্ত্রীসভার সদস্য হয়েছিলেন। পাকিস্তান হওয়ার পর পর আমি যখন ঢাকায় রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি তখন মালেক সাহেব আমাকে বিভিন্ন উপদেশ দিয়ে উৎসাহিত করতেন।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন আসার ঠিক আগে আগে একবার এ.এম. মালেক ঢাকায় এলেন। দ্বিধাবিভক্ত মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মীদের একত্রিত করার জন্য তিনি পাকিস্তান ফ্রিডম ফাইটার্স মুভমেন্ট নামে একটা বৈঠক ডাকেন হোটেল শাহবাগে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি অঞ্চল থেকে এ বৈঠকে পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মী ও নেতারা উপস্থিত হয়েছিলেন। বৈঠকে আমি সেদিন মোহন মিয়াকে সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। মালেক সাহেবের সাথে আমি সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরেছিলাম অনুষ্ঠানটি সফল করার জন্য। তখনই টের পেয়েছিলাম তিনি একজন উঁচু মানের সংগঠক। রাজনীতিবিদদের জন্য যা অবশ্যই একটা বড় গুণ। মালেক সাহেব ফ্রিডম ফাইটার্স মুভমেন্টের সভাপতি আর আমি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হই। পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস যাতে তরুণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছায় তার একটা পরিকল্পনা তখন আমরা নিয়েছিলাম। মনে পড়ে তিনি সভাপতির বক্তৃতায় দুঃখ করে বলেছিলেন, যারা পাকিস্তান আন্দোলন করেছিল তারা কি উদ্দেশ্যে আজ পাকিস্তানের আদর্শের বিরুদ্ধে কাজ করছে তা বোঝা খুব মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুঃখের বিষয় সংগঠনটা আমরা বেশীদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারিনি।

এ.এম. মালেক বিভিন্ন সময় পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। কখনও মন্ত্রী হয়েছেন, কখনও রাষ্ট্রদূত। কিন্তু তিনি যখন পূর্ব পাকিস্তানের দুর্যোগপূর্ণ রাজনৈতিক আবহাওয়ায় গভর্ণর হয়ে এলেন তখন অনেকেই বলাবলি করতে লাগল মালেক সাহেব তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করে বসলেন।

তিনি আসলেই কোন ভুল করেছিলেন কিনা তা বিচার করবে ভবিষ্যতকাল। তবে একথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে দুর্যোগপূর্ণ সময়ে তিনি প্রদেশের গভর্ণরের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। পর্বত প্রমাণ যে গুরু দায়িত্ব নিয়ে তিনি গভর্ণর হয়েছিলেন সেই গুরুভার পালনে তাৎক্ষণিকভাবে সফলকাম হতে পারেননি। তবে পাকিস্তানের জন্য তিনি যে এতবড় ঝুঁকি নিতে পেরেছিলেন সেটা তার প্রগাঢ় আদর্শবাদী চরিত্রের জন্যই সম্ভব হয়েছিল। ইতিহাসের পাতায় পরাজিতদের জন্য কিছুই বরাদ্দ থাকে না বললেই চলে। একারণে বাংলাদেশ হওয়ার পর রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে তিনি অনেকটা মুছে গেছেন। কিন্তু ইতিহাসে তো আদর্শবাদীদের একটা স্থান থাকে। সে স্থান অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য। পাকিস্তানের আদর্শের জন্য জনাব মালেক সব রকমের ঝুঁকি নিয়ে গভর্ণরের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনের জেহাদে তিনি

যেমন ছিলেন সক্রিয়, পাকিস্তান রক্ষার জেহাদেও তাঁকে দেখা গেল সম্মুখ সারিতে। মালেক সাহেব তাঁর ক্যাবিনেটে ইসলামপন্থী দলগুলো থেকে কয়েকজন সদস্য গ্রহণ করেছিলেন। সবগুলো দলের নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ করেই তিনি এটা করেছিলেন। আওয়ামী লীগের এমন দু'জন সদস্যকেও মন্ত্রীসভার সদস্য করেছিলেন তিনি যাঁরা মুজিবের ষড়যন্ত্রকে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেননি।

ভেবে হতবাক হতে হয়, পূর্ব পাকিস্তানের শেষ দিনগুলোতে যখন ভারতীয় জঙ্গী বিমান গভর্ণর হাউসের উপর অনবরত বোমা বর্ষণ করত তখনও গভর্ণর মালেক সকাল- বিকাল ক্যাবিনেট মিটিং করে সামগ্রিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতেন। জীবনবাজী রেখে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করে গেছেন। ব্যক্তি জীবনে মালেক সাহেব খুবই আল্লাহওয়ালা মানুষ ছিলেন। নামাজ আদায়ের ব্যাপারে তাঁর কোন শৈথিল্য ছিল না। দুনিয়াবী কোন চাওয়া- পাওয়া কখনই তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য জীবনে বহু উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হলেও মাথা গোঁজার ঠাঁই হিসেবে সামান্য একটি বাড়ীও তিনি নির্মাণ করেননি। এর চেয়ে দুর্লভ চরিত্র এ যুগে আর কি হতে পারে!

পাকিস্তান হওয়ার পর আমরা যখন জেলে তখন তিনি মাঝে মাঝে বলতেনঃ দেখ ইব্রাহিম জীবন মৃত্যুর মালিক তো মুজিব নয়। আল্লাহতাআলার মেহেরবানী সাথে থাকলে আমাদের কেউ কিছু করতে পারবে না। আর মৃত্যু যদি ভাগ্যে থাকে সেটিও কেউ রুখতে পারবে না।

সে সময় পাকিস্তানের জন্য দিনরাত খেটেছেন এরকম একজন দক্ষ অফিসারের কথা না বলে পারছিনা। তিনি ছিলেন শফিউল আজম। সব রকম ভীতি ও ঝুঁকি উপেক্ষা করে দুর্যোগময় দিনগুলোতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনকে সচল রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি তখন পূর্ব পাকিস্তানের চীফ সেক্রেটারী।

শফিউল আজম সারা পাকিস্তান সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন। বাংলাদেশ হওয়ার পর নতুন সরকার তাঁর দক্ষতা মূল্যায়ন করেনি। মূল্যায়ন করেছিল তাঁর পাকিস্তান প্রীতিকে। এ কারণে প্রশাসন থেকে তাঁকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তানে অসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি আর্মি সিদ্ধান্ত নিল নতুন করে গণপরিষদ আহ্বান করার। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল পূর্ব পাকিস্তানের যে সমস্ত আসনে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সদস্যরা ভারতে পাড়ি দিয়েছিলেন তাদের সিটগুলো নিয়ে। কিছু আওয়ামী লীগ সদস্য অবশ্য পাকিস্তানেই ছিলেন।

তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এসব জায়গায় নির্বাচন করার মত অবস্থা ছিল না। তাই আর্মি সিদ্ধান্ত নিল পূর্ব পাকিস্তানের সব কটি ইসলামপন্থী দলের যৌথ মতামতের ভিত্তিতে সিলেকশনের মাধ্যমে উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের। এ ব্যবস্থাটা তখনকার পরিস্থিতিতে সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট ছিল না।

সরকারের তরফ থেকে উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ঘোষণা দেয়া হলে রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে সিটগুলো ভাগ করে নেয়। ফেনীর আসনটা নিয়ে রাজনৈতিক নেতারা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। কাকে এ আসনটা দেয়া যায় তা নিয়ে একদিন সকালে দেখি ফেনীর আমিনুল ইসলাম চৌধুরী আমার বাসায় হাজির। আইয়ুবের আমলে তিনি আওয়ামী লীগ থেকে এম এন এ নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু মুজিব তাঁকে ৭০ সালে জানিনা কি কারণে নমিনেশন দেননি। তিনি ভারতেও যাননি।

আমিনুল আমাকে এসে বললেন এ সিট থেকে তো একবার আমি এমএনএ হয়েছিলাম। তোমার তো সব নেতার সাথে খাতির। তুমি যদি তাঁদের একটু গিয়ে বল, তাহলে আর্মি আমাকে সিলেকশন দিতে পারে। আমি আমিনুল ইসলামকে নিয়ে নেতাদের বাড়ীতে ঘুরলাম। নেতারা আমিনুলকে নিয়ে যাওয়ায় প্রকাশ্যে কিছু বলেননি কিন্তু পিছনে অসন্তোষ জাহির করেছিলেন। সবুর সাহেব আমাকে তাঁর বাসার ভিতরে ডেকে নিয়ে বললেনঃ ইব্রাহিম, তুমি কাকে নিয়ে এসেছ। ওর কি কোন ঠিক আছে। পাকিস্তানের এ দুর্দিনে আমাদের সাচ্চা লোক চাই। তুমি ওখান থেকে দাঁড়িয়ে যাও। আমি ইতস্ততঃ করছিলাম। কিন্তু সবুর সাহেব আরও বললেন, ইব্রাহিম আমার কথায় না করো না। আমি যখন সবুর সাহেবের বাসায় যাই তখন দেখি আরও কয়েকজন এমএনএ পদপ্রার্থী সবুর সাহেবের অনুগ্রহ লাভের জন্য অপেক্ষা করছেন। এদের মধ্যে সাবেক প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য শামসুদ্দীন আহমদ, এডভোকেট মোসলেহউদ্দিন প্রমুখ রয়েছেন। তাঁরা সবাই মুসলিম লীগের নেতা ও কর্মী। আমার তখন মনে হয়েছিল পাকিস্তান ভেঙ্গে যাচ্ছে আর মুসলিম লীগের কর্মীরা পরিষদ সদস্যের সিট ভাগাভাগি করার জন্য কামড়াকামড়ি করছেন। এই মুসলিম লীগ দিয়ে কি পাকিস্তানের বিপর্যয় রোধ করা যাবে?

নমিনেশন পেপার জমা দেওয়ার জন্য আমাকে যেতে হয়েছিল নোয়াখালীতে। প্রথমে যাই ফেনীতে। ঢাকা- চট্টগ্রাম হাইওয়ের মাঝখান থেকে ফেনীর দিকে যে ডাইভারশন রোড চলে গেছে সেই রাস্তার ওপরে তখন অবিরাম

যুদ্ধ চলছে। ইন্ডিয়ান আর্মি একাধারে শেলিং করে চলেছে। সীমান্তের ধার ঘেঁষা এ রাস্তা তখন প্রায় বন্ধ।

আমার ভাগ্নে বদরুল আহসানের গাড়ী নিয়ে আমি প্রথমে লাকসাম হয়ে নোয়াখালী যাই, সেখান থেকে ফেনী পৌঁছি। ফেনীতে গিয়ে নমিনেশন পেপারের জন্য প্রথমে প্রস্তাবক ও সমর্থক জোগাড় করি। তারপর সেই নমিনেশন পেপার জমা দেই নোয়াখালীর রিটার্নিং অফিসারের কাছে। আমি যখন নোয়াখালী কোর্ট বিল্ডিং এ নমিনেশন পেপার জমা দিতে যাই তখন আমার দেখা হয় এডভোকেট লুৎফুর রহমানের সাথে। তিনি আমাকে বললেন ইব্রাহিম ভাই, আপনি তো আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিতে চাচ্ছেন। কি হবে কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমি তাঁকে বললাম, পাকিস্তানের আদর্শের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে আমি প্রস্তুত আছি। তোমার আব্বা সারাজীবন মুসলিম লীগ করেছেন। তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না। লুৎফর ছিলেন খান বাহাদুর আব্দুল গোফরানের ছেলে।

নমিনেশন পেপার নিয়ে যখন রিটার্নিং অফিসারের রুমে গিয়েছি তখন আমার জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। দেখি একজন সামরিক পোষাক পরিহিত অবসরপ্রাপ্ত আর্মি অফিসারও এসেছেন নমিনেশন পেপার জমা দিতে। দুর্যোগময় আবহাওয়াতেও নির্বাচনের উন্মাদনা দেখতে মন্দ লাগেনি।

নোয়াখালী থেকে পুনরায় ফেনী গিয়েছিলাম আত্মীয়- স্বজনসহ বন্ধুবান্ধবের সাথে দেখা করতে। তাদেরকে বলেছিলাম পাকিস্তানের আদর্শের লড়াই হিসেবে এ নির্বাচনকে আমি নিয়েছি। এর মধ্যে আমার আর কোন উদ্দেশ্য নেই। ফেরার সময় আমি ট্রেনে করে চট্টগ্রাম পৌঁছেছিলাম। ট্রেন চলাচলও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যত্রতত্র ট্রেনে বোমাবাজী হচ্ছিল। কোথাও রেল লাইনের ফিস প্লেট তুলে ফেলছিল তরুণেরা। চট্টগ্রাম থেকে আমি কিছু চান্দা মাছের শুটকী কিনেছিলাম। শুটকী মাছের গন্ধ যাতে প্লেনের যাত্রীদের বিব্রত করতে না পারে সেজন্য কার্টুনে খুব ভাল করে মাছগুলো কাপড় দিয়ে বেঁধে নিয়েছিলাম। কিন্তু গোল বাধলো অবশেষে ঐ কার্টুনটি নিয়ে।

এয়ারপোর্টে তখন আর্মি যাত্রীদের ব্যাগ খুলে সার্চ করত। বাক্স দেখে তাদের সন্দেহ হল হয়ত আমি এর মধ্যে বোমা জাতীয় কিছু লুকিয়ে রেখেছি। তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করায় বললাম, এর মধ্যে শুটকী ছাড়া অন্য কিছু নেই। দরকার হলে তোমাদের আমি খুলেও দেখাতে পারি। তারা আমার কথা শুনল না। তারা আমাকে প্লেন থেকে নামিয়ে দিল। অবশেষে সেই শুটকী আমাকে ফেলে

রেখে আসতে হয়েছিল। পরের দিন প্লেনে করে আমি ঢাকা পৌঁছেছিলাম। আর্মি তখন কাউকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। আর্মির এই অবিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ ছিল। কেননা, তখন তারা নিজের দেশেই পরবাসী হয়ে উঠেছিল। ঢাকায় আসার চারদিন পর গেজেটে আমার নাম পাকিস্তানের গণপরিষদ সদস্য হিসেবে প্রকাশিত হল।

কিন্তু সেই গণপরিষদ সদস্য হিসেবে কাজ করার আমার আর সৌভাগ্য হয়নি। এর মধ্যে একদিন খবর পেলাম মোহন মিয়া করাচী যাচ্ছেন। যেদিন তিনি যাবেন সেদিন আমি তাঁর আরমানীটোলার বাসায় দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, আমি ভূট্টো ও মুজিব দু'জনের সাথেই দেখা করব। একটা রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া পাকিস্তান রক্ষা করা যাবে না। মোহন মিয়ার সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। তিনি করাচীতে যাওয়ার কয়েকদিন পরেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর লাশ এনে ফরিদপুরেই দাফন করা হয়।

১৬

একদিন রাত দশটার দিকে হঠাৎ করে টেলিফোন কল পেলাম। মোনেম খানকে গেরিলারা তাঁর বনানীর বাসায় গুলি করেছে। মোনেম খান তখন অবসর জীবন যাপন করছিলেন। রাজনীতির সাথে তাঁর কোন সংশ্রব ছিল না বললেই চলে। গেরিলারা তাঁকে টার্গেট করার বোধ হয় এটাই কারণ ছিল যে, তিনি আইয়ুব খানের প্রিয়ভাজন ছিলেন এবং আগাগোড়া পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। মোনেম খানকে পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নেয়া হয়। সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

এ মানুষটি এ ভূ- খন্ডে উন্নতির এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। আজও তাঁর উন্নয়নের স্বাক্ষর সর্বত্র নজরে পড়ে।

নভেম্বরের শেষের দিকে পরিস্থিতির নিদারুণ অবনতি হল। গেরিলারা চারিদিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ভিতর ঢুকে পড়ছিল। আমার কাছে মনে হল আর্মি তাদের সামনে কেমন যেন নিস্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। ঢাকা শহরের বেশ কিছু জায়গায় গেরিলারা বোমাবাজী করে বিভীষিকা সৃষ্টি করে। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্বেগজনকভাবে হত্যার খবর আসতে থাকে। কলকাতা বেতার থেকে অবিরতভাবে পাকবাহিনীকে আত্মসমর্পন করার উপদেশ দেয়া হয়। মনে হচ্ছিল পুরো পূর্ব পাকিস্তানের আকাশসীমা ইন্ডিয়ার কব্জায় চলে গেছে।

ডিসেম্বরের তিন তারিখে ইয়াহিয়া ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধ ঘোষণা ইয়াহিয়া কেন করেছিলেন তা বলতে পারব না। এতদিন ইন্ডিয়া গেরিলাদের বুদ্ধি- পরামর্শ ও ট্রেনিং দিয়েছে। গেরিলাদের সাথে মিলে মিশে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু প্রকাশ্যে সে সব কথা অস্বীকার করেছে। এখন ইয়াহিয়ার যদ্ধু ঘোষণার পর ইন্ডিয়া প্রকাশ্যে হামলা করার সুযোগ পেয়ে গেল।

ইয়াহিয়ার পরামর্শদাতারা পাকিস্তানের মঙ্গল চাইত কিনা জানিনা। তবে এটা নিশ্চিত যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে ইয়াহিয়া অন্ততঃ তাৎক্ষণিকভাবে কোন সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না।

পাক আর্মির উপর আমাদের যে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তা লোপ পেতে শুরু করল। আমরা এটুকু বিশ্বাস করতাম যুদ্ধে জয় না হোক ইন্ডিয়ান আর্মিকে অন্তত আমাদের আর্মি ঠেকিয়ে রাখতে পারবে। আসলে '৬৫সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় আর্মি যে নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনা পেয়েছিল '৭১ সালের যুদ্ধে তার কিছুই পায়নি।

এসময় আমার কাজ ছিল সকালে সবুর সাহেবের বাসায় যাওয়া, বিকালে ফিরে আসা। সারাদিন তাঁর সাথে যুদ্ধের গতি- প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করতাম। রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবতাম সারা ভারত বর্ষের মুসলমানরা পাকিস্তান বানিয়েছিল। আজ আমার দেশের তরুণরা তাদের পূর্ব পুরুষের ইতিহাসকে কেমন করে মুছে দিতে চাইছে?

ডিসেম্বরের ৭ তারিখ রাতে খবর পেলাম ইন্ডিয়ান আর্মি যশোর শহরে ঢুকে পড়েছে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম যশোর টাউন হলে জনসভা করেছেন। সৈয়দ নজরুল নাকি সেদিনই ঘোষণা দিয়েছিলেন আজ থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাংলাদেশের মূলনীতি করা হল।

৮ তারিখ সন্ধ্যায় সবুর সাহেবের কাছ থেকে বাসায় ফিরেই কান্নার রোল আর আহাজারি শুনতে পেলাম। অনেকটা ভড়কে গিয়েছিলাম এই ভেবে কেউ আবার বোমা টোমা ছুঁড়েছে কি না। ঘরে ঢুকেই দেখি আমার পাশের বাড়ীর এক অবাঙ্গালী পড়শীর বৌ বুক চাপড়ে কাঁদছেন আর বলছেন হামারে লাল কো লে আইয়ে। মুক্তি লোগ উসকো মার দিয়া। অর্থাৎ আমার ছেলেকে এনে দাও। মুক্তিবাহিনীর লোকেরা তাকে মেরে ফেলেছে। ঘটনাটা ঘটেছিল এরকম: ছেলেটার নাম ছিল আমিন। গেরিলারা তাকে কিভাবে ধরে নিয়ে সায়দাবাদের কাছে গুলি করে মেরে ফেলে। আর্মিকে বিপদে ফেলার জন্য এটা ছিল এক ফাঁদ, পরে জেনেছিলাম। গেরিলাদেরই কেউ আমিনকে মারার পর খুব সন্তর্পণে এসে আমিনের মাকে বলে যায়, তোমার ছেলের লাশ সায়দাবাদে পড়ে আছে। আমিনের মা তো কেঁদে আকুল। আমিনের মা যখন আগন্তুক ছেলেটাকে অকুস্থলে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন সে তখন বলে, আমাকে চিনে ফেললে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। তুমি একটা শাড়ী দাও। সেই শাড়ী পরে আমিনের মার সাথে ছেলেটা রিক্সায় করে সায়দাবাদ পর্যন্ত যায়। তারপর ছেলেটা উধাও হয়ে যায়। ছেলের লাশের পাশে বসে আমিনের মা একা একা হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। তখন বোধ হয় কোন রিকশাওয়ালার মনে দয়ার উদ্রেক ঘটে। সে আমিনের মাকে সায়দাবাদে রেখে তাদের বাড়ীতে এসে খবর দেয়। আমিনের মার খোঁজে বাড়ীতে সবাই উৎকন্ঠিত হয়ে বসেছিল। তখন আত্মীয়- স্বজন মিলে আমিনের মাকে আনতে পুনরায় সায়দাবাদ যায়। সায়দাবাদ তখন একটা বিরান এলাকা। এত জনবসতি সেখানে গড়ে ওঠেনি। যারা আমিনের মাকে আনতে গিয়েছিল তারা লক্ষ্য করে লাশটার আশেপাশে কিছু সন্দেহজনক লোক ঘোরাফেরা করছে।

তাদেরও সন্দেহ হয় এখানে নিশ্চয় কোন ষড়যন্ত্র আছে। তাই তারা লাশ না নিয়েই আমিনের মাকে তাড়াতাড়ি করে বাড়ী নিয়ে আসে।

আমি সব ঘটনা শুনে জগন্নাথ কলেজের আর্মি ক্যাপ্টেন মেজর নাসিমকে টেলিফোন করি। নাসিম টেলিফোন পেয়েই আমার বাসায় চলে আসে। কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ সায়েদাবাদ না গিয়ে আর্মি হেড কোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করে। সেখান থেকেই সে বোধ হয় খবর পায় এটা একটা ফাঁদ। লাশ উদ্ধার করতে গেলে বিপদ হতে পারে। আসলে গেরিলারা মনে করেছিল অবাঙ্গালী আমিনের মৃত্যুর খবর পেয়েই আর্মি আসবে এবং তখনই তাদের উপর অতর্কিত হামলা চালানো হবে। নাসিম আমাকে বলল আমার কাছে খবর আছে এটা একটা ট্র্যাপ। কাল আমি ওসিকে বলব মিউনিসিপ্যালটির ট্রাকে করে যেন লাশটা নিয়ে আসে। নাসিম আরও বলল আমার নিশ্চিত বিশ্বাস সকালে গিয়ে লাশ পাওয়া যাবে না। আসলেই পরদিন কোন লাশ পাওয়া যায়নি।

আমিনের মা জানতেন না তাঁর ছেলের মত তিনিও দিন কয়েকের মধ্যেই লাশ হয়ে যেতে পারেন।

১৩ তারিখ দুপুরে সবুর সাহেবের বাসায় বসে আছি। চারদিক থেকে পাক আর্মির পরাজয়ের খবর আসছিল। এমন সময় খুলনা থেকে মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী সবুর সাহেবের কাছে টেলিফোন করে এক উদ্বেগজনক খবর দিলেন। তিনি জানালেন ইন্ডিয়ান আর্মি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে নিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। দৌলতপুর পর্যন্ত ইন্ডিয়ান আর্মি চলে এসেছে। শুধু শেলিং হচ্ছে। পাক আর্মি তাদেরকে ঠেকানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু বোধ হয় বেশীক্ষণ প্রতিরোধ টিকবে না।

সবুর সাহেবকে খুব বিচলিত মনে হল। এতদিন তাঁর সাথে চলেছি তবে তাঁর মধ্যে কখনও এরকম অস্থিরতা দেখিনি। খুলনা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে একথা বোধ হয় তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। চিৎকার করে মোহাম্মদ আলীর সাথে কথা বলছিলেন। আমার মনে হচ্ছিল তিনি বিকারগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন।

টেলিফোনে সবুর খান মোহাম্মদ আলীকে বললেন তোমরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ে যাও। ইন্ডিয়ার কাছে তোমরা আত্মসমর্পন করো না। দেখো মোহাম্মদ আলী খুলনায় আমি পাকিস্তানের পতাকা উড়িয়েছিলাম। খুলনা কখনও পাকিস্তানে আসত না। ওখানে ইন্ডিয়ার পতাকা উড়েছিল। খুলনার ডিএমসি বসাক আমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করেছিল। আমি পালিয়ে কলকাতায় গিয়ে বাউন্ডারী কমিশনের সামনে খুলনার দাবী তুলে ধরি। তারপরই খুলনা

পাকিস্তানভূক্ত হয়। সেই খুলনায় ইন্ডিয়ার পতাকা উড়বে এ আমি সহ্য করব কি করে! আমার চাঁদতারা পতাকার তোমরা কোন অসম্মান হতে দিওনা...।

টেলিফোন রেখে দিয়ে সবুর সাহেব আমার সামনের সোফায় ধপাস করে বসে পড়লেন। মনে হচ্ছিল তিনি যেন থরথর করে কাঁপছেন। আমার পাশে তখন রংপুরের সাঈদুর রহমান বসা। আমাদের উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন খুলনাকে আমি পাকিস্তানভূক্ত করেছিলাম। সেই খুলনার মানুষ এখন আলাদা হতে চায়। পাকিস্তানে আসার জন্য খুলনার মুসলমানরা রোজা রেখেছিল। নামাজ পড়েছিল। এখন তারা পাকিস্তানের বাইরে চলে যেতে চায়। খুলনা ইন্ডিয়ায় থাকলে এদের স্বাধীনতা কোথায় থাকত? আমি কাদের জন্য সংগ্রাম করেছিলাম? ৭০-এর নির্বাচনের সময় এরা আমাকে ভোটও দেয়নি। অথচ খুলনার মানুষের জন্য আমি কি না করেছি।

১৭

রাত একটার দিকে শাহ আজিজুর রহমানের বাসা থেকে টেলিফোন পেলাম। শাহ সাহেব নিজেই কথা বলছিলেন। আমাকে বললেন ইব্রাহিম, সবুর ভাইয়ের অবস্থা খারাপ। ঢাকা মেডিকেল কলেজে আছেন। এখন তাঁকে দেখতে যেতে হবে। আমি বললাম, এত রাতে যাই কি করে? আমার তো কোন গাড়ী নেই। তাছাড়া রাস্তাঘাট বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। শাহ সাহেব বললেন, আমি গাড়ী নিয়ে আসছি তুমি রেডি থেকো।

শাহ সাহেবের সাথে যখন আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজে পৌঁছি তখন সবুর সাহেব বেডে শুয়ে আছেন। আসার সময় দেখি রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাক আর্মি দাঁড়িয়ে আছে। সেই রাতে হাসপাতালের ডাক্তাররা আন্তরিকভাবে সুবর সাহেবকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিলেন। বারবার এসে খোঁজ নিচ্ছিলেন কখন তাঁর জ্ঞান ফেরে। সারারাত শাহ সাহেব, সাঈদুর রহমান আর আমি সবুর সাহেবের খাটের পাশে বিনিদ্র বসেছিলাম। চারদিকে তখন শেলিং এর আওয়াজ। ইন্ডিয়ান আর্মি ঢাকার উপকণ্ঠে প্রায় পৌঁছে গেছে। হাসপাতালের মেঝেতে দেখলাম বহুসংখ্যক লাশ পড়ে আছে। সব শেলিং এর শিকার। এদের মধ্যে গেন্ডারিয়ার মুসলিম লীগ নেতা আহসানুল্লাহ সর্দার আর তাঁর ছেলের লাশ চিনতে পারলাম।

ফজরের সময় মেডিকেল কলেজের পাশেই ইন্ডিয়ান প্লেনগুলো বোমা বর্ষণ করল। বোধহয় সবুর সাহেবের কথা তারা জেনে ফেলেছিল। কখন কোথায় কি ঘটত আওয়ামী লীগারদের কল্যাণে ইন্ডিয়ান আর্মি সব জেনে যেত। ইন্ডিয়ান প্লেনগুলো আরও বোমাবর্ষণ করল গভর্ণর হাউসে।

আমাদের তখন জীবন মৃত্যুর সীমানা খুব নিকটতর হয়ে এসেছে। সামনের দিনগুলো যে অনিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে তা স্পষ্টই টের পাচ্ছিলাম। ভোরের আলো ফুটতেই খাজা খয়রুদ্দীন আর পিডিপি'র শফিকুর রহমান ও আবু সালেক এলেন সবুর সাহেবকে দেখতে। এর মধ্যে সবুর সাহেবের অবশ্য জ্ঞান ফিরেছে। একটু একটু কথা বলছিলেন তিনি।

বোমা বর্ষণের পর আমাদের কাছে মনে হল সবুর সাহেবকে আর হাসপাতালে রাখা নিরাপদ নয়। ব্যাপার হল তাঁর মত মানুষকে যেখানেই রাখা হোক না কেন প্রতিপক্ষ অবশ্যই সেটা জেনে যেতে পারে। পরে আমরা সবাই মিলে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে মোহাম্মদপুরে মর্নিং নিউজ পত্রিকার সম্পাদক আজিজুর রহমানের বাসায় তাঁকে রাখার সিদ্ধান্ত নেই। হাসপাতাল থেকে সবুর

সাহেবকে ডিসচার্জ করে তাঁকে আজিজুর রহমানের বাসায় রেখে তারপর প্রথমে সবুর সাহেবের ধানমন্ডির বাসায় যাই। তাঁর বাড়ীর কাজের লোকদের ভালভাবে বলে আসি দরজা জানালা সব বন্ধ রাখতে। আর কেউ যদি সবুর সাহেবকে খোঁজ করতে আসে তাহলে পরিষ্কার 'জানিনা' বলে দিতে।

সবুর সাহেবের বাসা থেকে আমি শাহ আজিজের বাসায় গেলাম। তাঁকে খুবই উদ্বিগ্ন মনে হল। তাঁকে বললাম, আমাদের তো দিন ফুরিয়ে আসছে। শাহ সাহেব আল্লাহর উপর ভবিষ্যৎ ছেড়ে দেয়ার কথা বললেন।

শাহ সাহেবের বাসা থেকে ফিরে এবার আমার পাড়ার বন্ধু আবু সালেকের বাসায় ঢুঁ দিলাম। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম সরে যেতে হলে দু'জনেই একসাথে সরে যাব।

১৪ ডিসেম্বর পুরো ঢাকা শহর থমথম করছিল। কে যে কোন পক্ষে, কার গতিবিধি কি রকম বোঝা মুশকিল হয়ে পড়েছিল। পাক আর্মি তখন প্রকৃতপক্ষে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। পরে শুনেছি তারা তখন ইন্ডিয়ান আর্মির কাছে সারেন্ডার করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

১৪ তারিখ রাত পার হল উদ্বেগ ও আশঙ্কার মধ্যে। ১৫ তারিখ সকালে আজিমপুর সরকারী কলোনীতে আমার এক ভগ্নিপতি ওহাব সাহেবের বাসায় গেলাম। বোনের খোঁজ নেয়ার জন্যই আমি সেখানে গিয়েছিলাম। ওহাব তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপ- সচিব। তাঁর বাসায় পরিচয় হল একই মন্ত্রণালয়ের অরবিন্দু বাবু নামে আর এক উপ- সচিবের সাথে। অবস্থার কারণে তিনি এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

আমি মুসলিম লীগ করি শুনে তিনি যেন সাপ দেখার মত আঁতকে উঠলেন। অনেকটা ফোঁস করে বলে উঠলেন: এখনও মুসলিম লীগ! আমি বললাম, অরবিন্দু বাবু কেন এসব কথা বলছেন? পাল্টা তিনি বললেন, বলব না কেন? মুসলিম লীগই তো এদেশটাকে শেষ করেছে।

বুঝতে পারছিলাম অরবিন্দু বাবু হাওয়ার গতি দেখে কথা বলা শুরু করেছেন। আমি তাঁকে বললাম দেখেন কারা শেষ করেছে বা করেনি সেটা এখন বিচার করার সময় নয়। আমি আজও বিশ্বাস করি মুসলিম লীগ একটা আদর্শ। এই আদর্শের জন্য আমি চিরদিন কাজ করেছি। এতে আমার সামান্যতম লজ্জা নেই। মুসলিম লীগ এ দেশের মানুষের জন্য কি করেছে তা ইতিহাস বিচার করবে। এদেশে যদি মুসলিম থাকে মুসলিম লীগও থাকবে।

জানিনা অরবিন্দু বাবু আমার কথায় খুশী হতে পেরেছিলেন কি না। তবে তখনকার পরিস্থিতিতে যে তিনি আমার কথায় মনে মনে কৌতুকের হাসি হেসেছিলেন তা এখন স্পষ্ট বুঝতে পারি।

বাসায় ফিরে এসে ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধু- বান্ধবের কাছে টেলিফোন করলাম।

হেকিম ইরতেজাউর রহমান বললেন ইব্রাহিম, আমার তো পালাবার কোন জায়গা নেই। তাছাড়া বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে কোথায় যাব! আমি তো কোন অন্যায় করিনি। পাকিস্তান আমার আদর্শ, তার জন্য আমি কাজ করেছি। এটা কোন অপরাধ নয়।

হেকিম সাহেব পরে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পন করেছিলেন। তারা তাঁকে জেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তিনি ছিলেন বাংলাদেশে দ্বিতীয় পাকিস্তানপন্থী কারাবন্দী। প্রথমজন ছিলেন শেরে বাংলা ফজলুল হকের ছেলে ফয়জুল হক। ফিরোজ আহমদ ডগলাসের কাছে টেলিফোন করার পর তিনি আমাকে বললেন, ইব্রাহিম ভাই আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমি আমার এক মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুর সাথে ব্যবস্থা করে ফেলেছি। আমি ইন্ডিয়া চলে যাচ্ছি। ডগলাসের সাথে আমাদের মুসলিম লীগের এক কর্মী আবদুল বারীও ছিল।

ইসলামপুরে আমাদের এক কর্মী মোবারকের বাসায় টেলিফোন করলাম। তিনি একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। কিন্তু কর্মী হিসেবে তাঁর তুলনা ছিল না। তিনি আমার কাছে তাঁর অসহায়ত্বের কথা জানালেন। বললেন, ইব্রাহিম ভাই কোথায় আর যেতে পারি। পাকিস্তানের জন্য যদি মৃত্যু হয় তবে আল্লাহ যেন তা কবুল করেন।

কয়েকদিন পর আমি তাঁর দুঃখজনক মৃত্যুর কথা শুনে মনে প্রচন্ড আঘাত পাই। পাক আর্মির আত্মসমর্পনের পরপরই এলাকার গেরিলারা তাঁকে খুঁজতে শুরু করে। বাঁচবার জন্য তিনি তাঁর বাড়ীর এক রুমের ফ্লোর খুঁড়ে গর্ত করেছিলেন। তিনি সেই গর্তের মধ্যে লুকিয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যু বোধ হয় তাঁকে তাড়া করে ফিরছিল। খোঁড়া হওয়ায় চলাফেরার জন্য তাঁকে একটি লাঠি ব্যবহার করতে হত। সেই লাঠিটা দেখেই গেরিলাদের সন্দেহ জাগে নিশ্চয় মোবারক বাসার ভিতর কোথাও লুকিয়ে আছেন। পরে খুঁজতে খুঁজতে তারা তাঁকে পেয়ে যায়।

রিভলবারের গুলিতে তাঁর শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। লাশ তারা সদরঘাটে কয়েকদিন ফেলে রেখেছিল প্রদর্শনীর জন্য। আমার তখন মনে হয়েছিল

এই সদরঘাটে বাহাদুর শাহ পার্কে ১৯৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজরাও মুসলমানদের লাশ ঝুলিয়ে রেখেছিল।

১৬ ডিসেম্বর সকালে শুনতে পেলাম পাক আর্মি আত্মসমর্পন করবে। দুঃখ ও বিষাদের মধ্যে আমি নির্মমভাবে উপলব্ধি করলাম ত্রিশ বছর ধরে যে আদর্শের জন্য কাজ করেছি, যে পাকিস্তানের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়েছি, মৃত্যুর সাথে জানবাজী রেখেছি, কোন ত্যাগ স্বীকারে পিছপা হইনি, আজ আমাকেই দেখতে হচ্ছে পাকিস্তানের করুণ পরিণতি।

সে সকালে আরও ভেবেছিলাম পাকিস্তানের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় হয়ত অনেক ত্রুটি- বিচ্যুতি ছিল। হয়ত আমাদের অনেকের স্বপ্ন পাকিস্তানের মাধ্যমে পরিপূর্ণ হতে পারেনি কিন্তু তাই বলে পাকিস্তানের প্রতি ভালবাসায় আমাদের কোন খাদ ছিল না।

পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়া সেদিন আমার মত অনেকের কাছেই ছিল দুঃস্বপ্নের দীর্ঘ রজনীর মত।

সে দিন সকালে সবুর সাহেব টেলিফোন করে আমাকে বললেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে ইব্রাহিম। তোমরা সব বেরিয়ে পড়। ইন্ডিয়ান আর্মি আর তার সহযোগী গেরিলারা এবার মুসলমানদের কচুকাটা করবে।

আমি মালেক সাহেবের কাছে টেলিফোন করে বললাম এখনতো বাসায় থাকাটা নিরাপদ নয়। আপনি আমার বাসায় চলে আসুন।

আমার বাড়ীর কাছে মুসলিম লীগের এক প্রাক্তন এমএনএ মাহতাবউদ্দিন থাকতেন। তাঁর কাছে টেলিফোন করলাম। মাহতাব বললেন, ইব্রাহিম ভাই আমি রায়ের বাজারের কাছে এক আত্মীয়ের বাসায় যাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ কোন অসুবিধা হবে না। ১৬ তারিখ সকালেই আমার পরিচিত আর্মির এক ক্যাপ্টেন নাজির হোসেন এল আমার বাসায়। সে ডিআইটির টেলিভিশন কেন্দ্র পাহারা দিত। সে বলল, আর্মি সারেন্ডার করতে যাচ্ছে। আপনিও আমাদের সাথে চলুন। নয়ত আপনার অনেক বিপদ হবে।

আমি বললাম, ধন্যবাদ। আমার জন্য ভেবো না। আমি আমার সব ব্যবস্থা করব। যাওয়ার সময় সে তার কাপড় চোপড়ের স্যুটকেসটা বাসায় রেখে গেলো। বলল পরে নিয়ে যাব।

আর্মির সারেন্ডারের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমার বাসার পাশে ছিল বিপুল সংখ্যক বিহারীর বাস। সারেন্ডারের কথা শুনে তাদের বাসা

থেকে যে গগণবিদারী কান্নার রোল উঠল তা কখনই ভুলবার নয়। গেরিলারা যে তাদের সর্বস্ব শেষ করে দেবে তা তারা তখনই বুঝতে পেরেছিল।

সকাল ৯টার দিকে সালেক এলেন। আমরা দু'জন আমারই পরিচিত এক বন্ধু ও আত্মীয় দক্ষিণ মৈষুন্ডীর এস.এ. চৌধুরীর বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। এতদিন ঢাকা শহরে আছি। কোনদিন এভাবে জীবন বাঁচানোর জন্য নিরূপায় অসহায়ত্বের মধ্যে অন্যের আশ্রয় ভিক্ষা করতে হবে সে কথা ক্ষণিকের জন্যও চিন্তা করিনি। কোনদিন ভাবতেও পারিনি নিজের দেশের মাটিতে এমনি করে পরবাসী হয়ে উঠব।

এস.এ. চৌধুরীর বাসায় গেলাম অনাহুতের মত। যতখানি আশা করেছিলাম চৌধুরী ঠিক ততখানি আন্তরিকভাবে আমাদের গ্রহণ করলেন না। পরিস্থিতিই এজন্য দায়ী। চৌধুরীর ব্যবসা- বাণিজ্যে আমি এতদিন তাঁকে সহযোগিতা করেছি।

চৌধুরীর চেয়ে তাঁর স্ত্রীকে দেখলাম এক হাত বাড়া। মহিলা হয়ত আমাদেরকে ভীত- সন্ত্রস্ত করার জন্য আজগুবি সব কথা বলতে লাগলেন।

তাদের বাসায় আমরা বিকাল পর্যন্ত ছিলাম। মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম এখানে থাকা নিরাপদ নয় ভেবে। হয়ত এরাই শেষে আমাদের প্রতিপক্ষের হাতে তুলে দিবে। আমরা তখন পুরানো পল্টনের এস.এম. ইউসুফের সাথে যোগাযোগ করলাম। তখন তিনি ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব। তাঁর দু'ছেলে গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। একবার আর্মি তাদের ধরে ফেললে আমি আর সালেক ছেলে দু'টোকে উদ্ধার করেছিলাম। সালেক বললেন হয়ত কৃতজ্ঞতার খাতিরে তিনি আমাদের আশ্রয় দিবেন। ইউসুফ দেখলাম আমাদের ভোলেননি। তিনি একটা জীপ পাঠিয়ে দিলেন। জীপটা চালিয়ে নিয়ে এসেছিল কয়েকজন গেরিলা। বিপদে পড়লে মানুষের যে কত রকমের চেহারা দেখা যায় তখন তা বুঝতে পারলাম।

ইউসুফের পাঠান জীপে করে যখন গভর্ণর হাউসের পাশ দিয়ে যাচ্ছি তখন দেখলাম ইন্ডিয়ান আর্মির কনভয় ডেমরার দিক দিয়ে ঢাকায় প্রবেশ করে ক্যান্টনমেন্টের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আর আমাদের জীপের গেরিলারা 'জয় বাংলা' বলে এক একবার চিৎকার করছে। কয়েকবার গাড়ী থামিয়ে গেরিলারা ইন্ডিয়ান আর্মিকে অভিনন্দন জানাতে ছুটে গেল। তারা কয়েকবার ইন্ডিয়ান সৈন্যদের বুকে জড়িয়ে ধরল। আমরা স্থবির হয়ে বসে রইলাম। মনে হল স্বপ্ন দেখছিনাতো! আমরা কি এখনও বেঁচে আছি?

ইউসুফের বাসায় গিয়ে পৌঁছেছিলাম সন্ধ্যার দিকে। তিনি আমাদেরকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। বললেন, একি সর্বনাশ হয়ে গেল। আমার ছেলেরা আজকে যে মোহে ডুবে আছে, কিছুদিনের মধ্যেই সে মোহ ভঙ্গ হবে ইব্রাহিম ভাই। ওরা জানেনা ওরা মুসলমানদের কত বড় ক্ষতি করল। কথায় কথায় তিনি বললেন তাঁর ছেলে দুটো এখনও ঢাকায় পৌঁছেনি। সাভার হয়ে যে ইন্ডিয়ান আর্মির কনভয় আসছে তাদের সাথেই ওরা আসবে।

রাত ১১টার দিকে হঠাৎ হৈ চৈ আর কান্নার রোল শুনতে পেলাম। ইউসুফের বাসার সামনে ছিল একটা খোলা জায়গা। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম সেই খোলা জায়গায় কিছু সংখ্যক অবাঙ্গালীকে দাঁড় করানো হয়েছে গুলি করে মারার জন্য। কয়েকজন গেরিলা স্টেনগান তাক করে আছে তাদের বুক ও মাথা বরাবর।

অবাঙ্গালীদের পোষাক-আশাক দেখে মনে হল তারা খুব সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকজন হবে। তাদের বৌ ছেলে-মেয়েরা তখন গেরিলাদের কাছে মিনতি করে চলেছে সব কিছুর বিনিময়ে প্রাণ ভিক্ষা দেওয়ার। নিজের চোখে দেখলাম এই সব মেয়ে নিজেদের অলঙ্কার ছুঁড়ে দিচ্ছে গেরিলাদের দিকে। কিন্তু গেরিলাদের অন্তরে সামান্যতম করুণার উদ্রেক হয়নি। এক এক করে তারা সেই রাতে সবগুলো পুরুষকে গুলি করে মেরে ফেলল। নিহতদের বৌ ছেলে মেয়ের ভাগ্যে পরে কি ঘটেছিল তা আর কখনও জানতে পারিনি। এদের অপরাধ ছিল এরা অবাঙ্গালী। এই হত্যাকান্ডের নির্মম দৃশ্য দেখে আমি হতচকিত হয়ে পড়েছিলাম। সালেক বললেন, এখানে আমাদের অবস্থান বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে যে কোন সময়। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম ধানমন্ডিতে সালেকের ভায়রা শামসুল আলমের বাসায় চলে যাব। ইউসুফকে বললাম ভাই এখানে তো আমরা আর কোনভাবেই নিরাপদ বোধ করছি না। তাছাড়া আপনার গেরিলারা কখন এসে পড়বে তাও বুঝতে পারছি না। তারা কিভাবে আসবে, কিভাবে আমাদের গ্রহণ করবে একেবারেই বলা মুশকিল। ইউসুফ আমাদের কথার গুরুত্ব বুঝতে পারলেন। তিনি নিজে সেই রাতে তার শ্যালক মাহফুজুর ইসলামকে ডেকে নিয়ে আসলেন। মাহফুজ রেডিও পাকিস্তানের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। ইউসুফ তাঁকে বললেন, ভোর চারটার দিকে আমাদের দু'জনকে ধানমন্ডিতে পৌঁছে দিতে হবে। মানুষ যেমন মানুষের শত্রু হয় কখনও কখনও তেমনি মানুষই মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসে- সেই রাতে মাহফুজ সাহেবের ব্যবহারে অন্তত তাই মনে হল। তিনি আমাদেরকে তখনি তাঁর নিজের বাসায় নিয়ে গেলেন। ইউসুফের বাসার কাছেই

ছিল তাঁর বাসা। দীর্ঘক্ষণ তিনি আমাদের সময় দিলেন। ভোর সাড়ে তিনটার সময় নিজের গাড়ীতে করে আমাদের নিয়ে চললেন ধানমন্ডির দিকে। পুরানো পল্টন থেকে তিনি সোজাসুজি ধানমন্ডি না গিয়ে ইউনিভার্সিটির ভিতর দিয়ে রওনা হলেন। শীতের রাত। হঠাৎ হঠাৎ গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। বুঝলাম কোথাও কোন অঘটন ঘটছে। তবে আমাদের জন্য আরও বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করছিল। রাত চারটার দিকে শামসুল আলমের বাসায় গিয়ে যখন উঠলাম তখন দেখি তিনি আমাদের দেখে ভূত দেখার মত কেঁপে উঠলেন। আমাদের দেখেই তিনি সোজাসুজি বলে ফেললেন আপনারা এখানে কেন?

সালেক তাঁর আপন ভায়রা। আত্মীয়ের সাথে মানুষ কত প্রীতিহীন আচরণ করতে পারে সেটা আবার নতুন করে দেখলাম। শামসুল আলম বললেন, আপনারা আমাকে খুব বড় বিপদে ফেললেন। আপাতত থাকেন কিন্তু বেশীক্ষণ আমি আপনাদের আশ্রয় দিতে পারব না।

তারপর তিনি তাঁর বাড়ীর পিছনের একটা ছোট্ট ঘরে অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের থাকার ব্যবস্থা করলেন।

ভোরে উঠে বুঝলাম এ বাড়ীটা মূলতঃ আওয়ামী লীগের আস্তানা। আমরা ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে ছিলাম। হঠাৎ দেখি 'জয়বাংলা' ধ্বনি দিতে দিতে দুই গাড়ী ভর্তি কতকগুলো তরুণ তরুণী এসে বাড়ীটার সামনে থামল। তাঁরা বলাবলি করছে রেসকোর্সে গিয়েছিলাম। অমুক কর্ণেলকে মালা পরিয়েছি। অমুক ক্যাপ্টেনকে মিষ্টি খাইয়েছি। আমরা ভাবছিলাম এ কোথায় এসে পড়লাম। এর মধ্যে শামসুল আলম আমাদের ঘরে ঢুকলেন। আমার কাছে ছিল একটা ছোট্ট রেডিও। আমি তখন পাকিস্তানের খবর শুনছিলাম। রেডিওর আওয়াজ পেয়েই বোধ হয় তিনি ঢুকেছিলেন।

আমাকে অনেকটা ধমকানোর সুরে বললেন, এখনও পাকিস্তান! এসব বন্ধ করুন। এখানে আপনাদের থাকা মোটেই নিরাপদ নয়।

উপায়ান্তর না দেখে টেলিফোন করলাম আমার এক আত্মীয় ইঞ্জিনীয়ার এস আর খানের বাসায়। বললাম নিজেদের অসহায়ত্বের কথা। তিনি আধা ঘন্টার মধ্যে আসছেন বলে টেলিফোন রেখে দিলেন। সত্যি সত্যি কিছুক্ষণের মধ্যে এস আর খানের স্ত্রী- যিনি সম্পর্কে আমার বোন- গাড়ী নিয়ে হাজির হলেন। তাঁর বাসা ছিল জিগাতলা মোড়ের কাছাকাছি। আমি আর সালেক আমাদের নতুন আশ্রয়ে গিয়ে উঠলাম। এস আর খান নিজে সমাদর করা শুরু করলেন। আমাদের যাতে

কোন অসুবিধা না হয় সব সময় তার খোঁজ- খবরও নিতে লাগলেন। তাঁর এক কথা আমাদের উপকার করতে পারলে তিনি আনন্দিত হবেন।

যেদিন এস আর খানের বাসায় এসে উঠেছিলাম তার পরের দিন বিকেলের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। হঠাৎ বাইরে হৈ চৈ শুনে বারান্দায় গিয়ে দেখি ইন্ডিয়ান আর্মি কিছু লোককে ধরে বেদম প্রহার করছে। জায়গাটা ঠিক বর্তমানের ইন্ডিয়ান হাইকমিশনের উল্টো দিকে। আজকের ইন্ডিয়ান হাই-কমিশন বিল্ডিংগুলো ছিল বিখ্যাত তিব্বত কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রির মালিকের। মালিক অবাঙ্গালী ছিলেন। শুধু এ অপরাধে ইন্ডিয়ান আর্মি ও গেরিলারা বাড়ীর মালিককে উৎখাত করে এবং নির্বিচারে লুটতরাজ করে। পরে শেখ মুজিব এ বাড়ীগুলো ইন্ডিয়ান হাইকমিশনকে বরাদ্দ দেন। ইন্ডিয়ানরা যখন লুটতরাজ চালাচ্ছিল তখন ঐ বাড়ীর সামনে দিয়ে কিছু লোক কতকগুলো গরু নিয়ে যাচ্ছিল পিলখানার দিকে। দীর্ঘদিন ধরেই পিলখানায় এই এলাকার গরু জবাই হত ব্যবসায়িক ভিত্তিতে। গরু জবাইয়ের কথা শুনে ইন্ডিয়ান আর্মি দারুণ ক্ষেপে যায় এবং গোশত ব্যবসায়ীদের উপর তখন চড়াও হয়।

গরুগুলো ইন্ডিয়ান আর্মি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেয় আর ব্যবসায়ীরা প্রাণভয়ে দ্রুত ঐ স্থান ত্যাগ করে। বুঝলাম মানুষের চেয়ে এখন গরুর ইজ্জত অনেক বেশী।

এস আর খানের বাসায় আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি। রেডিও শুনে, খবরের কাগজ পড়ে আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনায় আমাদের দিনগুলো কাটছিল। এর মধ্যে হঠাৎ দেখি ইন্ডিয়া ফেরৎ খালেদ মোশাররফ এস আর খানের বাসায় হাজির। তিনি ছিলেন এস আর খানের আপন ভাগ্নে। যুদ্ধ থেকে ফিরে মামার বাসায় উঠলেন।

একই বাসায় আমরা আর খালেদ মোশাররফ কয়েকদিন কাটিয়েছিলাম। আমরা তাঁর পরিচয় জানলেও তিনি আমাদের সম্পর্কে বিন্দু- বিসর্গও জানতেন না। আমরা দু'জন তাঁর মামীর দিকের আত্মীয় এটুকু তিনি শুনেছিলেন। দেখলাম খালেদ মোশাররফের মাথার সামনের দিকে একটা গুলির দাগ। শুনলাম যুদ্ধেই গুলিটা এসে লেগেছিল। অল্পের জন্য তিনি রক্ষা পান। ইন্ডিয়াতে চিকিৎসা করিয়ে আসতে তাই একটু দেরী হয়েছে। তাঁর সাথে আমাদের দেখা হত খাওয়ার টেবিলে। তখন তাঁর সাথে কিছু কিছু আলাপ হত। তাঁর সাথে আলাপে যেটুকু আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছিল যে খালেদ মোশাররফ ইন্ডিয়ান আর্মির ব্যাপক লুটতরাজ পছন্দ করতে পারছিলেন না। পাক আর্মির ফেলে যাওয়া কোটি কোটি

টাকার সমরাস্ত্র যেভাবে ইন্ডিয়া লুটে নিচ্ছিল তাঁর কথায় মনে হত তিনি এসবের বিরোধী।

এদিকে বাসায় অনুপস্থিত থাকায় আমার এলাকার গেরিলারা আমাকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। গেরিলারা অবশ্য কোন কুমতলবে আমাকে খোঁজেনি। যুদ্ধের সময় আর্মির হাত থেকে যে সব গেরিলাকে আমি উদ্ধার করেছিলাম তারাই কৃতজ্ঞতা বশতঃ আমাকে বাসায় ফিরিয়ে নিতে উদ্যোগী হল। এদের মধ্যে আবার আমার শ্যালক সাধনও ছিল। আর ছিল মাসুদ খান। জিলু, রাজা আমার স্ত্রীর কাছ থেকে কিভাবে ঠিকানা বের করে একদিন বিকেলের দিকে ৫/৬ জন গেরিলা অস্ত্রশস্ত্রসহ জীপে করে এস আর খানের বাসায় হাজির। এস আর খানের স্ত্রী এতগুলো সশস্ত্র মানুষকে দেখে ঘাবড়ে গেলেন। বাড়ীর সামনের গেটেই গেরিলাদের সাথে তার তর্ক বেধে গেল। তিনি যতই বলেন ইব্রাহিম সাহেব বলে এখানে কেউ নেই ততই গেরিলারা বলতে লাগল আমরা সব খবর নিয়েই এসেছি। এস আর খানের স্ত্রী তবুও অনড়। এর মধ্যে খালেদ মোশাররফ এসে হাজির। তিনি গেরিলাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা এখানে কি চাও? তাঁর কথা শেষ না হতেই আগত তরুণেরা বলল, এখানে আমাদের এক মুরুব্বী আছেন। তিনি আমাদের অনেক সহযোগিতা করেছেন। আমরা তাঁকে নিতে এসেছি।

এবার খালেদ মোশাররফের পাল্টা প্রশ্ন, কে তোমাদের মুরুব্বী?

তাদের কণ্ঠে নিষ্কম্প উচ্চারণঃ ইব্রাহিম হোসেন।

খালেদ মোশাররফ তখন বললেন, ও তিনি তো উপরেই আছেন। তোমরা উপরে এসো। সবকিছু যেন নাটকীয়ভাবে ঘটে যাচ্ছিল। এস আর খানের স্ত্রী ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত।

গেরিলারা উপরে উঠে এসে প্রথমেই আমাকে কদমবুসী করল। তারপর প্রায় সবাই এক সাথেই বলল, আপনি কেন এখানে এসেছেন। আপনি না হলে আমাদের অনেকেই জানে বাঁচত না। অনেকের সর্বস্ব শেষ হয়ে যেত। আপনার জন্য আমাদের এখন কিছু করবার সময় এসেছে।

গেরিলারা খালেদ মোশাররফের কাছে আমার পরিচয় দিয়ে বলল, ইনি মুসলিম লীগের খুব বড় নেতা। তাঁর জন্যই আমরা বেঁচে আছি। খালেদ মোশাররফ একটু অবাক হয়ে বললেন: মুসলিম লীগের নেতা তোমাদের উপকার করেছে? একরাশ বিস্ময় ঝরে পড়ল তাঁর চোখ থেকে।

আমি তখন খালেদ মোশাররফকে বললাম দেশের মানুষের জন্য আমরা রাজনীতি করেছি। দেশের মানুষকে বাঁচাবোনা তো কাকে বাঁচাবো? তবে ভারতীয় ষড়যন্ত্রকে আমরা কখনও মেনে নিতে পারিনি।

খালেদ মোশাররফ তখন আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন আপনাদের সম্পর্কে আমার ভুল ধারণা ছিল। আজ বুঝলাম আপনারাও দেশপ্রেমিক। দেশপ্রেম কারও একচেটিয়া সম্পত্তি নয়।

সেদিন ২৮শে ডিসেম্বর সন্ধ্যাবেলায় গেরিলারা আমাকে বাসায় নিয়ে এল। এতদিন অনেক কিছুর খবর রাখতে পারিনি। আমাদের দলের কে কোথায় আছেন তাও বুঝতে পারছিলাম না। খালি মনে হচ্ছিল আমি যেন অন্ধকারের বাসিন্দা হয়ে গেছি। বাসায় ফিরে আসার পর আশেপাশের কিছু অবাঙ্গালী প্রতিবেশী আমার সাথে দেখা করতে আসে। তাদের চোখে মুখে উদ্বেগের কালো ছায়া। তাদের মুখেই শুনলাম গেরিলারা তাদের উপরে কয়েক দফা চড়াও হয়েছে। তাদের বাড়ীঘর লুটতরাজ করেছে। শুনলাম তাদের অনেক আত্মীয়- স্বজনকে গেরিলারা নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগের লোকজন ইন্ডিয়া থেকে ফিরে আসতে শুরু করেছে। একদিন শুনলাম মুজিবও পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ঢাকার দিকে রওনা দিয়েছেন। বলা প্রয়োজন মুজিব পাকিস্তান থেকে সরাসরি ঢাকায় আসেননি। তিনি প্রথমে যান লন্ডন সেখান থেকে দিল্লী, পরিশেষে ঢাকা। দিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার মুজিবকে বিরাট সম্বর্ধনা দেয়। এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল। কেননা ইন্ডিয়া যা কোনদিন চিন্তা করতে পারেনি, মুজিবের কারণে তাদের সেই স্বপ্ন সফল হয়েছিল। ১৬ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের পতনের পর ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় দেয়া এক বক্তৃতায় বলেছিলেন আমরা হাজার বছরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছি। এই হাজার বছর বলতে ইন্দিরা মুসলমানদের হাতে বারবার হিন্দুর পরাজয়ের কথা বুঝিয়েছিলেন। একথা সত্য হাজার বছরে হিন্দুরা কখনও সম্মুখ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজিত করতে পারেনি। ইন্দিরার এই বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠে গেরিলাদের পরিচালিত 'স্বাধীনতার যুদ্ধে' কেন ইন্ডিয়া নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল। কারও স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রতি যদি ইন্ডিয়ার শ্রদ্ধাই থাকত তাহলে ইন্ডিয়ার ভিতরে স্বাধীনতাকামী অনেক জাতি গোষ্ঠী রয়েছে তাদেরকে তারা মুক্ত করে দিত। দিল্লীর রামলীলা ময়দানে মুজিবের সম্মানে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতার সময় প্রথমে তিনি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে একটা আভাস দেন। ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শেই মুজিব

ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের মূলনীতি হিসাবে এই জনসভায় সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্রের কথা বলেছিলেন। আওয়ামী লীগের নেতারা যে কয়েকদিন ঢাকায় এসে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেনি সে কয়েকদিন প্রশাসন চলতে থাকে ইন্ডিয়ান আর্মির নির্দেশে। কয়েকজন ইন্ডিয়ান আমলাও এসেছিলেন নতুন দেশের প্রশাসনিক কাঠামো কিভাবে গড়ে উঠবে সে সম্পর্কে গাইড লাইন দিতে। এদের মধ্যে পি.এন.হাসকার ও ডি.পি. ধরের নাম মনে পড়ছে।

রেডিও এবং কাগজে এ সময়ে সমানে প্রচার চালানো হচ্ছিল আমরা যারা পাকিস্তানপন্থী তাদেরকে দালাল বলে। যত রকম মিথ্যা ভাষণ ও মিথ্যা প্রচার চলতে পারে তাই চলছিল আমাদেরকে নিয়ে অব্যাহত গতিতে।

একদিন শুনলাম উপনির্বাচনে যাঁরা এমএনএ ও এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদেরকে আত্মসমর্পন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাঁদের জন্য সময়ও বেধে দেয়া হয়েছিল। কেউ আত্মসমর্পন না করলে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার হুমকি পর্যন্ত দেয়া হয়েছিল।

আমার গ্রামের বাড়ীতে থানা থেকে পুলিশ গিয়ে আমার সম্পত্তির খোঁজ খবর নিয়ে এসেছে শুনতে পেলাম। এদিকে গেরিলারা যদিও আমাকে নিয়ে এসেছিল কিন্তু তারাতো আমাকে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা কখনও দিতে পারত না। তাছাড়া কয়েকজন গেরিলা কি করতে পারে! কে কখন আমার উপর চড়াও হয় সে ব্যাপারে কিছুই বলা সম্ভব ছিল না। এরকম অরাজক পরিস্থিতিতে বাড়ীর সবার নিরাপত্তার কথা ভেবে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিলাম। এ সময় ঢাকার এসপি আব্দুস সালাম ছিলেন আমার পূর্ব পরিচিত। তাঁকে আমার স্ত্রী সব কথা খুলে বললে তিনি বললেন, কাল সকাল ১০টায় আপনার বাড়ীতে আসব। তারিখটা ছিল ১৯শে জানুয়ারী ১৯৭২। এসপি সাহেব ১০টার দিকে আসতে পারেননি। আমিত সকাল থেকে প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছি। সাড়ে বারোটার দিকে তিনি টেলিফোন করে বললেন, জেলের ভিতর একটা গন্ডগোল হয়েছিল, মিটমাট করতে দেরী হয়ে গেছে। আমি এখুনি আসছি। আমাকে বিদায় দেওয়ার জন্য আমার আত্মীয়- স্বজন অনেকেই এসেছিল। আমার প্রতিবেশীরাও কেউ কেউ এসেছিল। সবচেয়ে অসুবিধা হল আমার বাচ্চাগুলোকে নিয়ে। মাসুম বাচ্চারা যখন তাদের আব্বার জেলে যাওয়ার কথা শুনে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল তখন পরিস্থিতিটা সত্যিই অন্যরকম হয়ে গেল। রাজনীতির জন্য বাচ্চাদের কখনোই সময় দিতে পারিনি, আজ তাদের চোখের পানিতে আমার বুকটাও কেমন যেন সবকিছুর অজান্তে মোচড় দিয়ে উঠল।

আমার জেলে যাওয়ার দৃশ্য দেখে আর যারা সবচেয়ে বেশী ব্যথিত হয়েছিল তারা হল অবাঙ্গালী প্রতিবেশীরা। এতদিন তারা সুদিনে- দুর্দিনে আমাকে নির্ভরযোগ্য বন্ধু মনে করত। আজ আমাদের সবার এ ভাগ্য বিপর্যয়ের দিনে আমার জেলে চলে যাওয়াকে তারা অত্যন্ত মর্মঘাতী হিসেবেই বিবেচনা করছিল।

এসপি সাহেব আমাকে নিয়ে জেলে পৌঁছলেন। তখন জেলার ছিলেন নির্মল রায় বলে এক হিন্দু ভদ্রলোক। রায় বাবুকে আমি আগের একটি ঘটনার কারণে কিছুটা চিনতাম। এবার এসপি সাহেব তাঁর কাছে নতুন করে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর আত্মীয় এবং সাবেক এমএনএ হিসেবে। রায় বাবু শুনেছি আমাদের মত পাকিস্তানপন্থীদের মনে মনে পছন্দ করতেন না। কিন্তু উপরে উপরে আমার সাথে ভাল ব্যবহারই করলেন। হতে পারে এসপি সাহেবের সুবাদে তিনি এমনটি করেছিলেন। এসপি সাহেব রায়কে বললেন জেলের মধ্যে আমাকে যেন একটা ভাল জায়গা দেয়া হয়। রায় বাবু বললেন, জেলের ধারণক্ষমতা এক হাজার ৯শ জনের অথচ কয়েদী ঢুকানো হয়েছে ১২ হাজার। কোথায় যে কাকে জায়গা দেব কিছুই বুঝতে পারছি না। রায় বাবু তবুও এসপি সাহেবের খাতিরে একটা জায়গায় আমাকে দেয়ার কথা বললেন।

আমি কয়েদী হিসেবে জেলের মধ্যে ঢুকলাম। এতদিন শুনে এসেছি রাজনীতিবিদদের অভিজ্ঞতা ও পরিপক্কতা অর্জনের জন্য জেল একটা উত্তম স্থান। পৃথিবীর অনেক বড় বড় রাজনীতিবিদই জেলের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন- সেটুকু ভেবে এই দুর্বিপাকের দিনে সান্তনা পাওয়ার চেষ্টা করলাম।

রায় বাবু তাঁর এক সুবেদারকে ডেকে আমাকে একটা ভাল জায়গার ব্যবস্থা করে দিতে বললেন। সুবেদার আমাকে নিয়ে গেল ফাঁসির সেলে। পাকিস্তানপন্থীদের জেলে ঢুকানোর আগে এসব জায়গায় সাধারণত ফাঁসির আসামীদের রাখা হত। একটা ছোট্ট রুম। জানালা নেই। সামনের দিকে একটা বড় লোহার দরজা। শ্বাস- প্রশ্বাস নিতেও কষ্ট হয় সেখানে।

সেই ঘরের ভিতর দেখলাম এক পাশে কম্বল পাতা। ভাবলাম আমার মতই কোন দালালের শোয়ার জায়গা হবে। ঘরের অন্য পাশে আমার বিছানা করার চিন্তা করছি। এমন সময় এক তরুণ এসে আমাকে বলল আমি সবকিছু করে দিচ্ছি। কিচ্ছু ভাববেন না। তারপর সে আমাকে আর কিছু ভাববার সুযোগ না দিয়ে সুন্দর পরিপাটি করে বিছানা তৈরী করে দিল। তরুণটির এ অযাচিত বদান্যতা দেখে অবাক হলাম। তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই সে আমাকে বলল আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। দেশের জন্য কি না করেছি। অথচ ইন্ডিয়ান আর্মি

আমাদের জেলে ঢুকিয়ে দিল। আমি তখন বুঝলাম এরা দেশ স্বাধীনের দোহাই দিয়ে এমন লুটপাট শুরু করেছিল যে, ইন্ডিয়ান আর্মি পর্যন্ত বাধ্য হয়ে শান্তি-শৃঙ্খলার স্বার্থে এদের জেলে ঢুকিয়েছে। আজ আমার জেলে আসতে দেরী হয়েছিল এদের জন্যই। এসপি সাহেব এদের গন্ডগোলের কথাই বলেছিলেন। জেলে ঢুকেও এরা পুলিশের সাথে গন্ডগোল করছিল। দেশ স্বাধীন করেছে তারা। আর তাদেরই জেলে ঢুকানো হয়েছে। এত বড় স্পর্ধা। পুলিশ গন্ডগোল থামানোর জন্য গুলিও চালিয়েছিল।

তরুণটির বদান্যতার কারণ কিছুক্ষণ পর পরিষ্কার হল। সে আমাকে বলল আমি খালি হাতে জেলে এসেছি। আমাকে আপনার একটা লুঙ্গি দিন। তার কাতর মিনতি দেখে আমি তখন নিজের জন্য আনা একটা লুঙ্গি তাকে দেই। ঘরের মধ্যে পাতা বিছানায় কেবল বসেছি এমন সময় দেখি আমার খুবই ঘনিষ্ঠ ফরিদপুরের ফায়েকুজ্জামান খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছেন। এতক্ষণে বুঝলাম ঘরের অন্য বিছানাটা তাঁরই।

তিনি আমাকে দেখে আবেগে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, কি খবর, ইব্রাহিম? বাইরের অবস্থা কি? আমাকে তো এক কাপড়ে ধরে এনে জেলে পুরেছে। কিছুই বুঝতে পারছি না। ফায়েকুজ্জামানকে দেখে আমার গলার স্বর ধরে এল। আমি কালই মাত্র শুনেছি তাঁর ছেলে নুরুজ্জামানকে ফরিদপুরের জালালুদ্দীন নামের এক কুখ্যাত ব্যক্তি ধরে নিয়ে মিরপুর ব্রীজের উপর গুলি করে মেরে ফেলেছে। দেখে মনে হল ফায়েকুজ্জামানের কাছে সে খবর এখনও পৌঁছেনি। ফায়েকুজ্জামান ছিলেন আইয়ুব খানের এককালীন বাণিজ্যমন্ত্রী ওয়াহিদুজ্জামানের ছোট ভাই। তিনি নিজেও ফরিদপুর থেকে মুসলিম লীগের এমএনএ হয়েছিলেন।

তাঁর চেহারা দেখে খুব খারাপ লাগল। কিন্তু তাঁর ছেলের ব্যাপারে তাঁকে আমি কিছু বলিনি। একদিকে আমার ঘরের সামনে দৃশ্যমান ফাঁসির মঞ্চ অন্যদিকে পুত্রহারা পিতার এই মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যে আমি কি করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। একেই বলে নিয়তি।

ফায়েকুজ্জামান যতদিন জেলে ছিলেন তাঁর পরিবারের কেউ তাঁকে ছেলের মৃত্যুর সংবাদ দেয়নি। পাছে তিনি জেলের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন এই আশঙ্কায়। তাঁর ছেলে নুরুজ্জামানকে আমি চিনতাম। সুদর্শন চেহারার তরুণ। ঢাকা ইউনিভার্সিটির মেধাবী ছাত্র। ছেলেটি এম.এ. পাশ করে অন্য পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ইউনিভার্সিটিতে সে এনএসএফ করত। ১৯৬৯- এর দিকে যখন ইউনিভার্সিটিতে আইউব বিরোধী ছাত্ররা ১১দফার আন্দোলন গড়ে তুলে তখন সে

একবার এনএসএফ- এর ইব্রাহিম খলিলের সাথে সবুর সাহেবের বাসায় আসে। আমার সাথে সে সময় তার পরিচয় হয়। সে সময় সে উপস্থিত কিছু ছাত্রের উদ্দেশ্যে বক্তৃতাও দিয়েছিল মনে পড়ছে। তার কথা বলার ভঙ্গি, প্রাঞ্জল উচ্চারণ আমাদের দারুণভাবে মুগ্ধ করে। ঐ বক্তৃতায় সে জোরের সাথে বলেছিল আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। এ আন্দোলনের আড়ালে পাকিস্তানের শত্রুরা মূলতঃ শক্তি সঞ্চয়ে ব্যস্ত। যাতে সময় মত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মরণ আঘাত হানা যায়।

ফায়েকুজ্জামানকে দেখে আমার এতদিনের পুরানো সব কথা মনে পড়ে গেল।

নুরুজ্জামানের হত্যাকারী জালালুদ্দীনকে পরে শেখ মুজিব মন্ত্রীত্ব দিয়ে পুরস্কৃত করেন।

ফায়েকুজ্জামান জেল থেকে বের হয়ে নুরুজ্জামানের মৃত্যুর কথা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেননি। পরে তিনি শেখ মুজিবের কাছে ছেলের জন্য কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল মুজিব বোধ হয় নুরুজ্জামানকে ভারতে লুকিয়ে রেখেছে।

মুজিব ফায়েকুজ্জামানকে দুলাভাই বলে ডাকত। তিনি তো সবকিছু জানতেন। তবু তিনি ফায়েকুজ্জামানকে বুঝানোর জন্য বলেছিলেন, দুলাভাই আপনি বাসায় যান। আপনার ছেলেকে আমি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি।

জেলের সেই প্রথম রাত আমার কাটল ফায়েকুজ্জামানের সাথে নানা আলাপ, চিন্তা আর উদ্বেগ আশঙ্কার মধ্যে। ভোরে উঠে আমি পরিচিত হলাম জেলের নতুন নতুন অনেক কিছুর সাথে। জেলের খাত বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। এর মানে হল প্রতিদিন সকালে নতুন কয়েদী হিসেবে যারা আসে তাদের উচ্চস্বরে ডাকা হয় এবং তাদের নতুন থাকার জায়গা বলে দেয়া হয়। জেলের কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে সিপাই ও সুবেদাররা এসব কাজ সাধারণত করে থাকে।

খাতায় আমার নাম ডাকার পর আমার থাকার জন্য 'পুরানো হাজতকে' বরাদ্দ করা হল। পুরানো হাজত হল একটা বিরাট হল ঘর। এ হলঘরের মধ্যেই কয়েদীরা থাকত। 'পুরানো হাজত' নামকরণের কারণ হল জেলের মধ্যে এটাই ছিল সবচেয়ে পুরানো বিল্ডিং। জেলের সিপাইকে বলা হয় মিয়া সাহেব। এরকম একজন মিয়া সাহেব আমাকে ফাঁসির সেল থেকে পুরানো হাজতে নিয়ে এল।

পুরানো হাজতে এসে দেখি এলাহী কারবার। সব পাকিস্তানপন্থীরা এখানে আলো করে বসে আছেন। আমাকে দেখে তাঁদের আনন্দ আর ধরে না। আরও

দেখলাম মোনেম খানের কলেজ পড়ুয়া দুটো ছেলেকেও এখানে এনে রাখা হয়েছে। এরা রাজনীতির কি বুঝত আমি জানি না। মোনেম খান তাদের পিতা- বোধ হয় এটাই ছিল তাদের অপরাধ। পুরানো হাজতে বিখ্যাত আলেম মাওলানা মাসুমকেও দেখলাম। তিনি কোন রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন বলে কখনও শুনিনি। কিন্তু ১৬ই ডিসেম্বরের পর ইসলামপন্থী হওয়াটাই ছিল একটা অপরাধ। সে কারণে তাঁকে জেলে ঢুকানো হয়েছিল। মাওলানা মাসুম জেলখানায় আমাদের নামাজে কয়েকদিন ইমামতি করেছিলেন। তিনি জেলে ঢুকেই বলেছিলেন, আওয়ামী লীগের লোকেরা আমাকে ৯দিনের বেশী আটক করে রাখতে পারবে না। সত্যি তিনি ৯দিনের আগেই জেল থেকে মুক্তি পান। এর ফলে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয় তিনি প্রকৃতই বড় বুজর্গ ছিলেন। তিনি আমাদের বলতেন, পাকিস্তান সারা ভারতের মুসলমানরা বানিয়েছিল। আল্লাহর কাছে মুসলমানরা অনেক কান্নাকাটি করেছিল- একদিন এই পাকিস্তান বানাবার জন্য। সেই পাকিস্তানের যারা ক্ষতি করেছে আল্লাহ তাদের উচিত শিক্ষা দেবেন। আল্লাহর আদালতে একদিন এদের বিচার হবেই। নামাজ শেষে মাসুম সাহেব আমাদের ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দিতেন। তিনি আমাদের বলতেন, আল্লাহর রাহে যারা সংগ্রাম করে তাদের উপর এরকম বালা- মুসিবত আসে। এগুলো ঈমানদারদের উপর আল্লাহর পরীক্ষা, এ পরীক্ষায় ঈমানদারদের বিজয়ী হতে হবে। প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পর আমরা জিকির করতাম। মাসুম সাহেব জিকিরের মাহফিল পরিচালনা করতেন। তখন আমার কাছে পুরো জেলখানাকে মনে হত দরবেশের হুজরা খানা। মাসুম সাহেব জোরের সাথে বলতেন আমাদের কাউকে ওরা আটকে রাখতে পারবে না। পুরানো হাজতে আমি বেশীদিন থাকতে পারিনি। দুদিন থাকার পর জেল কর্তৃপক্ষ আমাকে ডিভিশন বরাদ্দ করে। তখনকার স্বরাষ্ট সচিব শামসুদ্দীন আহমদ ছিলেন আমার আত্মীয়। মূলত তাঁর প্রভাবের কারণেই আমি ডিভিশন পাই। জেলের এক সুবেদার আমাকে 'পুরানো হাজত' থেকে নিয়ে বিশ সেলে ডিভিশন বন্দীদের ভিতর পৌঁছে দেয়। বিশ সেল বলা হত এজন্য যে একতলা এ বিল্ডিংটিতে বিশটি কামরা ছিল। আসলে এটা ছিল নামেই ডিভিশন। পাকিস্তান আমলে এখানে রাখা হত দাগী আসামীদের। নতুন সরকার এসে এটিকে ডিভিশন প্রাপ্তদের আশ্রয়স্থল বানিয়েছিল। পাকিস্তান আমলে ২৬ সেল নির্মাণ করা হয়েছিল রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য। রাজনৈতিক বন্দীদের মর্যাদা অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা দেয়া হত। শেখ মুজিব এখানে বহুদিন কাটিয়েছেন। নতুন সরকার ২৬ সেল কোন রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য বরাদ্দ করেনি। এটা তারা স্বতন্ত্রভাবে সংরক্ষণ করেছিল

এই আশায় এখানে নাকি জে. নিয়াজী ও তাঁর সহযোগীদের বিচার করা হবে। ২০ সেলে প্রত্যেক চার রুমের পর দেয়াল তুলে পৃথক করে দেয়া হয়েছিল। আমাকে যখন বিশ সেলে নেয়া হয় তখন দেখি ফজলুল কাদের চৌধুরীকেও সেখানে রাখা হয়েছে। ফজলুল কাদের চৌধুরী দেখামাত্রই আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, ইব্রাহিম তোমাকেও এরা নিয়ে এসেছে। আমি বললাম, আমি দিন তিনেক হল জেলে এসেছি। আপনি কবে? ফজলুল কাদের চৌধুরী তাঁর জেলে আসার যে বর্ণনা দিলেন তা শুনে আমার মনে হল এটা রোমাঞ্চকর উপন্যাসকেও হার মানায়।

তাঁর কাছ থেকে শোনা সেই অবিশ্বাস্য অথচ সত্য ঘটনাটি ছিল এরকম: ১৪ই ডিসেম্বর সবকিছু আঁচ করে তিনি পাকিস্তান নেভীর একটা শিপে করে পরিবার পরিজনসহ চাটগাঁ থেকে বার্মার উদ্দেশ্যে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নেভাল শিপটি ভাটার সময় চড়ায় আটকে যায়। তখন আশেপাশের গ্রাম থেকে নৌকায় করে লোকজন এসে জাহাজটি ঘিরে ফেলে। এরমধ্যে গেরিলাও ছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার হল ফজলুল কাদের চৌধুরী যখন জাহাজ থেকে বেরিয়ে আসলেন তখন পরিবেশ সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। চারদিকের লোকজন তাঁকে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানায়। তারা তাঁকে তাঁর পরিবার পরিজনসহ তাঁদের গ্রামে নিয়ে যায় এবং গরু জবাই করে এ উপলক্ষে ভোজের আয়োজন করে। ফজলুল কাদের চৌধুরীর জাহাজ আটকে যাওয়া এবং তাঁকে গ্রামে নিয়ে গিয়ে জনসাধারণের উল্লাস করার ঘটনা ইন্ডিয়ান আর্মির কানে যায়। তারা গেরিলাদের সহযোগিতায় দ্রুত গ্রামটি ঘিরে ফেলে। এ রকম অবস্থায় তারাও যে কি করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। ইন্ডিয়ান আর্মি তখন দিল্লীতে তাদের সদর দফতরের সাথে যোগাযোগ করে। দিল্লী থেকে ইন্ডিয়ান আর্মিকে নির্দেশ দেয়া হয় তারা যেন কোনভাবেই ফজলুল কাদের চৌধুরীর সাথে দুর্ব্যবহার না করে এবং অতি সত্বর তাঁকে ঢাকায় জেলে পৌঁছে দেয়। ইন্ডিয়ান আর্মির প্রহরায় ফজলুল কাদের চৌধুরী চাটগাঁ থেকে ঢাকা জেলে পৌঁছেন। তাঁর পরিবার পরিজনকে ঐ গ্রামবাসীরা আঁচড় পর্যন্ত লাগাতে দেয়নি। ফজলুল কাদের চৌধুরী যে জনপ্রিয় নেতা ছিলেন এবং তাঁর চমৎকার ব্যক্তিত্বের প্রতি দেশের মানুষ যে বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করত এ ঘটনা তার প্রমাণ। আমার মনে আছে, ৫৪ সালের নির্বাচনে যখন যুক্তফ্রন্টের সামনে মুসলিম লীগের করুণ অবস্থা তখনও তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করে জিতে এসেছিলেন। নির্বাচনে জিতে অবশ্য তিনি মুসলিম লীগেই যোগ দেন। আগে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড তাঁকে নমিনেশন দেয়নি। চাটগাঁর ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি লোকজনকে দারুণভাবে

মাতিয়ে ফেলতে পারতেন। চাটগাঁর উন্নতির জন্য ফজলুল কাদের চৌধুরী অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। ইউনিভার্সিটি, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, রিফাইনারী এগুলো তাঁর একক প্রচেষ্টার ফল। স্পীকার এবং কিছুদিনের জন্য পাকিস্তানের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে এসব প্রতিষ্ঠান তিনি গড়ে তুলেছিলেন। ডিভিশনে আসার দুদিন পর আমার একটা নতুন কাজ জুটে যায়। জেল জীবনে হঠাৎ হঠাৎ এসব বৈচিত্র্য মন্দ লাগে না। আমরা ডিভিশন পেয়েছিলাম প্রায় পঞ্চাশ জন। এঁদের মধ্যে একজন ম্যানেজার থাকতেন। জেল কর্তৃপক্ষের অনুমোদনেই এটা হত। ম্যানেজারের কাজ ছিল প্রতিদিন সকালে ডিভিশন বন্দীদের খাবার সামগ্রী অর্থাৎ প্রতিদিনের চাল, ডাল, তেল, গোশত, মাছ বুঝে নেয়া এবং রান্নার যাবতীয় ব্যবস্থা করা। জেলখানায় রান্নাঘরকে বলে চোখা। চোখায় বাবুর্চিদেরও তত্ত্বাবধান করেন ম্যানেজার। আমি আসার পর ডিভিশনের বন্দীরা আমাকে ম্যানেজার বানানোর জন্য জেলার নির্মল বাবুকে অনুরোধ করেন। ডিভিশনের বন্ধুরা কেন আমাকে ম্যানেজার হিসেবে পেতে চেয়েছিলেন তা ভাবলে আজও আমি অবাক হয়ে যাই। রাজনৈতিক জীবনে তাঁরা যেমন আমার উপর আস্থা রাখতে পারতেন বোধ হয় জেল জীবনে এসেও তাঁদের সেই আস্থার অভাব হয়নি।

নির্মল বাবু যখন আমাকে ম্যানেজারের দায়িত্ব নেয়ার কথা বললেন তখন আমি সানন্দে রাজী হয়ে যাই। আমার আগে ম্যানেজার ছিলেন মেজর আফসারউদ্দীন। তিনি ছিলেন ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টির সভাপতি। তাঁর সেক্রেটারী ছিলেন মাওলানা মান্নান। প্রতিদিন সকালে আমি জেল গেট থেকে আমাদের মাথাপিছু বরাদ্দের সামগ্রী বুঝে নিতাম। আমাকে সাহায্য করত বাবুর্চিরা। আমি ম্যানেজার হবার পর চোখার বাবুর্চি পাল্টে দেই। তখন জেলে কিছু অবাঙ্গালী বাবুর্চি ধরে আনা হয়েছিল। এসব বাবুর্চির অপরাধ ছিল এরা অবাঙ্গালী ও পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী। বাবুর্চিদের অধিকাংশই ছিল আমার পরিচিত। ঢাকার সেরা বাবুর্চি হিসেবে এদের নাম ডাক ছিল। এদের অনেককে আমি চোখার দায়িত্ব দেই। অবাঙ্গালী বাবুর্চিদের রান্নার গুণে আমাদের খাবার বেশ উপাদেয় হয়ে উঠল।

ম্যানেজার হিসেবে আরও একটা দায়িত্ব ছিল আমার। ডিভিশনে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে তাড়াতাড়ি জেলের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হত। আমার একটা সুবিধা ছিল তখন ঢাকার সিভিল সার্জন ছিলেন সিরাজ উদ্দিন। মালদা জেলা স্কুলে তিনি আমার ক্লাসমেট ছিলেন। সিরাজ উদ্দিন জেলের ডাক্তারদের ভাল করে বলে রেখেছিলেন যেন তাঁরা আমার দেখাশুনা করেন। ডাক্তাররা বোধ

হয় সে কারণেই আমাকে খুব সমীহ করতেন। কোন রোগী নিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি দেখে দিতেন। বিশেষ করে আমার অনুরোধে অনেক সময় ডাক্তাররা মেডিকেল ডায়েট বরাদ্দ দেয়ার জন্য লিখে দিতেন। মেডিকেল ডায়েটের ব্যাপারটা ছিল জেলের খাবার খেতে খেতে অনেকেরই অনীহা ধরে যেত। তাছাড়া জেলের বন্দীদশার কারণেও অনেকের খাবারের প্রতি অরুচি হত। ডাক্তাররা ইচ্ছে করলে তখন কয়েদীর মনের মত একটা ডায়েট লিখে দিতে পারতেন। এর মধ্যে হয়ত বিশেষ ধরনের মাছ যেমন কৈ, মাগুর কিংবা বিশেষ ধরনের সব্জির উল্লেখ থাকত।

অনেক সময় ডাক্তাররা অসুখের কারণে সামনের লনে ঘোরার অনুমতি দেয়ার জন্য জেল কর্তৃপক্ষকে লিখতেন। আমার অনুরোধে একবার তাঁরা ফজলুল কাদের চৌধুরী ও খাজা খয়েরুদ্দীনকে জেলের লনে ঘোরার অনুমতি দেয়ার কথা লিখেছিলেন।

ম্যানেজার হওয়ার সুবাদে আমার একটা সুবিধা ছিল আমি ডিভিশনের প্রত্যেক বন্দীসেলে ইচ্ছেমত যেতে পারতাম। তাদের সুখ দুঃখের আলাপের ভাগী হতে পারতাম। কখন কার কি প্রয়োজন সেটা তাৎক্ষণিকভাবে শুনে সমাধানেরও চেষ্টা করতাম। একবার একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। বাংলাদেশে উদযাপিত প্রথম বিজয় দিবসে কারা কর্তৃপক্ষ বন্দীদের জন্য উন্নতমানের খাবার সরবরাহ করে। আমি মুরগীসহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী চোখার এক কোণায় ফেলে রাখি এবং বাবুর্চিদের বলি প্রতিদিনের মত সাধারণ খাবার রান্না করতে। জেলার নির্মল বাবু কি করে যেন ব্যাপারটা টের পেয়ে যান। তিনি এসে আমাকে প্রায় কৈফিয়তের সুরে বলতে থাকেন, ইবাহিম সাহেব এসব কি হচ্ছে? মুরগী রান্না করেন নি, বিরিয়ানি পাকাননি, আজকে দেশের এতবড় একটা উৎসব আর আপনারা নিরামিষভোজী হয়ে আছেন। আমি হাসতে হাসতে বললাম, জেলার সাহেব, আপনি আমাদের খোঁজ- খবর নিতে এসেছেন, ধন্যবাদ। কিন্তু এ বিজয় তো আমাদের বিজয় নয়। আমরা আজকে বিরিয়ানি খাব না। আমরা উপোস করব। যেদিন এদেশের মানুষের সত্যিকারের বিজয় আসবে সেদিন আমরা ভরপেট বিরিয়ানি খাব, আজকে নয়।

নির্মল বাবু আমার কথা শুনে তো অবাক। তিনিও হাসতে হাসতে বললেন, খুব রাজনীতি করে বেড়াচ্ছেন ইব্রাহিম সাহেব।

আমি তাঁকে বললাম, রাজনীতি নয় এটা আমাদের আদর্শ, জেলার সাহেব।

নির্মল বাবু তখনকার মত কিছু না বলে চলে গেলেন। তবে আমি যে ১৬ই ডিসেম্বর বিরিয়ানী পাকানোর ব্যবস্থা করিনি এজন্য আমার ডিভিশনের বন্ধুদের মুখে কোন অভিযোগ শুনিনি। বোধ হয় তাঁরা মনে মনে খুশী হয়েছিলেন।

একদিন জেলার অবাঙ্গালীদের এক সুবেদার এসে আমাকে খবর দিলেন গুদামে অনেক পাক বাসমতি চাল আছে। এই চাল আর কখনও পাকিস্তান থেকে আসবে না। আপনি যদি জেলারকে বলে কয়েক বস্তা চাল জোগাড় করতে পারেন তাহলে সবাইকে বিরিয়ানি খাওয়াতে পারবেন।

সুবেদারের আইডিয়াটা আমার কাছে বেশ আকর্ষণীয় মনে হল। আমি নির্মল বাবুকে বললে তিনি রাজী হয়ে গেলেন। গুদামে প্রায় সাত আট বস্তা বাসমতি চাল ছিল, তিনি সবটাই আমাদের দিয়ে দেন।

এত অনায়াসে বাসমতি চাল পেয়ে যাব তা আমি ভাবিনি। নির্মল বাবু আমাদের মনে মনে পছন্দ করতেন না ঠিকই কিন্তু এটা তিনি বুঝতেন আজ যারা এখানে বন্দী আছেন তাঁরা একসময় দেশের দণ্ডমুন্ডের কর্তা ছিলেন। ভবিষ্যতেও যে চাকা উল্টে যাবে না, এঁরাই আবার যে মসনদে বসবেন না তারই বা নিশ্চয়তা কি? বোধ হয় এসব চিন্তা করেই নির্মল বাবু আমাকে চাল দিতে দ্বিরুক্তি করেননি।

জেলের মধ্যে একটা নিয়ম হল প্রত্যেক কয়েদীর জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ দেয়া। ডিভিশন বন্দীদের খাবার- দাবারের সুবিধাটা আরও বেশী। কিন্তু এসব খাবার কখনও কয়েদীরা ঠিকমত পায় না। দুর্নীতিবাজ পুলিশ ও জেলের কর্মচারীরা এসবের মধ্যে অবৈধ ভাগ বসায়। যার ফলে কয়েদীদের ভাগ্যে জোটে খুব সামান্যই।

আমরা যারা ডিভিশন পেয়েছিলাম তাঁদের খাবার ব্যবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল। কিন্তু অসংখ্য ইসলামপন্থী ও পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী কয়েদী যারা ডিভিশন পাননি তাঁদের খাওয়ার দুঃখজনক অবস্থা দেখলে চোখে পানি এসে যেত। এসব কয়েদীদের প্রত্যেকেরই একটা সামাজিক সম্মান ও মর্যাদা ছিল। আজ তকদীরের ফেরে সামান্য পুলিশ ও ওয়ার্ডারদের চোখ রাঙ্গানীও দেখতে হচ্ছে তাঁদের বেদনাটা সেখানেই।

জেলের মধ্যে এতদিন কয়েদীদের নিয়ে জামাতে জুমার নামাজ পড়ার একটা রীতি চলে আসছিল। বাংলাদেশ হওয়ার পর নির্মল বাবুর নির্দেশে জুমার নামাজ পড়া বন্ধ হয়ে যায়। আমার মনে হয় আওয়ামী লীগ সরকারের কোন হোমড়া- চোমড়ার নির্দেশেই এটা করা হয়েছিল। তা না হলে নির্মল বাবুর অন্তত জামাতে নামাজ পড়া বন্ধ করার দুঃসাহস হত না।

আমাদের ব্লকে আমার সাথে ফজলুল কাদের চৌধুরী ছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক ডেপুটি স্পীকার সাভারের এডভোকেট আজগর হোসেন ও মালেক মন্ত্রীসভার সদস্য কুমিল্লার এডভোকেট মুজিবর রহমান ছিলেন।

মুজিবর রহমান ছিলেন খুব ধীরস্থির। তাঁর সাথে কথা বললেই বোঝা যেত ইসলামের উপর তাঁর ব্যাপক পড়াশুনা রয়েছে। বিশ সেলে আমাদের পরের ব্লকেই থাকতেন সবুর সাহেব, খাজা খয়েরুদ্দীন, পাবনার এম এ মতিন, পাকিস্তান ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলির সাবেক ডেপুটি স্পীকার এ টি এম আব্দুল মতিন প্রমুখ।

সেল বলতে আমাদের ডিভিশনের বন্দীদের যা বরাদ্দ করা হয়েছিল তা ছিল একট ছোট্ট জানালাবিহীন ঘর। সেই ঘরে কোনক্রমে একটা খাট পাতা হয়েছিল। একটা টেবিলও দেয়া হয়েছিল। আমার কাছে এটা জেল কর্তৃপক্ষের একটা মস্করা বলে মনে হত।

রাতে দুই ঘরের মাঝামাঝি দেয়ালের উপর একটা ফাঁকা জায়গায় বাল্ব জ্বলত। এটা দু'ঘরকেই আলোকিত করার চেষ্টা করত। রাতে ঘরের মধ্যে একটা পাত্র দিয়ে রাখা হত। ঐ পাত্রেই আমাদের যাবতীয় প্রাকৃতিক কর্ম সারতে হত। জেলের মধ্যে আমার সবচেয়ে খারাপ লাগত ল্যাট্রিনের অবস্থা দেখে।

ডিভিশনের বন্দীদের জন্য এক একজন ফালতু দেয়া হত। এরা ছিল নিম্ন শ্রেণীর গরীব কয়েদী। এরা ডিভিশনের বন্দীদের ফায়ফরমাশ খেটে দিত, চোখা থেকে খাবার নিয়ে আসত। গোসলের জন্য পানি আনাও ফালতুর কাজ ছিল।

আমাদের ব্লকের গোসলখানায় একটা পানির চৌবাচ্চা ছিল। ফালতু পানি এনে চৌবাচ্চা ভরে দিয়ে গেলে আমরা গোসল করতাম। সমস্যা হল ফজলুল কাদের চৌধুরীকে নিয়ে, তাঁর তো ছিল বিরাট বপু। এতটুকু পানিতে তাঁর গোসল হত না।

তিনি আমাকে বলতেন, ইব্রাহিম যেদিন আমি গোসল করব তোমরা দয়া করে সেদিন গোসল করো না। আমরা ফজলুল কাদের চৌধুরীর জন্য অনেকদিন গোসল না করে কাটিয়েছি।

ফজলুল কাদের চৌধুরীর ছিল সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস। অনেকদিন রাতে তিনি চিৎকার করে বলতেন ইব্রাহিম একটা সিগারেট দাও। খুব খারাপ লাগছে, ঘুমাতে পারছি না। আমার পাশের সেলটাই ছিল তাঁর। আমি তখন দেয়ালের উপর ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে সিগারেট ছুঁড়ে দিতাম। সেই সিগারেট টেনে তিনি ঘুমাতেন। অনেক সময় রাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে যেত। ঘুম থেকে চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে শুনি চৌধুরী সাহেব তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে আল্লাহর

কাছে কান্নাকাটি করছেন। আমি স্পষ্ট শুনতাম তিনি মুনাজাত করতে করতে বলতেন, খোদা আমরা কি অপরাধ করেছি.... এই জালেমদের কবল থেকে দেশের অসহায় মানুষকে তুমি রক্ষা করো। তুমি আমাদের সবর করার তৌফিক দাও। হে আল্লাহ, আমরা যেন ঈমানের সাথে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারি ইত্যাদি। ফজলুল কাদের চৌধুরী তো গম গম করে কথা বলতেন। মনে হত লাউড স্পীকারে কেউ কথা বলছেন। দোয়ার সময় তাই সব শোনা যেত।

ফজলুল কাদের চৌধুরী একবার জেলের মধ্যে এক মিয়া সাহেবকে ধরে আচ্ছা করে কিলঘুষি মেরেছিলেন। জেলের মধ্যে মানুষের মানষিক অবস্থা যে কতখানি বিকারগ্রস্থ হয়ে পড়ে তা না দেখলে বোঝা যায় না। একদিন হল কি ফজরের সময় চৌধুরী সাহেবের প্রাকৃতিক কাজ করার খুব প্রয়োজন পড়ল। তিনি এত উঁচু লম্বা ছিলেন যে ঘরের মধ্যে রাখা পাত্রের উপর বসে প্রাকৃতিক কাজ সারতে পারতেন না। আবার এদিকে সেলের দরজাও তালা মারা, সকাল ৭টার আগে খুলবে না। তিনি আমাকে বললেন, ইব্রাহিম তুমি মিয়া সাহেবকে বল দরজাটা খুলে দিতে। আমি বললাম কাদের ভাই ৭টার আগে তো দরজা খোলার নিয়ম নেই। ও কি খুলবে! তিনি আমাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকায় আমি চেঁচামেচি করে মিয়া সাহেবকে অনেক বুঝিয়ে দরজা খুলতে রাজী করালাম।

চৌধুরী সাহেব তাড়াতাড়ি করে ল্যাট্রিনে গেলেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পর মিয়া সাহেব হয়ত একটু জোরের সাথেই তাঁকে বলেছিল তাড়াতাড়ি করে সেলের মধ্যে ঢোকার জন্য। তালা লাগাতে হবে নইলে কর্তৃপক্ষ তাকে কৈফিয়ত তলব করবে। আর যায় কোথায় চৌধুরী সাহেব তাঁর বিরাট বপু নিয়ে মিয়া সাহেবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ইচ্ছামত কিল ঘুষি মেরে সেই শ্মশ্রুমন্ডিত মাঝারী বয়সী মিয়া সাহেবকে নাজেহাল করে ফেললেন। মার খেয়ে সে অনেকক্ষণ মেঝের উপর পড়েছিল। আমি সেলের ভিতর বসে সব শুনছি। মিয়া সাহেব কিছুক্ষণ মেঝেতে পড়ে থাকার পর জেল অফিসের দিকে চলে গেল। ততক্ষণে সেলের তালা খুলে দেয়া হয়েছে। আমি, চৌধুরী সাহেব, আজগর হোসেন ও মুজিবর রহমান একসাথে বসে আছি।

হঠাৎ দেখি নির্মল বাবু তাঁর দলবলসহ আমাদের ব্লকের দিকে এগিয়ে আসছেন। নির্মল বাবু প্রায় চিৎকার করে বললেন জেলের তো একটা কোড আছে। চৌধুরী সাহেব আপনি এসব কিছুই মানতে চান না। আগেও আপনি এক সিপাইকে মেরেছেন।

দেখলাম চৌধুরী সাহেব যে চেয়ারে বসেছিলেন সেটা নিয়েই তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি চিৎকার করে নির্মল বাবুকে বলতে লাগলেন গুলি করতে হলে গুলি চালাও। ফাঁসি দিতে হলে ফাঁসি দাও। এরকম করে খালি খালি আমাদের কষ্ট দিচ্ছ কেন? বলতে বলতে চৌধুরী সাহেব অচেতন হয়ে পড়লেন। আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম। নির্মল বাবু এসব দেখে হতচকিত হয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন। পাশের ব্লক থেকে সবুর সাহেব, খাজা খয়েরউদ্দীন ছুটে এলেন। আমরা চৌধুরী সাহেবকে ধরাধরি করে খাটের উপর শুইয়ে দিলাম। আমি গামছা ভিজিয়ে তাঁর কপালে ঠান্ডা পানির ছিটা দিলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি চোখ মেললেন।

অনেকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তিনি আমাকে বললেন, ইব্রাহিম আমার কি হয়েছিল?

আমি বললাম কিছুই মনে নেই আপনার? এত কান্ড হয়ে গেল আপনাকে নিয়ে। আপনি মিয়া সাহেবকে ধরে উত্তম মধ্যম দিলেন। জেলারকে গালাগালি করলেন।

চৌধুরী সাহেব তখন বললেন, দেখ ইব্রাহিম আমার আজকাল কি হচ্ছে! মাথা ঠিক রাখতে পারছি না। তুমি মিয়া সাহেবকে ডাকো। ওকি এখানে আছে?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ও কি এখন আসবে নাকি? তিনি বললেন তুমি বলেই দেখ না। আমি মিয়া সাহেবকে অনেক বুঝিয়ে বললাম, দেখো এত বড়লোক, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তিনি আজ জেলে, কতক্ষণ মাথা ঠিক থাকে বল? উনি তোমাকে ডাকছেন, না করো না।

মিয়া সাহেব আমার কথায় রাজী হয়ে চৌধুরী সাহেবের ঘরে দেখা করতে এল। চৌধুরী সাহেব তখন তাঁকে বুকে নিয়ে বললেন দেখ আমার ভুল হয়ে গেছে। তুমি আমাকে মাফ করে দাও। তিনি মিয়া সাহেবের কাছে আবেগ তাড়িত কণ্ঠে বলতে থাকলেন, আমাকে সত্যি মাফ করেছ তো?

চৌধুরী সাহেবের এই শিশুর মত আচরণ দেখে আমি নিজেও হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। মিয়া সাহেবের মুখে কোন কথাই ছিল না। সে পাকিস্তানের এক সময় সর্বোচ্চ পদাধিকারীর এই আচরণে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। চৌধুরী সাহেব আমাকে বললেন, দেখ ইব্রাহিম আমার ঝুড়িতে কিছু ফ্রুটস আছে। এগুলো মিয়া সাহেবকে দিয়ে দাও।

আমি যখন ফলগুলো নিয়ে মিয়া সাহেবকে দিচ্ছিলাম তখন তার চোখ দিয়ে দর দর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। ফজলুল কাদের চৌধুরী ছিলেন নরম

দিলের মানুষ। অনেকদিন দেখেছি বাসা থেকে তাঁর জন্য ভাল ভাল খাবার এলে তিনি শুধু আমাদের ডেকে নিয়ে খেতেন না অনেকটাই ফালতুদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। একদিন তিনি আমাকে বললেন, ইব্রাহিম টাকা পয়সা দিয়ে কি হবে। ফালতুদের অবস্থাতো দেখছ ওদের গেঞ্জি ও লুঙ্গির ব্যবস্থা করে দেয়া উচিত।

তখন তিনি আমাকে তাঁর বোনের জামাই ডিআইজি পুলিশ আব্দুল হকের কাছে একটা চিঠি লিখতে বললেন, কিছু গেঞ্জি ও লুঙ্গি জেলে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। চৌধুরী সাহেবের যাবতীয় চিঠিপত্র আমি জেলে বসে লিখে দিতাম। পরদিন দেখি আব্দুল হক এক গাট্টি লুঙ্গি ও গেঞ্জি পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেগুলো আমি আর চৌধুরী সাহেব মিলে ফালতুদের মধ্যে বিতরণ করেছিলাম।

১৮

আমরা ডিভিশনের বন্দীরা জেলে পত্রিকা পেতাম। তাই বাইরের খবরাখবর পেতে আমাদের তেমন অসুবিধা হত না। তাছাড়া আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কখনও আমাদের সাথে দেখা করতে এলে তারাও অনেক খবর দিয়ে যেত। ৭২ সালের প্রথম কয়েক মাস আমাদের কাটল আওয়ামী লীগের নেতাদের মধ্যে এক ধরনের উগ্র বাঙ্গালীত্বের প্রদর্শনী দেখে। তখন সবকিছুতেই বাঙ্গালীত্বের উৎস খোঁজা হত। পূর্ববঙ্গ ও পরে পূর্ব পাকিস্তান যে একটা মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল এবং এখানকার মানুষের জীবনাচারের মধ্যে মুসলিম সংস্কৃতির গভীর প্রতিফলন ছিল তা যেন ইচ্ছে করেই চাপা দেয়া হতে লাগল। মুসলমানদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বর্জন করতে পারলেই এসময় সবচেয়ে প্রগতিশীল ও আধুনিক মানুষ হওয়া যেত। গেরিলারা যারা ভারত থেকে ফিরে এসেছিল তাদের মধ্যেই পূর্ব পুরুষের বিশেষ করে মুসলিম ঐতিহ্যের সাথে জড়িত যা কিছু তার প্রতি এক ধরনের বিতৃষ্ণা দেখা দিল। এদের কেউ কেউ সে সময় নিজেদেরকে সূর্যসেন ও ক্ষুদিরামের বংশধর বলেও দাবী করছিল।

এসব গেরিলারা ত্রিশের দশকে সূর্যসেন ও ক্ষুদিরামের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কাহিনী আদৌ জানত না। সূর্যসেন ও ক্ষুদিরাম যে রাজনীতির অনুশীলন করেছেন এবং যে পৌত্তলিক আদর্শ তাঁরা প্রচার করেছেন তা মেনে নিলে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়ার সুযোগ থাকে? অথচ এসব সাম্প্রদায়িক চেতনায় আচ্ছন্ন ব্যক্তিদের তখন জাতীয় বীর সাজানোর এক প্রহসন চলছিল। জেলের ভিতর বসেই আমরা শুনতে পেলাম সরকার ঢাকা ইউনিভার্সিটির জিন্নাহ হল ও ইকবাল হলের নাম পরিবর্তন করেছে। এরা জিন্নাহ হলের নতুন নামকরণ করেছিল সূর্যসেন হল এবং ইকবাল হলের নামকরণ করেছিল জহুরুল হক হল। জহুরুল হক ছিলেন সেনাবাহিনীর একজন সার্জেন্ট। ২৫শে মার্চের আগেই বিদ্রোহ করতে গিয়ে তিনি আর্মির গুলিতে মারা পড়েন। এর আগে তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্রের সাথেও জড়িত ছিলেন। আরও অবাক হয়েছিলাম আল্লামা ইকবালের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন কবি ও দার্শনিকের সাথেও নতুন সরকার শত্রুতা শুরু করে। ইকবাল যেহেতু উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির কথা বলেছিলেন এবং যে কারণে তাঁকে পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা বলা হয়ে থাকে তাই তাঁর নাম মুজিব সরকার বরদাশ্ত করতে রাজী হয়নি। তাছাড়া ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে সম্পর্কিত যা কিছু তাকেই ঝেঁটিয়ে বিদায় করবার

জন্য মুজিব সরকার তখন আদাপানি খেয়ে লেগেছিল। এরা যে কতদূর ইসলাম বিরোধী হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ হচ্ছে ঢাকা ও রাজশাহী ইউনিভার্সিটির মনোগ্রাম থেকে কোরআন শরীফের আয়াত তুলে দেয়া। ঢাকা ইউনিভার্সিটির সলিমুল্লাহ ও ফজলুল হক মুসলিম হল থেকে এরা মুসলিম শব্দটি উৎখাত করেছিল। জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে মুসলিম শব্দটি তুলে দেয়া হয়েছিল। এ সমস্ত কর্মকান্ডকেই তখন বলা হচ্ছিল অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার চূড়ান্ত নিদর্শন। অথচ দেশের বিভিন্ন স্থানে অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছিল রামকৃষ্ণ মিশন, ভারতেশ্বরী হোমস, সেন্ট জোসেফ, সেন্ট গ্রেগরী স্কুলের মত প্রতিষ্ঠান যাদের ধর্মীয় পরিচয়টাই ছিল মূখ্য। এসব প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলা হল না। এমনকি ঢাকা ইউনিভার্সিটির জগন্নাথ হলের হিন্দু স্ট্যাটাসও অপরিবর্তিত রইল। মুজিব সরকারের একমাত্র মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়াল ইসলাম ও মুসলমান। একদিন শুনতে পেলাম ধর্মনিরপেক্ষতা সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য রেডিওতে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কয়েকদিন পর এ ঘটনার প্রতিবাদে রেডিওর কর্মচারীরা যখন ধর্মঘটের ডাক দেয় তখন তড়িঘড়ি করে সরকার কোরআন তেলাওয়াতের ব্যবস্থা করে। পাশাপাশি অবশ্য গীতা-বাইবেল-ত্রিপিটক থেকে পাঠের ব্যবস্থারও প্রচলন করা হয়। এভাবে মুজিব সরকার ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে একটা আপাত আপোস ফর্মুলা উদ্ভাবন করে।

জেলে বসে এসময় আমরা প্রায়ই আওয়ামী সরকারের কর্তা ব্যক্তিদের তর্জনগর্জন শুনতাম। প্রায়ই এরা হুঙ্কার দিত ত্রিশ লাখ মানুষকে যারা শহীদ করেছে এবং যারা দু'লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম লুটেছে পাক আর্মির সেই সব এদেশীয় দালালদের কাউকে ক্ষমা করা হবে না। তাদের কথায় মনে হত এদেশের যত দুঃখ ও দুর্গতি তার জন্য এইসব দালালরাই শুধু দায়ী।

জেলে বসেই আমি গেরিলাদের হাতে মৌলভী ফরিদ আহমদ, সিলেটের আজমল আলী চৌধুরী ও সিরাজগঞ্জের সৈয়দ আসাদুদ্দৌলা সিরাজীর নির্মম হত্যাকান্ডের খবর পাই। ১৯৭১ এর ১৭ই ডিসেম্বর ফরিদ আহমদকে গ্রেফতার করে লালবাগ থানায় নেয়া হয়। গেরিলারা ১৯শে ডিসেম্বর তাঁকে লালবাগ থানা থেকে ছিনিয়ে ইকবাল হলে নিয়ে যায়। সে সময় ইকবাল হলে ছিল গেরিলাদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। এখানে গেরিলারা পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসীদের ধরে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করে মেরে ফেলত।

আমি যখন জেল থেকে বের হই তখন মৌলভী ফরিদ আহমদের দুঃখজনক পরিণতির কথা জহিরুদ্দীনের মুখে আদ্যোপান্ত শুনেছিলাম। জহিরুদ্দিন ছিলেন এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। গেরিলারা তাঁকেও ধরে নিয়ে ইকবাল হলে রেখেছিল।

মৌলভী ফরিদ আহমদকে ইকবাল হলে ধরে নিয়ে যায় সমাজতন্ত্রের লেবেলধারী কতিপয় কপট ছাত্র নেতা ও তাদের সঙ্গী সাথীরা। তারা প্রথমেই ফরিদ আহমদকে মুক্তি দেয়ার কথা বলে তাঁর ব্যাংকে গচ্ছিত ১২ লাখ টাকা নিজেদের নামে তুলে নেয়। তারপর শুরু হয় তাঁর উপর অকথ্য নির্যাতন। প্রথমে তাঁর চোখ তুলে ফেলা হয়। কান কাটা হয়। হাত ভেঙ্গে দেয়া হয়। সর্বশেষে দীর্ঘ নিপীড়নের পর ২৪শে ডিসেম্বর রাতে হত্যা করা হয়। তার আগে তাঁর জিহ্বা কেটে ফেলা হয়েছিল এবং শরীর থেকে অবশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছিল। নরপশুরা তাঁকে ঐ রাতেই সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের পিছনে একটা ডোবার মধ্যে ফেলে দেয়।

আজমল আলী চৌধুরী ছিলেন সিলেটে মুসলিম লীগের এক শক্ত খুঁটি। আইয়ুবের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় তিনি শিল্প মন্ত্রী ছিলেন। সিলেটে মুসলিম লীগ বলতে একসময় তাঁকেই আমরা বুঝতাম। সিলেট রেফারেন্ডামের সময় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। রেফারেন্ডামের সময় যখন কায়েদে আযম সিলেটে আসেন তখন তিনি আজলম আলী চৌধুরীর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। চৌধুরী সাহেব কায়েদে আযমের এত গুণমুগ্ধ ছিলেন যে কায়েদে আযম যে ঘরে রাত কাটিয়েছিলেন সেই ঘরের প্রত্যেকটি জিনিসপত্র মিউজিয়ামের মত করে সংরক্ষণ করেছিলেন। তাঁর বাসায় যে কেউ গেলে তিনি অত্যন্ত আগ্রহভরে কায়েদে আযমের ব্যবহৃত জিনিসপত্র ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতেন। কায়েদে আযমের সাথে তাঁর বোন ফাতেমা জিন্নাহও এসেছিলেন। চৌধুরী সাহেব ফাতেমা জিন্নাহকে যে ঘরে রেখেছিলেন সেটিও যত্নে সহকারে রক্ষা করেছিলেন।

চৌধুরী সাহেব কখনও ভাবতে পারেননি, যত রাজনৈতিক বিরোধীতাই থাকুক না কেন সিলেটের মানুষ তাঁর গায়ে হাত তুলতে পারে। কিন্তু ইন্ডিয়ার রাজনৈতিক মন্ত্র গেরিলাদের বুদ্ধি ও বিবেচনাকে এতখানি অসুস্থ করে ফেলেছিল যে তাদের কোন কিছুই নৈতিকতা বিরোধী মনে হত না।

চৌধুরী সাহেবের বাসা ছিল সিলেটে শাহজালালের (রঃ) দরগার কাছাকাছি। তিনি প্রতিদিন দরগার মসজিদে ফজরের নামায আদায় করতেন। গেরিলার এটা জানত। বাংলাদেশ হওয়ার দু'দিন পর ১৯শে ডিসেম্বর তিনি

যথারীতি নামায আদায় করে ফেরার পথে ওঁৎ পেতে থাকা গেরিলারা তাঁকে আক্রমণ করে। বুলেটের আঘাতে নিমেষে তাঁর শরীর ঝাঁঝরা হয়ে যায়।

আওয়ামী লীগের সেই উন্মাদনার যুগেও চৌধুরী সাহেবের শাহাদাতের খবর যখন ছড়িয়ে পড়ে হাজার হাজার মানুষ তাঁর বাড়ীর সামনে সমবেত হয়। বলা বাহুল্য তাঁর আততায়ীদের খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সিলেটে মুসলিম লীগের আর একজন নেতা ডা. এম. এ মজিদকেও গেরিলারা নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। তিনি সিলেট জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। বাংলাদেশ হওয়ার পর মজিদ সাহেব নিজের বাসা থেকে সরে গিয়ে তাঁরই এক আত্মীয় কমিউনিষ্ট নেতা পীর হাবিবুর রহমানের বাসায় আশ্রয় নেন। মজিদ সাহেব বিপদের দিনে যাকে আশ্রয়দাতা বিবেচনা করেছিলেন- শোনা যায় সেই পীর সাহেবের ইঙ্গিতেই গেরিলারা তার বাসায় বসেই মজিদ সাহেবকে গুলি করে হত্যা করে। মজিদ সাহেবের ছেলেকেও একই স্থানে মারা হয়েছিল। এ দুটি হত্যাকান্ডই সিলেটের মানুষকে অত্যন্ত মর্মাহক করেছিল। তখন অনেকেই ক্ষোভের সাথে বলতে থাকেন আমরা রেফারেন্ডামের মাধ্যমে পাকিস্তানে এসেছিলাম। যারা আমাদের পূর্ববঙ্গের সাথে অন্তর্ভূক্ত করিয়েছিলেন তাদেরই যদি মেরে ফেলা হয় তবে আমাদের পূর্ববঙ্গের সাথে থেকে লাভ কি। আমাদের আসামে ফিরে যাওয়াই ভাল।

সৈয়দ আসাদুল্লাহ সিরাজীকে গ্রেফতার করে সিরাজগঞ্জ জেলে রাখা হয়েছিল। গেরিলারা হত্যা ও রক্তের জন্য এতখানি মরিয়া হয়ে উঠেছিল যে, পুলিশের নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে ছিনতাই করে নিয়ে যায়। তাঁকে তাঁর সাথে আরও ১৫/১৬ জন পাকিস্তানপন্থীকে গেরিলারা ধরে নিয়ে প্রথমে শারীরিক নির্যাতন করে পরে গুলি করে হত্যা করে। তাদের লাশও ফেরৎ দেয়নি। যমুনার বক্ষে এসব লাশ ছুঁড়ে ফেলে ছিল। পাকিস্তানপন্থীদের হত্যা করার এরকম প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। যে যত বেশী দালাল খুন করতে পারত সেই তত বড় বীর হিসেবে চিহ্নিত হত।

এ সময় গেরিলাদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল বিহারীরা। বিহারী পুরুষদের হত্যা করা। তাদের স্ত্রী ও মেয়েদের লুটের মালের মত যথেচ্ছ ব্যবহার করা এসময় ডাল ভাত হয়ে গিয়েছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে গেরিলারা বন্দুকের নলের মুখে অসংখ্য অবাঙ্গালীর বাড়ীঘর, জমি-জিরাত নিজেদের নামে লিখিয়ে নিয়েছে। মীরপুর ও মোহাম্মদপুরে যেখানে বিহারীদের অসংখ্য সম্পত্তি ছিল তার অধিকাংশই বাংলাদেশ হওয়ার পর

গেরিলারা ঠিক এ প্রক্রিয়ায় কব্জা করেছে। জেলে আটক বিহারীরা আমাদের তাদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা বাঁধ ভাঙ্গ চোখের পানিতে বর্ণনা করেছে। আজ এই ভেবে কৌতুক অনুভব করি যখন আওয়ামী লীগের বড় বড় নেতারা স্বাধীনতার চেতনার কথা বলে হুঙ্কার ছাড়ে তখন মনে হয় এ চেতনার বেলুন কত ঠুনকো। পরের সম্পত্তি লোপাট করে যে চেতনাই প্রতিষ্ঠা করতে যাওয়া হোক না কেন তার পরিণতি কখনই শুভ হয় না। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস কি তার বড় প্রমাণ নয়?

লুটপাটের এই প্রক্রিয়া মুজিবের ইঙ্গিতে অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। মুজিব যখন দেশে ফিরে আসেন তখন তাঁর কর্মীদের তিনি বলতে শুরু করেছিলেন বাইশ বছর কিছু দিতে পারিনি। এখন তোদের সামনে সুযোগ এসেছে। তোরা যে যার মত কিছু বানিয়ে ফেল।

অথচ প্রকাশ্য ভাষণে জনগণকে মুজিব বলে বেড়াতেন তিন বছর আমি তোমাদের কিছুই দিতে পারব না।

লুটপাটের ব্যাপারে মুজিবের ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি সবচেয়ে বেশী হাত পাকিয়েছিল। ঢাকা শহরে বিহারীদের যে কত সম্পত্তি সে জবর দখল করেছে তার ইয়ত্তা নেই। মতিঝিলে এমনও ঘটনা ঘটেছে যে কোন গেরিলা দিনের বেলায় কিছু টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রি অফিসে বিহারীদের কাছ থেকে সম্পত্তি লিখিয়ে নিয়েছে। রাতে সেই টাকাই গেরিলারা আবার ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। অনেক ইন্ডিয়া ফেরৎ গেরিলা এভাবে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে গেছে।

জেল থেকে বের হওয়ার পর ফজলুল হক মনির এক কাহিনী শুনেছিলাম আবু সালেহর কাছ থেকে। আবু সালেহ পাকিস্তান আন্দোলনের সময় সোহরাওয়ার্দী গ্রুপে কাজ করতেন। তিনি ছিলেন মুজিবের খুব ঘনিষ্ঠ। আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথেও তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। পাকিস্তান হওয়ার পর আবু সালেহ মুজিব আর নুরুদ্দীন গ্রীন এন্ড হোয়াইট নামে এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। নিউ মার্কেটের সামনে বলাকা সিনেমা হল এঁরাই তৈরী করেছিলেন। পরে অবশ্য সিনেমা হলের মালিকানা তাঁরা অন্যের কাছে হস্তান্তর করেন।

মুজিবের ব্যবসায়িক পার্টনার হিসেবে আবু সালেহর মুজিবের পরিবারেও আসা যাওয়া ছিল। মুজিব যখন ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় পাকিস্তানে বন্দী তখন আবু সালেহ মুজিবের স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের অনেক সাহায্য করেছেন।

আবু সালেহর বলাকা সিনেমা হলের নীচে একটা বইয়ের দোকান ছিল। এখানে তিনি নিয়মিত বসতেন। জেল থেকে বের হওয়ার পর আমি একবার

নিউমার্কেট গিয়েছিলাম। তখন তাঁর সাথে আমার দেখা। অনেক আক্ষেপের সাথে তিনি আমাকে বললেন, দোস্ত তোরাই ঠিক কথা বলেছিলি। মুজিব যে কি এ দেশ স্বাধীন করেছে! জনগণ শান্তি পেল না।

আমি বললাম কেন এখনতো তোদেরই দিন তোদের ভাল থাকবার কথা। তিনি বললেন ভাল থাকতে পারলাম কোথায়। মুজিব পাকিস্তান থেকে ফিরে আসার কয়েকদিন পর আমি তাঁর ধানমন্ডির বাড়ীতে গিয়েছিলাম। মুজিব তখন সবেমাত্র প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। যে বাড়ীতে আমার এত যাতায়াত, ইব্রাহিম, এবার গিয়ে আমার যেন একটু অন্যরকম লাগল। রিসিপশনে জিজ্ঞাসা করলাম মুজিব কোথায়?

তাঁরা উত্তর দিল উনি এখন একজন খুব সম্মানিত লোকের সাথে কথা বলছেন।

আমি তাঁদের বললাম, কথা শেষ হলে আমাকে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিতে।

মুজিবের বাড়ীর চাকরসহ অনেককেই আমি চিনতাম। তারা কেউ কেউ আমাকে বাইরে দাঁড়িয়ে আছি দেখে ভেতরে যাওয়ার অনুরোধও করল। তারাই আমাকে তখন বলল সম্মানিত ব্যক্তিটি মুজিবেরই দুই ছেলে কামাল ও জামালের জন্য দু'টো ঝকঝকে কার উপহার নিয়ে এসেছেন। মুজিবের মন্ত্রীরা আপ্যায়নের জন্য ছোটাছুটি করছেন। দুটি নতুন কার বাড়ীর সামনে দেখতে পেলাম। কিছুক্ষণ পরেই বুঝলাম সম্মানিত ব্যক্তিটি কে। মুজিব হাস্যোজ্জ্বল মুখে ধনাঢ্য জহুরুল ইসলামের ঘাড়ে হাত দিয়ে বেরিয়ে আসছেন। মুজিব তাঁকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফেরার পথে আমার সাথে তাঁর চোখাচোখি হল।

মুজিব বললেন তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, চল চল। চা খাবি। কখন এসেছিস? আমি বললাম বেশ কিছুক্ষণ হয় এসেছি। আমি চা খেতে আসিনি। তোর কাছে একটা বিচার চাইতে এসেছি। মুজিব বললেন, কিসের বিচার? আগে ভিতরে চল চা খাবি, তারপর সব শুনব।

আমি বললাম আমিতো আগে বিচার চাই। তুই বিচার করবি কি না বল। মুজিব আমাকে চাপের মুখে বললেন কি ঘটনা আমাকে খুলে বল। আমি বললাম তোর ভাগ্নে ফজলুল হক মনি আজ ৬ দিন ধরে ঢাকা শহরে লুটপাট চালাচ্ছে। সরকারী সম্পত্তি রেহাই পাচ্ছে না। ইস্কাটনের ওয়াপদা রেস্ট হাউস মনি শূণ্য করে ফেলেছে। এর দামী আসবাবপত্র এসি ফ্যান থেকে শুরু করে যা কিছু আছে দুদিনে তার দলবল সাবাড় করে ফেলেছে। বাংলাদেশ তো লুটপাট হওয়ার জন্য তৈরী হয়নি, তুই এর বিচার কর।

মুজিব বললেন, আমি সবকিছু দেখব। তুই চিন্তা করিস না। এর মধ্যে মুজিবের স্ত্রী আমাকে দেখে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনিও বললেন হ্যাঁ মনির এসব কথা আমিও শুনেছি।

মুজিব তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে আমাকে আবারও বললেন তুই একটু বসে যা।

আমি বললাম তুই যদি এসব লুটপাটের কোন প্রতিকার না করিস তবে আমি আর কখনও তোর কাছে আসব না। এই কথা বলে মুজিবের বাসা থেকে আমি আমার বাসায় ফিরে এলাম। আধা ঘন্টা হয়নি। এর মধ্যে দেখি একটা জীপ এসে দাঁড়াল, আমার বাসার সামনে। জীপ থেকে একদল তরুণ স্টেনগান হাতে নেমে এসে আমার বাসা ঘিরে ফেলল। আমি তো হতভম্ব। আমার সামনে ওরা চিৎকার করে বলে উঠল তোর এত সাহস। দেশ স্বাধীন করেছি আমরা, আর তুই মনি ভাই এর বিরুদ্ধে তোর পার্টনারের কাছে অভিযোগ করেছিস। বুঝলাম সবকিছু খবর পেয়ে মনি তার দলবল পাঠিয়ে দিয়েছে- আমাকে শিক্ষা দেবার জন্য। এর মধ্যে ওদের কেউ গলা ফাটিয়ে বলল শুয়োরের বাচ্চাকে বেঁধে ফেল।

আর যায় কোথায়। মনির লোকজন আমাকে পিঠ মোড়া দিয়ে বাঁধল। চোখও কাপড় দিয়ে বেঁধে দিল। আমার স্ত্রী ও বাচ্চারা তখন অসহারে মত দাঁড়িয়েছিল।

তারপর আমাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে জীপের মধ্যে আছাড় দিয়ে ফেলল। জীপ চলতে শুরু করল। মনে মনে ভাবছিলাম আমার হয়ত দিন ফুরিয়ে এসেছে। জীপ প্রায় ২০/২৫ মিনিট চলার পর এক জায়গায় এসে থামল। এবারও সশস্ত্র তরুণরা আমাকে আর এক আছাড় দিয়ে জীপ থেকে নামাল। এভাবে প্রায় ২/৩ মিনিট চলে গেল। তরুণরা আমাকে অকথ্য ভাষায় গালি- গালাজ করছিল। আমি তখন মৃত্যুর জন্য মানষিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছি। হঠাৎ দেখি একটা মেয়েলী কণ্ঠ চিৎকার করে বলছে সালেহ ভাই, সালেহ ভাই আমি এসেছি। আপনার আর কোন ভয় নেই। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বুঝলাম এ হচ্ছে বেগম মুজিবের কণ্ঠ। তিনি কিভাবে যেন খবর পেয়ে ছুটে এসেছিলেন। তিনি আমার হাত খুলে দিলেন। চোখের কাপড় সরিয়ে ফেললেন। দেখলাম গুলশান লেকের কাছে আমাকে নিয়ে আসা হয়েছে। বেগম মুজিব না আসলে সেদিন হয়ত তরুণরা আমাকে ওখানে মেরে ফেলে রেখে যেত। যেমন করে ওখানে মনি ও তার লোকজন অসংখ্য রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বী ও বিহারীদের নিয়ে জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছে।

লক্ষ্য করলাম বেগম মুজিব আসায় তরুণরা বেশ কিছুদূর সরে গেছে। বেগম মুজিব আমাকে বারবার অনুরোধ করলেন তাঁর বাসায় যাবার জন্য। আমি বললাম এর পরেও তোমরা আমাকে বাসায় যেতে বল? যাও মুজিবকে বল, স্বাধীন বাংলাদেশে আমার জন্য এত লাঞ্ছনা অপেক্ষা করছিল তা বুঝতে পারিনি। জানিনা আমার পরিবার পরিজন এখন কেমন আছে।

পরে অবশ্য বেগম মুজিবই সালেহকে তাঁর বাসায় পৌঁছে দিয়ে যান। সেদিন সালেহ আমাকে বলেছিলেন এরপর থেকে তিনি আর কখনও মুজিবের বাসায় যান নি। শেখ মনি তখন নতুন দেশের আয়রন ম্যান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। তার কথার প্রতিবাদ করার মত সাহস তখন কারও ছিল না।

১৯

দেশে যখন লুটপাটের মচ্ছব চলছিল তখন মুজিবের প্রত্যক্ষ নির্দেশে গেরিলারা শাহবাগে মুসলিম লীগ অফিস দখল করে। মুসলিম লীগ অফিসের প্রতি শেখ মুজিবের এক সহজাত ঘৃণা ছিল। নিজে তিনি প্রথম জীবনে মুসলিম লীগের আদর্শে কিছুদিন আস্থাবান থাকলেও পরবর্তীকালে তাঁর রাজনীতির মূল সুর আমূল পাল্টে যায়। তাই ক্ষমতায় গিয়ে তিনি তাঁর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে এগিয়ে এলেন। মুসলিম লীগ অফিসের একটা ইতিহাস আছে। ষাটের দশকের প্রথম দিকে মুসলিম লীগ কর্মীদের পক্ষ থেকে একটা দাবী উঠল তাদের একটা নিজস্ব অফিস থাকা চাই। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর তখন মোনেম খান। তাঁরই প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মুসলিম লীগ অফিস নির্মাণ শুরু হয়। এ সময় আইয়ুব খান ঢাকায় এলে মোনেম খান ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে মুসলিম লীগ কর্মীদের এক সভা আহ্বান করেন। এই সভায় তিনি পূর্ব পাকিস্তানের অনেক ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। আইউব খান তাঁর বক্তৃতায় সবাইকে মুসলিম লীগ অফিসের জন্য উদার হস্তে চাঁদা দেয়ার আহ্বান জানান। এতে ব্যাপক সাড়া পড়েছিল। মুসলিম লীগের কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের অফিস তৈরীর জন্য ডায়াসের সামনে দাঁড়িয়ে চাঁদা দেয়ার ঘোষণা দিতে লাগলেন। আমার মনে আছে চাটগাঁর হাফিজ জুট মিল ও কটন মিলের মালিক হাফিজ সাহেবও এ সভায় এসেছিলেন। তাঁর আদি নিবাস ছিল বোম্বাই। তিনি ছিলেন অন্ধ। কিন্তু তাঁর অনুভূতি এতটাই প্রখর ছিল যে, তাঁর কারখানায় উৎপাদিত সুতায় হাত দিয়ে তিনি বলে দিতে পারতেন এটা কোন কাউন্টের সুতা। তুলায় হাত দিয়ে তিনি বলে দিতে পারতেন এ থেকে উৎপাদিত সুতার গুণাগুণ কেমন হবে।

তিনি প্রথমে ডায়াসের সামনে এসে একলাখ টাকা দেয়ার ঘোষণার পর আইয়ুব খানের সাথে হাত মেলান। হাত মেলানোর পরই কেবল তাঁকে জানানো হয় প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের হাতে তিনি হাত রেখেছেন। একথা শুনে তিনি এত উৎফুল্ল হন যে দ্বিতীয়বার তিনি মাইকের সামনে এসে এক লাখ টাকা বৃদ্ধি করে দু'লাখ টাকার কথা ঘোষণা দেন।

হাফিজ সাহেবের মত গেন্ডারিয়ার মুসলিম লীগ কর্মী হাবিব ফকির প্রথমে ৫০ হাজার টাকা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও আইয়ুব খানের সাথে হাত মেলানোর পর তিনি এক লাখ টাকা দেয়ার ঘোষণা দেন। পরবর্তীকালে আইয়ুব খান হাবিব ফকিরকে তমঘায়ে পাকিস্তান খেতাবে ভূষিত করেছিলেন। হাবিব ফকির নিজের

এলাকায় পর্যাপ্ত সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করেছিলেন। গেন্ডারিয়ার ফজলুল হক মহিলা কলেজটি তাঁরই জায়গায় তৈরী।

কার্জন হলের সভায় প্রাদেশিক মন্ত্রী নওয়াবজাদা হাসান আসকারী মুসলিম লীগ বিল্ডিং এর জন্য জমি দান করার ঘোষণা দেন। জায়গাটি ছিল আজকের পিজি হাসপাতালের এ ব্লক যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানে। পিজি হাসপাতালের বি ব্লক ছিল পাকিস্তান আমলের শাহবাগ হোটেল। শাহবাগ ও পরীবাগের পুরো এলাকাই ছিল একসময় ঢাকার নওয়াবদের। শাহবাগ হোটেলের এলাকা সরকার হোটেলের প্রয়োজনে রিকুইজিশন করে। হাসান আসকারী ছিলেন নওয়াব সলিমুল্লাহর পৌত্র এবং নওয়াব হাবিবুল্লাহর ছেলে। হাসান আসকারী তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি মুসলিম লীগের নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছিলেন। কার্জন হলের সভায় তিনি বলেছিলেন, আমার দাদা মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর নাতি হিসেবে মুসলিম লীগ অফিসের জন্য জমি দেওয়ার হক আমারই সবচেয়ে বেশী। প্রয়োজনে আমি মুসলিম লীগের জন্য আমার আরও সম্পত্তি দান করে দেব।

কার্জন হলের সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রাপ্ত চাঁদার টাকায় মুসলিম লীগ বিল্ডিং তৈরীর দায়িত্ব দেয়া হয় মানিকগঞ্জ থেকে নির্বাচিত মুসলিম লীগের এম এন এ আব্দুর রউফকে। আব্দুর রউফ নামকরা ঠিকাদারও ছিলেন। তিনি নিজের তত্ত্বাবধানে মুসলিম লীগের দোতলা অফিসের নির্মাণ কাজ করিয়ে দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশ হওয়ার পর মুজিব মুসলিম লীগ অফিস ও শাহবাগ হোটেলকে একত্র করে পিজি হাসপাতাল হিসেবে চালু করেন। শাহবাগ হোটেল কোন হাসপাতালের পরিকল্পনায় তৈরী হয়নি। মুসলিম লীগ অফিস তো নয়ই। শুধুমাত্র প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য মুজিব হাসপাতাল বানিয়ে মুসলিম লীগ অফিস দখলকে হালাল করেছিলেন।

এর মধ্যে কোন ক্রমেই জনস্বার্থের বিবেচনা মুজিবের ছিল না। স্নাতকোত্তর চিকিৎসার উন্নয়নেও মুজিবের কোন অবদান নেই। কারণ পিজি হাসপাতালের গোড়া পত্তন করেছিলেন মোনেম খান। এদেশে চিকিৎসা শিক্ষার উন্নতিতে মোনেম খানের অবদান অতুলনীয়।

আওয়ামী লীগ সরকারে এসে সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিল। আমার কাছে বিষয়টি অদ্ভুত মনে হত। কেননা, আওয়ামী লীগ চিরকালই ছিল একটা বুর্জোয়া প্রভাবিত দল। মার্কসীয় সমাজতন্ত্র বলতে যা বুঝায় আওয়ামী লীগের কোন নেতা তা বুঝতেন কিনা তাতে রয়েছে আমার প্রবল

সন্দেহ। মার্কসীয় রাজনীতিতে সমাজতন্ত্রের পথ ধরে যে শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলা হয়েছে তা আওয়ামী রাজনীতির গুণগত চরিত্র দিয়ে কোন কালেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও আওয়ামী সরকার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার তর্জন- গর্জন করে যাচ্ছিল। সরকারের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে দেশের তাবৎ কারখানা জাতীয়করণ করে ফেলা হল। এ কর্মকান্ডের স্বপক্ষে বলা হতে লাগল এর মাধ্যমে জনগণ তার পূর্ব অধিকার ফিরে পাবে। আসলে জাতীয় করণ প্রক্রিয়া ছিল এক ধরনের আত্মীয়করণ। জাতীয়করণের মাধ্যমে এসব কলকারখানার প্রশাসন স¤পূর্ণ আওয়ামী লীগের লোকজনের হাতে চলে গেল। কলকারখানায় এতকাল যে শৃঙ্খলা ছিল তা পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়ল। জাতীয়করণের তাৎক্ষণিক ফল হল দিনের পর দিন কল কারখানার শ্রমিক কর্মচারীরা স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে কাজ না করে কারখানা বন্ধ রেখে বেতন তুলতে লাগল। এরকম অবস্থায় কোন শিল্প কারখানাই লাভের মুখ দেখতে পারে না। বাংলাদেশের জাতীয়করণকৃত শিল্প খাতের দিকে তাকালেই এ ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বাংলাদেশ হওয়ার ঊষালগ্নেই শিল্প কলকারখানাগুলোতে যে নৈরাজ্য ও লুটের রাজত্ব শুরু হয়েছিল তার ধকল এখনও কাটিয়ে ওঠা যায়নি।

দেশের সর্ববৃহৎ আদমজী জুট মিলের জি এম হিসেবে মুজিব নিয়োগ দিয়েছিলেন মুজাহারুল কুদ্দুসকে। তিনি ছিলেন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে মুজিবের ক্লাসমেট। মুজাহারুল কুদ্দুস চাকরী করতেন পূর্ব পাকিস্তান কটেজ ইন্ডাস্ট্রিতে। বাংলাদেশ হওয়ার পর পুরনো বন্ধুত্বের কারণে মুজিব যখন তাঁকে নতুন পদে নিয়োগ দান করেন তখন তিনি আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন তুমি আমাকে এখানে কেন দিচ্ছ? আমি জুটের এক্সপার্ট নই, পাট সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। এতবড় একটা মিল কি আমি চালাতে পারব? মুজিব তখন হাসতে হাসতে তাঁর বন্ধুকে বলেছিলেন আমি যদি বাংলাদেশ চালাতে পারি তাহলে তুই একটা জুট মিল চালাতে পারবি না, এটা কি কখনও হয়। আসলে বাংলাদেশের তখন সার্বিক অবস্থাটাই ছিল এরকম। মুজিব পাকিস্তান আমলে বাঙ্গালীদের স্বার্থে কথা বলে বেড়াতেন। অথচ বাংলাদেশ হওয়ার পর তিনি যখন কলকারখানা দেদারসে জাতীয়করণ করতে শুরু করলেন তখন বাঙ্গালীদের শিল্প কারখানাও তিনি রেহাই দেননি। এই জাতীয়করণের প্রহসন কতদূর পৌঁছেছিল তার এক প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা আমাকে দিয়েছিলেন সৈয়দ মোহসীন আলী। আমি জেল থেকে বের হয়ে তাঁর কাছ থেকে এ কাহিনী শুনেছিলাম।

সৈয়দ মোহসীন আলী ছিলেন পাকিস্তান ফেডারেল চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি। পাকিস্তান আমলেই তিনি জুট মিল, কটন মিল ও কোল্ড স্টোরেজের মালিক হয়েছিলেন। তাঁর আদি নিবাস ছিল হুগলী। দেশবিভাগের পর তিনি প্রায় কপর্দকশূণ্য অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানে আসেন এবং নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনার জোরে শিল্পপতিতে পরিণত হন। একসময় তিনি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের কোষাধ্যক্ষও হয়েছিলেন। সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে যে সমস্ত বাঙ্গালী শিল্পপতি হিসেবে উঠে এসেছিলেন তার মধ্যে সৈয়দ মোহসীন আলীর স্থান ছিল বেশ উঁচুতে। তিনি ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। '৭০ সালে যখন দেশের মানুষ আওয়ামী লীগের মিথ্যাচারে বিভ্রান্তির ধুম্রজালে ঘুরপাক খাচ্ছে তখন দেখি মোহসীন আলীর আচরণেও কেমন যেন পরিবর্তন এসেছে। '৭০ সালের নির্বাচনে কোতয়ালী- সূত্রাপুর এলাকা থেকে মুজিব নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের প্রার্থী ছিলেন খাজা খয়েরুদ্দীন। তিনি আমাকে একদিন ডেকে বললেন, ইব্রাহিম তোমার মোহসীন তো এখন মুজিবের পক্ষে কাজ করছেন।

আমি বললাম, খাজা সাহেব, আপনি এ কি বলছেন! তিনি আমাদের মুসলিম লীগের লোক। মুসলিম লীগের লোকেরাই তাঁকে শিল্পপতি বানিয়েছেন। পাকিস্তান এসেইতো তার ভাগ্য খুলে গেছে। তিনি এরকম কাজ করবেন, বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

আমি সময় মত একদিন মোহসীন আলীকে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি নাকি আওয়ামী লীগের হয়ে কাজ করছেন? পাকিস্তানের জন্য আপনি সবকিছু পেয়েছেন। এখন সেই পাকিস্তান বিরোধীদের সাথে আপনি হাত মিলিয়েছেন? আপনি কি আদমজী হতে চান? যা আপনি চাচ্ছেন তা আপনি হতে পারবেন না। আপনি পা দিয়েছেন ষড়যন্ত্রের এক ফাঁদে। পরে শুনেছিলাম নির্বাচনের আগে আগে মোহসীন আলীসহ অন্যান্য বাঙ্গালী শিল্পপতিরা মুজিবকে বস্তা ভর্তি টাকা দিয়ে এসেছিলেন।

বাংলাদেশ হওয়ার পর যখন শিল্প কারখানাগুলো জাতীয়করণ করা হল তখন এই মোহসীন আলীসহ অন্যান্য বাঙ্গালী শিল্পপতিরা মুজিবের সাথে পুনরায় দেখা করেন। তাঁরা মুজিবকে গিয়ে বললেন, আমাদের কি অপরাধ! আপনি আদমজী- বাওয়ানীদের খেদিয়েছেন ভাল কথা। তাঁদের শিল্প কারখানাগুলো জাতীয়করণ করেছেন তা নিয়ে কেউ প্রশ্ন করেনি। কিন্তু আমরা বাঙ্গালীরা কি অন্যায় করেছি? নির্বাচনের আগে আপনাকে বস্তা ভর্তি টাকা দিয়ে এসেছিলাম কি আমাদের সর্বনাশের জন্য? বাংলাদেশ হয়েছে কি বাঙ্গালীদের ভাতে মারবার

জন্য? আমরা ধার দেনা করে স্ত্রীর অলংকার বিক্রী করে মিল- কল- কারখানা গড়ে তুলেছি। আমাদের রক্ত আর ঘামে গড়া শিল্প- কারখানাগুলো এমনিভাবে আপনি জাতীয়করণ করে নিলেন?

মুজিব তখনকার মত তাঁদের বুঝানোর জন্য বলেছিলেন আমি বাঙ্গালীদের মিল- কারখানাগুলো ফেরত দেয়ার কথা বিশেষভাবে ভাবছি। তোমরা চিন্তা করো না। আমার প্লানিং কমিশনের মিটিং আছে। তোমরা এসো। আমি ঐদিন তোমাদের একটা ডিসিশন জানিয়ে দেব।

নির্ধারিত দিনে প্লানিং কমিশনের বৈঠক শুরু হওয়ার আগে মোহসীন আলীসহ অন্যান্য বাঙ্গালী শিল্পপতিরা একত্রিত হন। এর মধ্যে মুজিব আসলেন। হাতে পাইপ। ঘরে ঢুকেই মুজিব শিল্পপতিদের উদ্দেশ্যে হঠাৎ গর্জে উঠলেন, 'আবার ষড়যন্ত্র। সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। কোন ষড়যন্ত্র সহ্য করা হবে না।' মুজিবের এই আচরণ দেখে তো সবাই হতবাক। তিনি নিজে শিল্পপতিদের আসতে বলে এখন তিনিই উল্টো সুরে গান গাওয়া শুরু করেছেন। এ অবস্থা দেখে সবার পক্ষ থেকে সাত্তার জুট মিলের মালিক আব্দুস সাত্তার দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি মুজিবকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ধমকাবেন না। আপনি নিজেইতো আমাদের আসতে বলেছেন। আপনিইতো সেদিন বললেন, বাঙ্গালীদের মিলগুলো আপনি ফেরত দিয়ে দেবেন। আপনাকে বঙ্গবন্ধু বানিয়েছিলামতো আমরাই। বাঙ্গালীদের সুবিধা হবে সেজন্যই আমরা আপনাকে নির্বাচনে জিতিয়েছিলাম। নির্বাচনের আগে তো আপনি সমাজতন্ত্রের কথা বলেননি। ভারতের সম্মান রক্ষার জন্য আপনি নির্বাচনে ভোট চেয়েছিলেন, একথা তো আপনি আমাদের সেদিন একটি বারও ইঙ্গিত দেননি।

উত্তেজিত শিল্পপতিদের শান্ত করার জন্য মুজিব তখন চায়ের আমন্ত্রণ জানান। শিল্পপতিরা সেদিন মুজিবের চায়ের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে চলে আসেন। আসার সময় মুজিবের মুখের উপর বলে আসেন আপনার চা আমরা খাব না। আপনি আমাদের পথে বসিয়েছেন, আল্লাহ এর বিচার করবেন।

নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাতে মনে হয়েছিল মুজিব ক্ষমতায় এলে তাড়াতাড়ি দেশের অবস্থা পাল্টে যাবে, বাংলাদেশ অল্প সময়ের মধ্যেই পৌঁছে যাবে উন্নতির চরম শিখরে।

আমরা জেলে বসে উন্নতি- অগ্রগতির কোন লক্ষণ বুঝতে পারতাম না। বুঝতে পারতাম না দেশের মানুষের উন্নতি হচ্ছে না অবনতি হচ্ছে। মাঝে মাঝে পত্রিকায় মওলানা ভাসানীর বক্তব্য ও বিবৃতি পড়তাম। মওলানা আওয়ামী লীগের

লুটপাটের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন। মওলানা আর একটা কাজ করেছিলেন। পাক আর্মির ১২ হাজার কোটি টাকার সমরাস্ত্র ইন্ডিয়া লুট করে নিয়ে গিয়েছিল মওলানাই প্রথম এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। আওয়ামী লীগের ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে মওলানা কথা বলতেন। মওলানার একটি পত্রিকা ছিল 'হক কথা'। এ পত্রিকাটি চালাতেন মওলানার এক সাগরেদ ইরফানুল বারী। যেহেতু হক কথা আওয়ামী লীগের লুটপাট ও নৈরাজ্যের ভয়ংকর চিত্র তুলে ধরত তাই আওয়ামী লীগ প্রশাসন ইরফানুল বারীকে ধরে জেলে পাঠিয়ে দেয়। আমরা জেলের ভিতরে বারীকে পেয়ে খুশীই হয়েছিলাম।

এ সময় বিরোধী দল বলতে কিছুই ছিল না। মুজিব ইসলামপন্থী দলগুলো নিষিদ্ধ করেছিলেন। মুজিবের সৃষ্ট নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে এ সময় মওলানা ভাসানী ছাড়া আর এক ব্যক্তি বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলেন। ইনি হলেন আবুল মনসুর আহমদ। এ সময় তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকা না থাকলেও তাঁর কলমের জোর অক্ষুন্ন ছিল। তিনি আমাদের মত পাকিস্তানপন্থীদের যাঁদের কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়া শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আটক করে রাখা হয়েছিল, তাঁদের পক্ষেও অনেক লেখালেখি করেছিলেন।

একদিন জেলে একটা খবর ছড়িয়ে পড়ল। জেলের সবার মুখে মুখে খবরটা ভেসে বেড়াতে লাগল। খবরটা ছিল মুজিবের মন্ত্রী তাজুদ্দীনের নিকট ইন্ডিয়ার কাছ থেকে কারাবন্দীদের একটি লিস্ট এসেছে। ইন্ডিয়া তাজুদ্দীনকে বলেছিল যে উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদের বাংলাদেশ স্বাধীন করে দিয়েছি তা যদি কার্যক্ষম রাখতে চাও তাহলে লিষ্টে উল্লেখিত কারাবন্দীদের চিরদিনের মত সরিয়ে দাও। লিষ্টে ১৭৮ জনের নাম ছিল। এর মধ্যে ইসলামপন্থী রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সিভিল সার্জেন্ট ও পুলিশ অফিসার অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

এ খবর গুজব ছিল কিনা বলতে পারব না। তবে তখনকার পরিস্থিতিতে এরকম ঘটনা অস্বাভাবিক ছিল না। কেননা, জেল থেকে ধরে নিয়ে পাকিস্তানপন্থীদের গুলি করে মেরে ফেলার উদাহরণ ইতোমধ্যে গেরিলারা সৃষ্টি করেছিল।

এর মধ্যে একদিন জেলে কিছু নতুন মুখ দেখা গেল। ফজলুল কাদের চৌধুরী আমাকে ডেকে বললেন, ইব্রাহিম তুমি ভাল করে খোঁজ খবর নাও। দুটি অপরিচিত যুবক দু'বার আমার ঘরে উঁকি মেরে গেল। পাশের ঘরগুলোতেও যুবকরা উঁকি মারল। ব্যাপারটা কি! আমি আমার সেল থেকে বের হয়ে এদিক-ওদিক তাকালাম, দেখি কয়েকজন যুবক সেলগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছে। এদের

দু'একজনের মুখ আমার চেনা চেনা লাগল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো এরা গেরিলা বাহিনীর সদস্য না হয়ে পারে না।

ফজলুল কাদের চৌধুরীকে সব খুলে বললাম। তিনি আমাকে বললেন নির্মল বাবুকে একটু ডেকে আনো। আমি নির্মল বাবুকে গিয়ে বললাম, চৌধুরী সাহেব জরুরীভাবে আপনাকে ডেকেছেন। একটু আসেন। নির্মল বাবু তৎক্ষণাৎ তার ফোর্সসহ ফজলুল কাদের চৌধুরীর সেলের সামনে আসেন। চৌধুরী সাহেব তখন তাঁকে বললেন, দেখুন মি. রায়, আপনি তো সব সময় আমাকে জেলকোড শেখান। জেলকোডের কোথায় আছে বাইরের অপরিচিত লোকজন এসে সেলের ভিতর উঁকি দিয়ে যাবে? এদের উদ্দেশ্য কি? কি মোটিভ নিয়ে এরা জেলের ভিতর ঢুকেছে?

চৌধুরী সাহেবের হাকডাকে নির্মল বাবু থতমত খেয়ে গেলেন। তিনি বললেন, স্যার, আমি সব কিছু দেখছি। শুনেছিলাম নতুন চেহারার লোকেরা হোমস থেকে অনুমতি নিয়ে ঢুকেছিল। কিভাবে ঢুকেছিল আমি আজও বুঝতে পারিনা।

নির্মল বাবু চলে যাবার পর চৌধুরী সাহেব আমাকে বললেন দেখলেন ইব্রাহিম জেলার জানেন না অথচ বাইরে থেকে জেলের ভিতর লোক ঢুকে পড়েছে। ষড়যন্ত্র চলছে। এ ঘটনার পর আমাদের জেলের ভিতর বেশ কয়েকদিন আতঙ্কের মধ্যে কাটে। কখন কি হয়! শাহ আজিজ তো বেশ ভেঙ্গে পড়েছিলেন।

পাবনার আব্দুল মতিন আমাদের সাহস যোগাতেন। তিনি হঠাৎ করে একদিন আমাদের বললেন চিন্তার কোন কারণ নেই, পাকিস্তান থেকে ত্রিদিব রায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চলে এসেছেন। অস্ত্র- শস্ত্রও এনেছেন। এবার লোকজন নিয়ে আমাদের জেলের দেয়াল ভেঙ্গে উদ্ধার করবেন।

বন্দী জীবনের এত কষ্টের মধ্যেও মতিনের এই সাহস দেবার কৌশল আমাদের মন স্পর্শ করত। একদিন সকালে শুনি মুজিব আমাদের দেখতে আসবেন। মুজিব আসবেন তাই সকালে নাস্তা দেবার পরপরই আমাদের সেলের ভিতর ঢুকিয়ে তালা দিয়ে দেয়া হল। যেন আমরা চিড়িয়াখানার জন্তু- জানোয়ার।

আমরা সেলের মধ্যে বসে মুজিবের আগমণ প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। কি কারণে মুজিব সেদিন আসেননি, এলেন তাজুদ্দীন।

জেলের আর কোথায় গিয়েছিলেন সে বলতে পারব না। তবে একবার তিনি বিশ সেলের সামনে এলেন। গরাদের আড়ালে দাঁড়ানো আমাকে দেখেই তাজুদ্দীন দাঁড়িয়ে পড়লেন। তিনি আমাকে বললেন কি খবর ইব্রাহিম ভাই, কেমন আছেন?

আমি তাঁকে বললাম, তোমরা যেমন রেখেছো। তোমরাই তো এখন দেশের দন্ডমুন্ডের হর্তাকর্তা। এভাবে আর তোমরা আমাদের কতকাল কষ্ট দেবে? তাজুদ্দীন বললেন, বাইরের অবস্থা খুব খারাপ ইব্রাহিম ভাই। সময় হলে আমরা আপনাদের ছেড়ে দেব। একথা বলে তিনি যখন চলে যাওয়ার উপক্রম করছেন অমনি পাশের সেল থেকে ফজলুল কাদের চৌধুরীর কণ্ঠ শুনতে পেলাম। তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, তাজুদ্দীন, এদিকে শোন।

স্যার আমি আসছি বলে তাজুদ্দীন তাড়াতাড়ি চৌধুরী সাহেবের সেলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। চৌধুরী সাহেব তাজুদ্দীনকে বললেন মুজিবের না আসার কথা ছিল? এ আমাদের কোথায় রেখেছ? দেখছ কি অবস্থা আমাদের। ২৬ সেলে আমাদের রাখা যেত না? তোমরাওতো এই এই জেলেই ছিলে। আমরা কি তোমাদের এই কষ্ট দিয়েছি?

তাজুদ্দীনের বললেন স্যার ২৬ সেলে নিয়াজীকে আনা হবে। ওখানেই ওর বিচার হবে। তাজুদ্দীনের কথা শেষ না হতেই চৌধুরী সাহেব বললেন, কি বাজে কথা বলতে শুরু করেছ। নিয়াজীকে ইন্ডিয়া নিয়ে গেছে। সেখান থেকে তিনি পাকিস্তান চলে যাবেন। তোমরা তাদের বিচার করতে পারবে না। পাক আর্মির ফেলে যাওয়া অস্ত্র- শস্ত্র ইন্ডিয়া লুট করেছে। তোমরা ঠেকাতে পারনি। তোমাদের সে সুযোগ হয়নি। তাজুদ্দীন, বিশৃঙ্খলার ভিতর যাদের জন্ম তারা কখনই শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারে না। বিশৃঙ্খলার ভিতর দিয়েই তারা শেষ হয়ে যায়। ইন্ডিয়া এ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে তোমাদের ক্ষমতায় বসিয়েছে। তাজুদ্দীন শুনে রাখ, আল্লাহ সবকিছু স্থির করেন। দেশের মানুষের আমি কোন ক্ষতি করিনি। আমরা দেশটা গড়তে চেয়েছিলাম। তোমরা ইন্ডিয়ার সাথে চক্রান্ত করে আমাদের কয়েক যুগ পিছিয়ে দিলে। আমি বলছি একদিন এই জেলখানার ভিতর তোমাদেরও বিচার হবে।

তাজুদ্দীনের পিছনে সেক্রেটারী আইজি প্রিজনসহ জেলের সব উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁরা চৌধুরী সাহেবের কথায় নীরব হয়ে যান। আমি আজ এতদিন পর যখন ভাবি তখন মনে হয় চৌধুরী সাহেবের কথা। ইতিহাসের অমোঘ রায় এড়িয়ে কেউ পালিয়ে বাঁচতে পারে না। যে তাজুদ্দীন আমাদের করুণা করতে এসেছিলেন পরবর্তীকালে এই জেলেই তাঁকে অধিকতর খারাপ পরিণতি বরণ করতে হয়েছিল।

জেলখানা এতদিন ছিল মূলত দাগী আসামীদের থাকার জায়গা। পাকিস্তান আমলে জেলখানায় রাজনৈতিক বন্দীরাও থাকতেন। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা

ছিল অল্প। ঢাকা জেলের ইতিহাসে মনে হয় এই প্রথম এত বেশী শিক্ষিত কয়েদী, রাজনৈতিক নেতা, সরকারী কর্মচারী, ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার ও ইসলামী চিন্তাবিদ কারারুদ্ধ হন।

জেলের কর্মচারীরাও জানতেন সামাজিকভাবে এঁদের অবস্থান তাঁদের চেয়ে অনেক উপরে। বাংলাদেশ হওয়ার পর প্রথম প্রথম যখন দেশের মানুষ এক ধরনের হুজুগে মেতে ছিল তখন জেলের কর্মচারীরা এসব জানা সত্ত্বেও আমাদের মত বন্দীদের উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতেন। কিন্তু নতুন সরকার যখন তাদের প্রতিশ্রুতি মত চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হচ্ছিল, দু'আনা চাল, তিন আনা ঘি দেয়ার মত লোভনীয় প্রতিশ্রুতি যখন ধুলায় গড়াগড়ি দিতে শুরু করল তখন জেলের পুলিশ ও ওয়ার্ডারদের মনোভাব আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠল। তখন দেশের আম জনতার মত এঁদেরকেও দেখলাম আওয়ামী লীগের উপর থেকে তাঁদের বিশ্বাস হারাতে শুরু করেছে।

একদিন তো এক মিয়া সাহেব ফজলুল কাদের চৌধুরীর কাছে এসে বলেই ফেলল স্যার আপনাদের কথা না শুনে যে কি ভুল করেছি। শেখ মুজিব আমাদের দাগা দিয়েছেন। বাজারে এখন আকাল। জিনিসপত্রের দাম যেভাবে হু হু করে বাড়ছে তাতে স্যার দুর্ভিক্ষ লেগে যাবে। চৌধুরী সাহেব তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বললেন, হ্যা, তোমরা পুলিশের লোকজনই তো বেশী করে লাফিয়েছিলে। এখন স্বাধীনতাকে তরকারি বানিয়ে খাও। আমি চৌধুরী সাহেবের পাশেই ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন দেখেছ ইব্রাহিম অবস্থাটা। বাঙ্গালীদের মত দুর্বল বিশ্বাসের লোক আর কোথাও পাবে না। স্বাধীনতার জন্য এরাই একদিন সবচেয়ে বেশী লাফালাফি করেছিল এখন আবার উল্টো জারি গাওয়া শুরু করেছে।

জেলে আসার মাস তিনেক পর আমার দাঁতে খুব ব্যথা শুরু হল। আমার ডানদিকের মাড়ির একটা দাঁত আগে থেকেই একটু একটু নড়ত। ভীষণ ব্যথায় ছটফট করতাম। এসময় জেলে অনেকেরই দাঁতে ব্যথা শুরু হয়েছিল। জেলের পরিবেশ হয়ত এর জন্য অনেকখানি দায়ী। দাঁতে ব্যথা উঠলে আমি গুল মাখতাম। তাতে ব্যথার একটু উপশম হত। সবুর সাহেবেরও তখন দাঁতে ব্যথা শুরু হয়েছিল। একদিন তো তিনি আমাকে ডেকে বললেন ইব্রাহিম দাঁতের ব্যথায় তো আমি কাতর হয়ে পড়েছি। কি করব বুঝতে পারছিনা। আমি বললাম, সবুর ভাই, আপনার ডাক্তার দেখানো উচিত। আর আমি ব্যথা উঠলে গুল মাখি। আপনি একটু মেখে দেখতে পারেন। গুল আমাকে কে এনে দেবে! আমি বললাম সবুর

ভাই গুল আমি ম্যানেজ করে দেব। চিন্তা করবেন না। পরে আমি এক কৌটা গুল বাইরে থেকে এনে সবুর সাহেবকে দেই।

একদিন ব্যথা উঠলে সবুর সাহেব দাঁতের গোড়ায় সেই গুল নিয়ে মাখতে থাকেন। আর যায় কোথায়! তার তো গুল মাখার কখনও অভ্যাস ছিল না। সেই গুল মেখে তিনি হঠাৎ চোখ মুখ উল্টে মুর্ছা গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি তার সেলে গিয়ে দেখি তিনি খাটের উপর চোখ উল্টে পড়ে আছেন। বড় বড় শ্বাস নিচ্ছেন।

মাথায় পানি দেওয়ার পর যখন তিনি একটু একটু করে চোখ খুললেন তখন প্রথমেই তাঁর মুখ দিয়ে বের হল ইব্রাহিম তুমি আমাকে এ কি দিলে! আমি তো ব্যথা কমানোর জন্য দিয়েছিলাম। হুঁ তুমি আমাকে জানে মারতে চেয়েছিলে। তোমার গুল তুমি নিয়ে যাও।

বলাবাহুল্য এরপর সবুর সাহেব আর কখনও গুল মাখেননি। জেল থেকে বের হওয়ার পর এ কাহিনী বললে তিনি হাসতেন।

একদিন দাঁতের ব্যথা সহ্য করতে না পেরে আমি জেল হাসপাতালে গেলাম। ডাক্তার সব পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে বললেন আপনার দাঁত তো নড়ে গেছে, ফেলে দিতে হবে। এজন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজে কাল আমরা সব ব্যবস্থা করে দেব। হঠাৎ ডাক্তার আমাকে বললেন ফজলুল কাদের চৌধুরী সাহেব তো হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। দোতালায় আছেন।

দাঁতের ব্যথায় এত অস্থির হয়ে পড়েছিলাম যে চৌধুরী সাহেব কখন হাসপাতালে এসেছেন বুঝতে পারিনি। দোতলায় যেয়ে দেখি তিনি বেডে শুয়ে আছেন। লক্ষ্য করলাম তাঁর মুখের বাম দিকে এক মস্ত বড় ফোঁড়া উঠেছে। তখন আবার ভীষণ গরম, ব্যথায় তিনি অস্থির হয়ে পড়েছেন। আমি বললাম কাদের ভাই আপনার ফোঁড়া উঠেছে তাতো আমাকে বলেননি। তিনি বললেন কেন, সেদিন বললাম না। সব ভুলে গেছ। তিনি আবার হাসতে হাসতে বললেন, বেঁচে যে আছি এইতো অনেক। মুজিব তো আমাদের খুব আরামে রেখেছে।

হঠাৎ আমার চোখে পড়ল চৌধুরী সাহেবের কাছেই একটা বেডে পূর্বদেশ পত্রিকার সম্পাদক নোয়াখালীর মাহবুবুল হক শোয়া। আমি একটু অবাক হয়ে তাঁর কাছাকাছি গিয়ে বললাম, মাহবুব ভাই আপনি জেলে এসেছেন কবে? আপনি কি অন্যায় করেছেন? আমি আবার হাসতে হাসতে বললাম, এ্যাসেম্বলির মেম্বার আর স্পীকার এভাবে যুগলবন্দি হলেন কখন? চৌধুরী সাহেব যখন পাকিস্তান ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলির স্পীকার মাহবুব তখন বিরোধী দলের এমএনএ। মাহবুব মূলত ছিলেন রেলওয়ে শ্রমিকদের নেতা।

মাহবুব আমাকে বললেন সব ষড়যন্ত্র। শেখ মনি আমাকে জেলে ঢুকিয়েছে। দেখছো আমার শরীরে পানি এসেছে! আমার অবস্থা খুব খারাপ। আমার বাইরে চিকিৎসা দরকার। ডাক্তাররা লিখেছেন অথচ হোমস পারমিশন দিচ্ছে না। শেখ মনিই এসব করাচ্ছে। আমাকে তারা জেলের ভিতরে তিলে তিলে মারতে চায়।

আমি বললাম মাহবুব ভাই এ্যাসেম্বলিতে বিরোধী দলে থাকার সময় আপনি তো বাঙ্গালীদের অধিকার নিয়ে বহু কথাবার্তা বলেছেন। নানা রকম তথ্য পরিসংখ্যান দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আপনি বাঙ্গালীদের অধীকার নিয়ে এ্যাসেম্বলির ফ্লোরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। সেগুলো আমরা পত্রিকায় দেখেছি। আপনি বাঙ্গালীদের জন্য যে রকম কথা বলেছেন এ্যাসেম্বলিতে আওয়ামী লীগ মেম্বাররাও তো সেরকম করে কখনও বলেননি। আমরা জেলে এসেছি কারণ রাজনীতিতে আমরা মুজিবের আদর্শের প্রতিপক্ষ। কিন্তু আপনি কেন জেলে এলেন?

চৌধুরী আমার কথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন মাহবুব তো আমাদের বহু গাল দিয়েছে। একবার আমি এ্যাসেম্বলিতে ওকে ছয় ঘন্টার উপর সময় দিয়েছিলাম গালাগালি করার জন্য। কিন্তু লাভ কি হল? আমাদের সাথেই তো ওকে এখন জেলের ভাত খেতে হচ্ছে। মাহবুব তখন বেডে শুয়েই চৌধুরী সাহেবকে বললেন কাদের ভাই আমি বাঙ্গালীদের অধিকারের কথা বলেছি ঠিকই কিন্তু কখনও মুজিবের অপশাসন চাইনি।

আসবার সময় বললাম, মাহবুব ভাই, আপনার জন্য খাবার পাঠিয়ে দেব। কোন চিন্তা করবেন না। মাহবুব তখনও ডিভিশন পাননি।

আমি পরে শুনেছিলাম মাহবুব তাঁর পত্রিকায় মুজিবের অপশাসনের বিরুদ্ধে লিখতে গিয়েই শেখ মনির রোষানলে পড়েন।

পরের দিন জেলের নিয়ম অনুযায়ী আমাকে সিপাই পরিবৃত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দন্ত বিভাগে নিয়ে যাওয়া হল। আমার আগে সিপাই পিছনে সিপাই, দেখে তো চারদিকে লোকজন জমে গেল। তারা ভেবেছিল কোন কেউ- কেটা বোধ হয় এসেছেন। কিন্তু তাদের ধারণা কিছুক্ষণের মধ্যেই শরতের মেঘের মত অপসৃত হল। তারা বুঝল আমি একজন 'দালাল'। লোকজনের মধ্যে তখনও কম বেশী আওয়ামী লীগের হুজুগ চলছিল। ডাক্তার যখন আমাকে চেয়ারে বসিয়ে দাঁত তোলার প্রক্রিয়া শুরু করলেন তখন তারা কয়েকজন জোরে চিৎকার করতে লাগল, দে শালা দালালকে শেষ করে দে!

ডাক্তারও জানিনা আওয়ামী লীগ মনোভাবাপন্ন ছিলেন কি না! দাঁত তোলার সময় আমি যথেষ্ট ব্যথা পেয়েছিলাম। ডাক্তার আমাকে দাঁত তোলার আগেই দাঁতের গোড়ায় চেতনানাশক ওষুধ দিয়েছিলেন বললেন, কিন্তু কতদূর সত্য ছিল তাঁর কথা বলতে পারব না। আমি ব্যথায় মুখ চেপে ধরে চিৎকার করে উঠেছিলাম। আমার আর্ত চিৎকার এত ভয়ঙ্কর ছিল যে আমাকে প্রহরারত এক সিপাই সেই চিৎকার শুনে তার বন্দুকসহ মুর্ছা যায়। লোকজন তখন বলাবলি করতে শুরু করে দালালের চিৎকার শুনেই যদি পুলিশ অজ্ঞান হয়ে যায় তবে তাড়া করলে এদের কি অবস্থা হবে?

ডাক্তার আসার সময় কিছু ঔষুধপত্র দিয়ে দিয়েছিলেন। জেলে ফিরে এসেও ব্যথাটা আমার কয়েকদিন ছিল। কিন্তু নিজেদের তকদিরের কথা ভাবলে জেলে বসে এসব ব্যথার কথা অবশ্য মনে থাকত না।

জেলে বসে ফজলুল কাদের চৌধুরী যেমন সবকিছুরই প্রতিবাদ করতেন, সবুর সাহেবকে তেমন ভূমিকায় দেখা যেত না। অধিকাংশ ব্যাপারে তিনি নীরবই থাকতেন। সেলের ভিতর দেখলাম তিনি তাঁর আত্মচরিত বসে বসে লিখছেন। কি করে যেন পরে তাঁর আত্মচরিতের পান্ডুলিপিটা হারিয়ে যায়। আমার বিশ্বাস এটা প্রকাশিত হলে জাতির অনেক উপকার হত। জেলে বসেই সবুর সাহেব তার বিশাল সম্পত্তির একটা ট্রাস্ট তৈরী করে উইল করে দিয়েছিলেন। তাঁর বিশাল সম্পত্তি জাতির কল্যাণে ব্যবহৃত হওয়ার কথা উইলে লেখা হয়েছিল।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে ফজলুল কাদের চৌধুরীর মতই সবুর সাহেবের একটা বিরাট ভূমিকা ছিল। জাতীয় পরিষদে তিনি সরকারী দলের নেতা ছিলেন। এই বিরাট দায়িত্ব থেকে তিনি বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে বিরাট অবদান রেখেছিলেন। ফজলুল কাদের চৌধুরী যেমন চট্টগ্রাম শহরকে গড়েছিলেন তেমনি সবুর সাহেব খুলনা শহরকে নিজ হাতে সাজিয়েছিলেন। খুলনাকে শিল্প শহর হিসেবে গড়ে তোলার পিছনে তাঁর অবদান সমধিক। খুলনার নিউজপ্রিন্ট ফ্যাক্টরী, কেবল ফ্যাক্টরী, কয়েকটি জুট মিল, কটন মিল, নিউ মার্কেট, চালনা বন্দর, রেডিও সেন্টার তাঁরই উদ্যোগে গড়ে ওঠে।

সবুর সাহেব আজীবন নিঃসন্তান ছিলেন। বোধ হয় সে কারণে নিঃসঙ্গতা কাটাতে তিনি তাঁর বাড়ীতে নানা রকম জন্তু- জানোয়ার পুষতেন। হয়ত এটা তাঁর এক ধরনের সখও ছিল। তিনি যখন জাতীয় পরিষদের নেতা তখন তাঁর পিন্ডির বাসায় গিয়ে দেখি বাসাতো নয় যেন পুরোদস্তুর এক চিড়িয়াখানা। তাঁর এ চিড়িয়াখানায় বিদেশী কুকুর, বানর, হরিণ, শিম্পাঞ্জি এমনকি সুন্দরবনের হিংস্র

বাঘও ছিল। চীন থেকে তিনি বিরল প্রজাতির টিয়া সংগ্রহ করেছিলেন। আর ছিল কাকাতুয়া। বাঘ কখনও পোষ মানে না শুনেছি। কিন্তু সবুর সাহেব যখন বাঘটার কাছে যেতেন তখন সে মাথা নীচু করে থাকত। বাঘের খাঁচায় খাবার- দাবার সবুর সাহেবই দিতেন। এ এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

শিম্পাঞ্জিগুলো সবুর সাহেবের এত অনুগত ছিল যে তারা লাইটার দিয়ে তাঁর সিগারেট ধরিয়ে দিত। তাঁর এ্যাসট্রে এগিয়ে আনত। প্রয়োজনে তাঁর গা চুলকিয়ে দিত। শিম্পাঞ্জিগুলোকে সবুর সাহেবও খুব যত্নে করতেন। আঙুর, আপেল, আনার এনে তিনি এদের নিজ হাতে খাওয়াতেন। এ দেখে আমাদের হেকিম ইরতেজাউর রহমান বলতেন সবুর ভাই আপনি আপনার শিম্পাঞ্জিগুলোকে বিদায় করে দিয়ে আমাকে খাঁচায় রেখে দিন। শিম্পাঞ্জিগুলোকে যা খাওয়ান তার কিছু অংশ আমাকে দিলেই হবে। আমি আপনার সব কাজ করে দেব। হেকিম সাহেবের কথা আমরা বেশ উপভোগ করতাম। মন্ত্রীত্ব থেকে চলে আসার পর সবুর সাহেব পিন্ডি থেকে শিম্পাঞ্জিগুলোকে তাঁর ঢাকার বাসায় নিয়ে এসেছিলেন। ৭১-এর ২৫শে মার্চের একদিন আগে দেশের অবস্থার কথা ভেবে সবুর সাহেব শিম্পাঞ্জিগুলোকে ঢাকা চিড়িয়াখানায় দিয়ে আসেন। আমিও তাঁর সাথে গিয়েছিলাম। মানুষের সাথে অবোধ প্রাণীগুলোর কি যে এক মমত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তা না দেখলে কখনও বিশ্বাস করতাম না। বিদায় নেবার সময় শিম্পাঞ্জিগুলো সবুর সাহেবের গলা ধরে অঝোর ধারায় কাঁদতে থাকে। তারা তো সবুর সাহেবকে ছাড়বেই না। সবুর সাহেব অনেক আপেল, আঙুর সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারা ওসব কিছু স্পর্শও করল না। সবুর সাহেব যখন চলে আসতে থাকেন তখন তারা একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল।

সেলের মধ্যে একদিন বসে আছি, এক ফালতু এসে আমাকে খবর দিল, সবুর সাহেব কাঁদছেন। আমি তাড়াতাড়ি করে তাঁর সেলে গিয়ে দেখি ফালতু যা বলেছে তা ঠিক।

আমি বললাম সবুর ভাই আপনি কাঁদছেন কেন? আপনাকে তো আমি কখনও কাঁদতে দেখিনি। তিনি বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন ইব্রাহিম তুমি তো জানো শিম্পাঞ্জি দুটোকে আমি চিড়িয়াখানায় রেখে এসেছিলাম। খবর পেয়েছি চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ ঠিকমত খেতে না দিয়ে আমার শিম্পাঞ্জি দুটোকে মেরে ফেলেছে। তিনি কাঁদতে কাঁদতে তার ডায়েরীতে রাখা শিম্পাঞ্জি দুটোর ছবিও আমাকে দেখালেন। আমিও এই নিঃসন্তান বৃদ্ধ রাজনীতিবিদকে কি সান্ত্বনা দেব তখনকার মতো তাঁর কন ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর সবুর সাহেব আমাকে দুঃখ করে বললেন ইব্রাহিম অবোধ পশুগুলোরও কৃতজ্ঞতাবোধ আছে। আদর পেলে তারাও প্রতিদান দিতে চায়। কিন্তু মানুষের কি তা আছে? এই যে দেখ আমার বাসা থেকে আত্মীয়-স্বজন চাকর- বাকর আমার খাবার নিয়ে মাঝে মাঝে আসে। ওদের সাথে আমার কুকুর দুটোও আসে। জেল গেটে আমার শরীর ঘেঁষে দাঁড়ায়, লেজ নাড়ে, জিহ্বা বের করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কিন্তু দেখ আমার পিন্ডির বাসায় বিরোধী দলের বিশেষ করে আওয়ামী লীগের কোন্ সদস্য সন্ধ্যার পর আসেনি? আমার বাসায় খায়নি? মশিউর রহমান, মিজানুর রহমান চৌধুরী এঁরাতো আমার বাসায় পড়েই থাকতেন। আমার কুকুর দুটো দেখতে আসে, এঁরা আসে না। পার্টিশনের আগে আমি যখন সোহরাওয়ার্দী গ্রুপে ছিলাম তখন মুজিব কত এসেছেন। আমার কাছ থেকে কতভাবে যে টাকা আদায় করেছেন, ত“ ইয়ত্তা আছে! এসব মানুষ পশুরও অধম।

সবুর সাহেবের পাশের সেলেই থাকতেন খাজা খয়েরুদ্দীন। খাজা সাহেব ছিলেন ঢাকার নওয়াব পরিবারের সদস্য। তাঁর আচার- ব্যবহার সৌজন্যবোধ ছিল দেখবার মত। ব্যবহারের মধ্যে যে মানুষের অনেকখানি পরিচয় দীপ্ত হয়ে ওঠে খাজা খয়েরুদ্দীনের সাথে আলাপ করলে তা পরিষ্কার হয়ে উঠত।

নওয়াব পরিবারের সদস্যভুক্ত হয়েও তিনি জনতার কাতারে নেমে এসেছিলেন। মানুষকে তিনি দ্রুত আপন করে নিতে পারতেন। যে কেউ দু'দন্ড তাঁর সাথে কথা বললে তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে যেতেন। খাজা সাহেবের একটাই অসুবিধা ছিল তিনি ভাল করে বাংলা বলতে পারতেন না। সেকালের শরীফ পরিবারগুলোতে উর্দুর ছিল ব্যাপক প্রভাব। তবু এই ভাঙ্গা বাংলা নিয়েই নিজের চরিত্র মাধুর্যের জন্য ঢাকাবাসীর কাছে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তিনি আইয়ুবের কনভেনশন মুসলিম লীগে যোগ না দিয়ে যোগ দিয়েছিলেন নাজিমুদ্দীন সাহেবের সরকার বিরোধী কাউন্সিল মুসলিম লীগে। বিরোধী দলে থাকা অবস্থায়ই তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান হন।

জেলে আসার পর একবার তিনি আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উত্তরে বলেছিলেন, মুসলিম লীগ আমার পূর্ব পুরুষেরাই প্রতিষ্ঠা করেছেন। মুসলিম লীগ আমার আদর্শ। ১৯৭১ সালে আমি আমার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছি। তাতে আমার কোন অপরাধ হয়েছে বলে আমি মনে করি না।

শাহ আজিজুর রহমান থাকতেন নিউ আট সেলে। তাঁর সেলের মধ্যে একদিন গিয়ে দেখি সেলের দেয়াল জুড়ে কয়লা দিয়ে কোরান শরীফের আয়াত লিখে তিনি ভরে রেখেছেন।

শাহ সাহেব জেলের মধ্যে আমাকে প্রায়ই বলতেন, আমি ছিলাম পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের বিরোধী দলীয় উপনেতা। আজ সেই আওয়ামী লীগই আমাকে জেলে ঢুকিয়েছে। দেখো তকদির আর কাকে বলে!

শাহ সাহেবের জীবন ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। জীবনে তিনি দল পাল্টিয়েছেন বহুবার। প্রথম জীবনে পাকিস্তান আন্দোলনের তিনি ছিলেন শীর্ষ ছাত্র নেতা। শাহ আজিজ অনেক পরে যোগ দেন আওয়ামী লীগে। কিছুদিন তিনি সোহরাওয়ার্দীর সাথে পিডিএম- এর হয়ে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে কাজ করেন। আওয়ামী লীগের সাথে যখন মুজিবের মনোমালিন্য হয় তখন শাহ আজিজ সোহরাওয়ার্দীর ডান হাত হিসেবে কাজ করেন। কিছুদিন তিনি আতাউর রহমান খানের সাথে জাতীয় লীগও করেছেন। জেল থেকে বের হওয়ার পর নিছক ক্ষমতার জন্য মুসলিম লীগকে ভেঙ্গে জিয়াউর রহমানের সাথে যোগ দেন ও প্রধানমন্ত্রী হন।

জেলের মধ্যে মোনেম খানের ছেলের কথা না লিখলে এ কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এদের বয়স ছিল খুব কম। দুজনই কলেজে পড়ত। একজনের নাম ছিল খালেকুজ্জামান খান, অপরজনের সাইফুজ্জামান খান। এরা থাকত পুরানো ৮ সেলে, বিশ সেলের উল্টো দিকে। মাঝে মাঝে ছেলে দুটো খাওয়া- দাওয়া বন্ধ করে দিত। অত্যন্ত অন্যায়ভাবে তাদেরকে যে জেলে ঢুকানো হয়েছিল বোধ হয় এভাবেই অনশন করে তারা তার প্রতিবাদ জানাত। তাদের এ বিরতি দিয়ে দিয়ে অনশনের কারণে জেল কর্তৃপক্ষ অস্থির হয়ে উঠেছিল। জেলারসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা গলদঘর্ম হয়ে তাদের অনশন ভাঙ্গানোর চেষ্টা করতেন। তখন ছেলে দুটো চিৎকার করে তাঁদেরকে বলত, টিপু সুলতান দেশপ্রেমিক ছিলেন তাই ইংরেজরা তাদের এদেশীয় দালালদের সহযোগিতায় তাঁকে হত্যা করে। তাঁর ছেলে মঈনউদ্দীনকে কলকাতায় এনে আলীপুর জেলে বন্দী করে রাখে। আরও বলত, আমার আব্বা এদেশের উন্নতির জন্য কি না করেছেন? যে দিকে তাকান তাঁর উন্নতির ছোঁয়া চোখে পড়বেই। দেশকে ভালবেসেছিলেন বলেই ভারতীয় দালালরা তাঁকে হত্যা করেছে। আর আপনারা আমাদের বন্দী করে রেখেছেন। আমাদের কিসের অপরাধ? আমরা কি অন্যায় করেছি? আমার আব্বা দেশ প্রেমিক ছিলেন এটাই কি আমাদের অপরাধ?

ছেলে দুটোর কথা ভেবে খুব খারাপ লাগত। বিশেষ করে তাদের বয়সের কথা ভেবে। খালেকুজ্জামান পরবর্তীকালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য হয়েছিল।

রাজনীতিবিদদের মধ্যে আমাদের সাথে ছিলেন এমন আরও কয়েকজনের কথা মনে পড়ছে। ঢাকার ফয়েজ বক্স, সিলেটের সিরাজউদ্দীন, এএনএম ইউসুফ, জি এ খান, নাজিরউদ্দীন চৌধুরী, মোমেনশাহীর এম এ হান্নান, কুষ্টিয়ার এডভোকেট সাদ আহমদ, আফিলউদ্দিন, ফরিদপুরের এডভোকেট বাকাউল, কুমিল্লার এডভোকেট শফিকুর রহমান, রাজশাহীর আয়েন উদ্দিন, বরিশালের মওলানা নুরুজ্জামান, বাগেরহাটের এডভোকেট ফজলুর রহমান এঁদের মধ্যে অন্যতম। তাছাড়া মালেক মন্ত্রীসভার সব সদস্যও এসময়ে আমাদের সাথে জেলে ছিলেন।

৭০- এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত সদস্য এমএন জামানও ছিলেন আমাদের সাথে। জামান আওয়ামী লীগ সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে জেলে ঢুকানো হয়েছিল। কারণ তিনি মুজিবের পাকিস্তান বিরোধী ষড়যন্ত্র পছন্দ করেননি এবং অসংখ্য বক্তৃতা- বিবৃতি দিয়ে তিনি একাত্তরে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিলেন।

সাংবাদিকদের মধ্যে দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক আখতার ফারুকের কথা মনে পড়ছে। খুলনার ডিসি রশীদুল হাসান সিএস পিও ছিলেন আমাদের সাথে। তাঁর অপরাধ ছিল খুলনায় যখন ইন্ডিয়ান আর্মি দেদার লুটতরাজ করছিল তখন মেজর জলিলের সাথে তিনিও এর প্রতিবাদ করেছিলেন। গেরিলারা ডিসি সাহেবের এই দুঃসাহসের সমুচিত জবাব দেয়ার জন্য তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। মেরে ফেলাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। ডিসি দেখতে খুব সুদর্শন ছিলেন। তাঁর সুন্দর চেহারা দেখেই হোক আর অন্য কোন কারণেই হোক গেরিলারা তাঁর প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাঁকে না মেরে জেলে ঢুকিয়ে দেয়। জেলে ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদের মধ্যে ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, ডঃ হাসান জামান, ড. কাজী দীন মোহাম্মদ. ড. মোহর আলী ও ড. মুসতাফিজুর রহমান ছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের নিজ নিজ বিষয়ে অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী। তাঁদের যোগ্যতা নিয়ে কোন সন্দেহ ছিলনা। শুধুমাত্র আদর্শের সাথে কোন আপোস না করতে পারার জন্য কারাবরণ করতে হয়েছিল।

ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ছিলেন ইংরেজীর শিক্ষক। বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজীতে তিনিই প্রথম পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন।

ইংরেজী ছাড়াও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। তাঁর সাথে কথা বলে আমার মনে হত তিনি একজন জ্ঞানতাপস। প্রফেসর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রফেসর হুমায়ুন কবির, প্রফেসর জাকির হোসেন (ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি), ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতই ছিল তাঁর মেধা ও মণীষার পরিধি।

১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর। পাকিস্তান আন্দোলনের ঐতিহাসিক যথার্থতা নিয়ে তাঁর মনে কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি মনে করতেন মুসলমানদের কল্যাণের জন্যই পাকিস্তান সৃষ্টি। মুসলমানদের সমৃদ্ধির জন্যই পাকিস্তানের টিকে থাকা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ হওয়ার পর ১৯শে ডিসেম্বর গেরিলারা এই পন্ডিত বুদ্ধিজীবীকে তাঁর নাজিমউদ্দিন রোডের বাসা থেকে নিয়ে যায়। গেরিলারা তাঁকে প্রথমে নিয়ে যায় তাঁরই সারা জীবনের কর্মস্থল ঢাকা ইউনিভার্সিটির আর্টস ফ্যাকাল্টির বিল্ডিং- এ। এ বিল্ডিং- এর কয়েকটি কক্ষে নিয়ে সারারাত গেরিলারা তাঁকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে। বেয়নেটের খোঁচায় খোঁচায় তাঁর শরীর হয়ে ওঠে রক্তাক্ত। পরের দিন ভোরবেলায় গেরিলারা তাঁকে হাত পা চোখ বাঁধা অবস্থায় নিয়ে আসে গুলিস্তান এলাকায়। প্রকাশ্য রাজপথে মেরে তাঁর লাশ ফেলে রেখে যাওয়াই ছিল গেরিলাদের উদ্দেশ্য। বেয়নেট দিয়ে তাঁর শরীরের ছয়টা স্থানে আঘাত করা হয়। ৪টা পিঠে, ২টা বুকে।

অবশেষে তাঁরা রাইফেলের বাট দিয়ে তাঁর মাথায় ও শিরদাঁড়ার উপর প্রচন্ড জোরে আঘাত করে। তিনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান। তাঁর শরীরের নিম্নভাগ চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ে। গেরিলারা তাঁকে মৃত ভেবে রাজপথে ফেলে রেখে চলে যায়। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। এসব সত্ত্বেও তিনি বেঁচে যান। গুলিস্তানে রাস্তার উপর তাঁর চারপাশে ভিড় জমে গিয়েছিল। কিন্তু গেরিলারা তাঁকে মেরেছিল এজন্য ভয়ে কেউ তাঁকে সাহায্য করতে সাহস করেনি। পাছে গেরিলারা তাঁদের উপর আবার চড়াও হয়।

এ সময় মালেক নামে মুসলিম লীগের এক তরুণ কর্মী সাহস করে তাঁকে গুলিস্তান থেকে রিকশায় তুলে নিয়ে বাসায় পৌঁছে দেয়। মালেকের বাসা সাজ্জাদ সাহেবের বাসার কাছেই ছিল। সে গুলিস্তানে সাজ্জাদ সাহেবের মৃতপ্রায় অবস্থা দেখে বিবেকের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেনি। সাজ্জাদ সাহেবের যে হাল হয়েছিল তাতে তাঁকে বাসায় রাখবার মত অবস্থা ছিল না। তাঁকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিতে হয়েছিল।

ইন্ডিয়ান আর্মি তাঁকে হাসপাতালে প্রহরা দিয়ে রাখত। পরে হাসপাতাল থেকেই তাঁকে জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। বহুদিন জেলে দেখেছি সাজ্জাদ সাহেব ঠিকমত হাঁটতে পারতেন না। সোজা হয়ে দাঁড়াতে তাঁর অসুবিধা হত। কিছুক্ষণ কারও সাথে কথা বললে অথবা কাজ করলে এত ক্লান্ত হয়ে পড়তেন যে তাঁকে আবার কিছুক্ষণ শুয়ে বিশ্রাম নিতে হত।

ড. হাসান জামান থাকতেন নিউ আট সেলে। সাজ্জাদ সাহেবকে যে জীপে করে গেরিলারা গুলিস্তান মারতে এনেছিল ঐ জীপেই হাসান জামান চোখ বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। তাঁকেও তাঁর বাসা থেকে ধরে এনেছিল। গুলিস্তানে যেখানে সে সময় কামানটা ছিল তার একদিকে গেরিলারা মেরে ফেলে রাখে সাজ্জাদ সাহেবকে অন্যদিকে হাসান জামানকে। সাজ্জাদ সাহেবের আঘাতটা যেমন গুরুতর হয়েছিল হাসান জামানের সে রকম হয়নি। মালেক হাসান জামানেরও হাত পা ও চোখের বাঁধন খুলে দিয়েছিল। মালেক সাজ্জাদ সাহেবের বাসায় নিয়ে আসার পর হাসান জামান উঠে দাঁড়ান এবং হাঁটতে হাঁটতে বায়তুল মোকাররমের দিকে অগ্রসর হন। তিনি ভেবেছিলেন মসজিদের ভিতর একটু আশ্রয় নেবেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্য ছিল অন্যরকম। কিছুদূর এগুতেই গেরিলাদের একটি জীপ তাঁর সামনে এসে পড়ে। গেরিলারা তাঁকে চিনতে পেরেই ধর ধর করে তাঁর উপর পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ তাঁর উপর চলে শারীরিক নির্যাতন। মৃতপ্রায় হয়ে পড়লে গেরিলারা তাঁকে জীপে উঠিয়ে নিয়ে মিরপুর ব্রীজের কাছে চলে যায় এবং ব্রীজের উপর থেকে নীচে ফেলে দেয়। হাসান জামান গভীর পানির মধ্যে না পড়ে কিনারার দিকে পড়েছিলেন। ওই অবস্থায় তিনি ভেসেছিলেন কিছুক্ষণ।

আশেপাশের গ্রামের লোকজন মাঠে কৃষিকাজ করতে এসে দেখে সাহেবের মত ফর্সা চেহারার একজন লোক পানিতে ভেসে আছেন। তারা এগিয়ে এসে দেখে তখনও তাঁর শ্বাস- প্রশ্বাস চলছে। গ্রামের কৃষকরা তখনই তাদের বাড়ীতে তাঁকে নিয়ে যায়। সেবা- শুশ্রষা করে, গরম দুধ খাওয়ায়। হাসান জামান আস্তে আস্তে চোখ মেলেন। আশে পাশের লোককে তিনি জিজ্ঞাসা করেন আমি কোথায়? তারা জবাব দেয় আপনি তো মিরপুর ব্রীজের নীচে পড়ে গিয়েছিলেন। তখন একে একে তাঁর সব কথা মনে পড়ে যায়।

হাসান জামান তখন সবাইকে অনুরোধ করেন মিরপুর ব্রীজের কাছে গিয়ে শিখ আর্মি দেখলে তাদের ডেকে আনতে। শিখ আর্মি আসার পর হাসান জামান তাদের সব খুলে বলেন। শিখ আর্মি তাদের তত্ত্বাবধানে তাঁকে কয়েকদিন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রাখে এবং পরে সেখান থেকে জেলে পাঠিয়ে দেয়।

জেলে এসে হাসান জামান অনেকটা নীরব হয়ে যান। সেলের ভিতর থেকে তিনি খুব একটা বের হতেন না। কারও সাথে তেমন কথাও বলতেন না। অথচ হাসান জামানের মত তরতাজা মানুষ খুবই কম দেখা যেত। ইউনিভার্সিটির তিনি ছিলেন মেধাবী শিক্ষক।

সাত সেলে সাজ্জাদ সাহেবের পাশেই থাকতেন ড. কাজী দীন মোহাম্মদ। কাজী সাহেব ছিলেন বাংলার অধ্যাপক। তাঁর সকাল বেলা ঘুমানোর অভ্যাস ছিল। জেলে একটা নিয়ম আছে সকাল বেলা মিয়া সাহেব রুমের তালা খুলে ভিতরে ঢুকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেন সেলের বাসিন্দারা বেঁচে আছেন না মরে গেছেন। এতে কাজী সাহেব খুব বিরক্ত হতেন। আসলে যে কেউ এ রকম ব্যাপারে বিরক্ত হতে পারেন। আমরা এ ব্যাপারটা সহ্য করে নিয়েছিলাম। একবার কাজী সাহেব মিয়া সাহেবের এই অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন অদ্ভুতভাবে।

একদিন সকাল বেলা মিয়া সাহেব এসে তাঁর রুমের ভেতর ঢুকে পড়লে তিনি কোন সাড়া শব্দ না করে মরার মত পড়ে থাকেন। মিয়া সাহেব যতই ডাকাডাকি করে এমনকি ধাক্কানোতেও তিনি কোন সাড়া শব্দ করেন না। মিয়া সাহেবের মনে তখন সন্দেহ হয় কাজী সাহেব কি মারা গেছেন। মিয়া সাহেব খেয়াল করে দেখে কাজী সাহেব খাটের উপর মাথা কাত করে পড়ে আছেন। শ্বাস- প্রশ্বাস চলছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তখন সে ভয় পেয়ে ডাক্তার ডাকতে যায়।

আমাকে এসে এক ফালতু খবর দেয় কাজী সাহেব মারা গেছেন। আমি হায় হায় করতে করতে সাত সেলের দিকে ছুটে যাই। গিয়ে দেখি অনেকেই কাজী সাহেবের সেলে ভিড় জমিয়েছে। ডাক্তার এসে কাজী সাহেবকে পরীক্ষা করে দেখছেন। পরীক্ষার পর ডাক্তার কাজী সাহেবকে হাসপাতালে নেয়ার কথা বলেন। এই কথা শোনার পর দেখি কাজী সাহেব ধীরে ধীরে চোখ মেলছেন। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন আমাকে হাসপাতালে নেয়ার দরকার নেই। আমি সুস্থ হয়ে গেছি। ডাক্তার ও অন্যান্য সবাই চলে যাওয়ার পর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কি হয়েছিল?

তিনি হাসতে হাসতে বললেন প্রতিদিন সকালে মিয়া সাহেব এসে বিরক্ত করে। তাকে বলেছি সেলের ভিতরে না আসার জন্য। কথা শোনেনা। তাই আজকে মরার ভান করে পড়েছিলাম। দেখি এতে এদের হুঁশ হয় কিনা। বুঝলাম কাজী সাহেব শুধু ভাষা ও সাহিত্যের সমঝদার নন, রসিকও বটেন। পরে শুনেছিলাম মিয়া সাহেব কাজী সাহেবের সেলের সামনে এসে সাবধান হয়ে যেত।

২০

জেলে আসার প্রায় আটমাস পর একদিন খবর পেলাম আদমজী মিলের কমার্শিয়াল চীফ ম্যানেজার লুৎফর রহমান ইঞ্জিনিয়ারসহ কয়েকজন কর্মকর্তাকে জেলে ঢুকানো হয়েছে। লুৎফর রহমানকে ব্যক্তিগতভাবে আমি চিনতাম। তিনি আমাকে বললেন, আব্দুল আওয়ালও এসেছেন। এই আওয়ালের কথা একবার লিখেছি যে মুজিব ও আদমজীর মধ্যে বন্ধনের কাজ করতেন তিনি। আওয়াল জায়গা পেয়েছিলেন পুরনো আট সেলের পাগলা গারদের খুব কাছাকাছি। একদিন আওয়ালের সাথে দেখা করতে গেলাম। আওয়াল তো আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু আমার কাছে তাঁকে এবার একটু অন্যরকম মনে হল। তিনি কথা বলছিলেন অনেকটা অসংলগ্নভাবে। হঠাৎ করে বললেন, ইব্রাহিম ভাই আপনাকে একটা কথা বলি শোনেন। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে যদি কিছু লোকের ভিড় দেখেন এবং আপনি ভিড়ের মধ্যে যেয়ে দেখেন মুজিবের লাশ পড়ে আছে, কেমন হবে?

আমি বললাম আওয়াল তুমি এসব কথা কেন বলছ? মুজিব এখন দেশের হর্তাকর্তা। তুমি আছ জেলে। এখন এসব কথা বলা ঠিক নয়।

আওয়াল বললেন মুজিবের এরকমই শাস্তি হওয়া উচিত। দেখছেন না আমাকে রেখেছে পাগলা গারদের কাছে। ওরা আমাকে পাগল বানাতে চায়। আমি তো কোন অন্যায় করিনি অথচ আমাকে জেলে ঢুকিয়েছে। মুজিবের জন্য আমি কি না করেছি? আপনি তো জানেন সব কাহিনী। ইব্রাহিম ভাই আপনার কাছে সিগারেট আছে? আমি বললাম ওসব কিছু নেই। তিনি তখন বললেন ইব্রাহিম ভাই আপনি নাকি ম্যানেজার? আপনি আমাকে খাওয়াবেন তো? আমি বললাম তোমাকে খাওয়াব না তো কাকে খাওয়াব? তখনকার মত আওয়ালের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলেও আমি মাঝে মাঝে তাঁর খবর নিতাম। বিশেষ করে আমার একটা কৌতুহল ছিল কেন মুজিব তাঁকে জেলে পাঠালেন। প্রথমদিকে আওয়ালের মধ্যে যে অপ্রকৃতিস্থ ভাব ছিল তা ধীরে ধীরে কমে আসতে শুরু করেছিল। আমার মনে হয় প্রথম প্রথম জেলে আসার ধকলটা তিনি সহজে নিতে পারেননি।

আওয়ামী লীগ ও তাঁর সহযোগীদের জেলে আসার কারণ খুঁজতে গিয়ে এক দীর্ঘ কাহিনীর সন্ধান পেলাম। লুৎফর রহমান নিজেই আমাকে এ ব্যাপারে কিছুটা আভাস দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ হওয়ার পর আওয়ামী লীগের বড় নেতা থেকে পাতি নেতা পর্যন্ত সবাই অবাঙ্গালীদের সম্পত্তি ও টাকা- পয়সা হাতানোর

এক অরুচিকর প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছিল। আদমজীরা ছিল তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে প্রভাবশালী শিল্পপতি। স্বভাবতই আদমজীদের বিরাট সম্পত্তির দিকে আওয়ামী নেতাদের ঝোঁকটা পড়ে থাকবে। এ ব্যাপারে মুজিব পরিবারও পিছিয়ে ছিল না।

আদমজী গ্রুপের প্রধান অফিস ছিল মতিঝিলের আদমজী কোর্টে। এখানেই আদমজী পরিবারের হানিফ আদমজী বসতেন। পূর্ব পাকিস্তানে আদমজী গ্রুপের সমস্ত প্রতিষ্ঠান তিনিই দেখাশোনা করতেন। বাংলাদেশ হওয়ার পর আদমজীর বিশাল সম্পত্তি অরক্ষিত হয়ে পড়ে। তাদের অনেকেই দিশেহারা হয়ে দেশ ত্যাগ করেন। ফলে এসব সম্পত্তি পুরোপুরি আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের নিয়ন্ত্রণের চলে যায়। পরে অবশ্য মুজিব সরকার আদমজী গ্রুপের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান আদমজী জুট মিল জাতীয়করণ করে। তখনকার মত এসব প্রতিষ্ঠান সমাজতন্ত্রের নামে দেদারসে জাতীয়করণ করে মুজিব দলীয় নেতা ও কর্মীদের লুটপাটের প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধা দিয়ে দেন।

এই হরি লুটের যুগে মতিঝিলের আদমজী কোর্ট চলে যায় আব্দুল আওয়ালের নিয়ন্ত্রণে। আমদজী কোর্টের ভিতরে ছিল আদমজীদের স্ট্রংরুম। আওয়াল জানতেন। কি করে মুজিব পরিবারের কাছেও সে খবর পৌঁছেছিল। মুজিব পরিবার ভেবেছিল আওয়াল যদি আদমজীদের স্ট্রংরুম ভাঙ্গে তাহলে তার ভিতর গচ্ছিত টাকা- পয়সার একটা অংশ অবশ্যই তাদের দেয়া হবে। মুজিব পরিবার আওয়ালের গতিবিধি সন্দেহের চোখে দেখত। আওয়ালকে নজরে রাখার জন্য লুৎফর রহমানকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

কিন্তু আওয়াল ছিল অত্যন্ত ধূর্ত। তিনি লুৎফর রহমান ও আদমজী কোর্টের কয়েকজনকে বুঝিয়ে নিজের দলে ভাগিয়ে নেন এবং আদমজীদের স্ট্রংরুম ভেঙ্গে সবকিছু হাতিয়ে নিতে উদ্যত হন।

এই স্ট্রংরুমের মধ্যে ছিল আদমজীদের তাল তাল সোনা। মুজিব পরিবার তার লোকজনের মারফত আওয়ালের এই সোনা লুটের খবর পেয়ে যায়। তারা আওয়ালের উপর অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীতে আওয়ালকে জেলে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। আওয়ালের হঠাৎ আওয়ামী বিরোধীতার এটাই ছিল কারণ। পরে জেলে বসেই আওয়াল জাসদ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন এবং জেলে বসেই তিনি ৭৩ সালে আরও একবার খবরের শিরোনামে চলে এসেছিলেন। ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসে অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনগুলোতে কর্ণেল তাহের তাঁকে জেল থেকে বের

করে এনে খন্দকার মোশতাকের পরিবর্তে তাঁকে রাষ্ট্রপতি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে ইচ্ছায় সেদিন বাধ সাধেন জিয়াউর রহমান।

এসময় জেলে আরও দু'জন নতুন রাজবন্দী আসেন। একজন টিপু বিশ্বাস অন্যজন আব্দুল ওয়াহেদ। চিন্তা ভাবনায় এঁরা দুজনই ছিলেন পাকা কমিউনিস্ট। মুজিবের দুঃশাসন ও অপকীর্তির প্রতিবাদ করাই ছিল এঁদের একমাত্র অপরাধ। রাজশাহীর আত্রাই থেকে ধরে এনে প্রথমে পুলিশী হেফাজতে নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয় এঁদের ওপর। তারপর অসুস্থ্য অবস্থায় এঁদের দুজনকে জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তাঁদের শরীর জুড়ে নির্যাতনের চিহ্ন ছড়িয়ে ছিল। বহুদিন দুজনকে অসুস্থ অবস্থায় জেলের ভিতর দেখেছি, ঠিকমত হাঁটতেও পারতেন না। সবুর সাহেব নিজের পয়সা খরচ করে এঁদের জন্য কয়েকবার ওষুধ ও পথ্য আনিয়ে দিয়েছিলেন। জেল কর্তৃপক্ষ এঁদের চিকিৎসার জন্য কোন আগ্রহ দেখায়নি। বোধ হয় উপরের নির্দেশ ছিল।

টিপু বিশ্বাস ও আব্দুল ওয়াহেদকে রাখা হয়েছিল আট সেলে। যদিও তাঁদেরকে কোন ডিভিশন দেয়া হয়নি। সেলে রাখার কারণ কর্তৃপক্ষ তাঁদেরকে পৃথকভাবে রাখতে চেয়েছিলেন। আমি ম্যানেজার হিসেবে তাঁদেরকে মাঝে মাঝে ডিভিশনের খাবার পাঠাতাম। এ নিয়ে জেলার একদিন আমাকে অনুযোগ করে বললেন ইব্রাহিম সাহেব এঁরাতো ডিভিশন প্রিজনার না। তখন আমি বললাম সেটা ঠিক তাঁরা ডিভিশন প্রিজনার না কিন্তু তাঁরা দেশপ্রেমিক। তাঁরাওতো মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। তাহলে অসুবিধা কি? জেলার সাহেব আর কথা বাড়াননি।

একদিন জেলের মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতা ও আমার পাড়ার ছেলে মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার সাথে দেখা। আমি তো তাকে দেখে হতবাক। আওয়ামী লীগের যুগে মায়া জেলে আসবে ভাবতেও পারিনি। আমি তাকে বললাম, কি মায়া, তুমি আমাদের দেখতে এসেছ নাকি? সে বলল না দুলাভাই তোফায়েল আমাকে ষড়যন্ত্র করে জেলে ঢুকিয়েছে। আপনার খবর সব আমি রাখি। জেলে বসে আপনি ম্যানেজারী করছেন শুনেছি। এখন আপনি আমাকে দেখে শুনে রাখবেন।

মায়া আমার শ্যালক সাধনের বন্ধু। সেই সূত্রে সে আমাকে আগে থেকে দুলাভাই ডাকত। এখন মায়াকে জেলে দেখে বুঝলাম নতুন দেশ আওয়ামী লীগ নেতাদের সোনার বাংলা গড়ার প্রতিযোগিতা কি রকম চলছে। এতদিন তারা পশ্চিম পাকিস্তানীদের গালি দিয়েছে আর এখন নিজেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করেছে।

১৯৭৩ সালের শুরুতে এসে কর্তৃপক্ষ আমাকে ফেনী জেলে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিল। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ১৯৭১ সালের উপনির্বাচনে অংশ নিয়েছি। আমার নির্বাচনী এলাকা ছিল ফেনী। তাই কর্তৃপক্ষ পণ করেছিল আমার বিচার ফেনীতে হওয়াই সঙ্গত।

একদিন খুব সকালে জেলারের সাথে আর একজন সাদা পোষাকধারী পুলিশ এসে হঠাৎ আমাকে বলল, আপনি রেডি হয়ে নিন, আপনাকে ফেনী যেতে হবে। আপনার বিচার ওখানেই হবে। এভাবে হঠাৎ করে পূর্বাপর কিছু ইঙ্গিত না দিয়ে ফেনী যাত্রার নির্দেশে ইতস্তত বোধ করলাম। কিন্তু বন্দী হিসেবে এ নির্দেশ অবহেলা করার ক্ষমতা আমার ছিল না।

এদিকে আমার এ অবস্থা দেখে ফজলুল কাদের চৌধুরী, খাজা খয়েরুদ্দীন ও সবুর সাহেব বের হয়ে এলেন। আমি তাঁদের সব কথা বললাম। ফজলুল কাদের চৌধুরী তো হাহুতাশ শুরু করে দিলেন। ইব্রাহিম তুমি চলে গেলে কি হবে। আমাদের এত যত্নে করে কে খাওয়াবে? এতদিন সুখে- দুঃখে এক সাথেই ছিলাম।

জেলের ভিতরে এতসব বন্ধু- বান্ধবের সাহচর্যে এসে সব দুঃখ কষ্ট ভুলতে পেরেছিলাম। অন্ততঃ এইটুকু উপলব্ধি করতাম যে এঁরা সবাই আমার আদর্শিক ভাই। একটা আদর্শের স্বপক্ষে লড়াই করতে গিয়ে আমরা এই কষ্টকে হাসিমুখে গ্রহণ করেছি। তাই হঠাৎ করে এইসব প্রিয় মুখকে বিদায় দিতে খুব কষ্ট হচ্ছিল।

জেলের ভিতর আমার যে সামান্য জিনিসপত্র ছিল তাই নিয়ে আমি বের হয়ে আসলাম। বাইরে আমার জন্য পুলিশের জীপ দাঁড়িয়ে ছিল। চারজন পুলিশসহ আমি সেই জীপে উঠে বসলাম। তখন আনুমানিক সকাল ১০টা। ফজলুল কাদের চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বললাম কাদের ভাই দোয়া করবেন। আর কবে দেখা হবে কিছুই বুঝতে পারছি না।

ফজলুল কাদের চৌধুরীর সাথে এই আমার শেষ দেখা। নোয়াখালী জেলে বসেই শুনেছিলাম তাঁর নির্মম ও ষড়যন্ত্রমূলক হত্যার কাহিনী। জীপে উপবিষ্ট পুলিশ ইন্সপেক্টরকে বললাম ভাই আপনারাতো আমাকে হঠাৎ করেই নিয়ে চলেছেন। আমাকে একটু অল্প সময়ের জন্য বাসায় নিয়ে চলুন। না হলে ওরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়বে। ওদের একটু বলে যেতে চাই। ইন্সপেক্টর বললেন এটাতো ইলিগ্যাল (illegal), আর তাছাড়া জানাজানি হলে আমাদের অনেক অসুবিধা হতে পারে। আমি তাঁকে অনেক কাকুতি- মিনতি করে অনুরোধ করলাম। বললাম আইজি আব্দুর রহীম আমার আত্মীয়। তাছাড়া তখন তিনি ক্যাবিনেট ডিভিশনে কর্মরত ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম আপনার কোন অসুবিধা হলে আইজি

সাহেবকে বলব। আপনি আমাকে নিয়ে চলুন। আমার কথায় পুলিশ ইন্সপেক্টর প্রভাবিত হলেন বুঝতে পারলাম।

ইন্সপেক্টরের নির্দেশে গাড়ী ঘুরানো হল। আমি আমার বাসায় এলাম আমাকে দেখে আশে পাশের অনেকে ছুটে এল। বাচ্চারা আব্বা আব্বা বলে জড়িয়ে ধরল। নিজের বাড়ীতে নিজের বহু পরিচিত পরিবেশে ক্ষণিকের জন্য হলেও সমস্ত দুর্ভোগের কথা ভুলে গেলাম।

মিনিট বিশেকের জন্য আমাকে বাসায় রাখা হয়েছিল। এত অল্প সময়ের মধ্যেও আমার স্ত্রী আমার জন্য প্রচুর খাবার তৈরী করেছিল। সেগুলোর ভাগ পুলিশরাও পেল। তাছাড়া আসবার সময় কিছু টাকাও সে আমার হাতে দিয়ে দেয় পথ খরচের জন্য।

আমার আকস্মিক উপস্থিতিতে বাচ্চারা যেভাবে আনন্দে মশগুল হয়ে উঠেছিল আমার বিদায়ে তারা ততধিক শোক বিহ্বল হয়ে উঠল। তাদের বুক ফাটা কান্নায় চারদিকের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। সেই ভারী বাতাসের ভিতর দিয়ে আমি পুনরায় পুলিশের জীপে উঠে বসলাম।

ইন্সপেক্টর আমাকে বললেন আপনাকে এখন রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্পে রাখা হবে। রাতে আমার জন্য ট্রেনের প্রথম শ্রেণী রিজার্ভ করা হয়েছে। সন্ধ্যার পর আমরা ফেনী রওনা হব। বাসায় আমার স্ত্রীকে সেইভাবে বলে এসেছিলাম বিকেলে যেন সবাই মিলে আমার সাথে যেয়ে দেখা করে।

রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্পে সারাদিন কাটল। দুপুরে পুলিশের লোকেরাই খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। পুলিশ ক্যাম্পে বসে বসে ভাবছিলাম, মানুষের ভাগ্য কখন কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় কেউ বলতে পারে না।

বিকেলে ছেলেমেয়েদের সাথে নিয়ে আমার স্ত্রী দেখা করতে এল। কারাবন্দীদের সাথে যখন তাদের স্ত্রীরা দেখা করতে আসে তখন একটা অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। জেলগেটে এরকম দৃশ্য অহরহ মেলে। বন্দী যেমন অনেক দিন ধরে অনেক কথা সঞ্চয় করে রাখে তাদের স্ত্রীরাও জমা করে রাখে অনেক অনুক্ত কথা। কিন্তু বন্দীদের সাথে স্ত্রীদের দেখা হওয়ার পর অনেক না বলা কথার প্রকাশ ঘটে নিঃশব্দ চোখের পানিতে।

স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার সাথে সাথে আমি প্রস্তুত হতে শুরু করলাম। ইন্সপেক্টর তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে আমাকে সাথে করে কমলাপুর রেল স্টেশনে পৌঁছালেন। শঙ্কা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ট্রেনের কমপার্টমেন্টে উঠে বসলাম।

ট্রেন চলতে শুরু করল। বন্দীর চোখে এমনিতেই ঘুম থাকে না। তারপর ট্রেন যাত্রার ঝাক্কি। ভৈরবে এসে গাড়ী থেমে গেল। যুদ্ধের সময় মেঘনা ব্রীজ উড়িয়ে দিয়েছিল গেরিলারা। ভৈরব থেকে নেমে যাত্রীরা নৌকায় পার হয়ে অপর পার থেকে ট্রেন ধরত। সেই রাতে পুলিশ আমাকে নিয়ে নৌকায় উঠল। ঢেউয়ের প্রমত্ততার মুখে আমাদের ছোট নৌকাটি প্রচন্ড দুলতে লাগল। মনে শঙ্কা জেগে উঠল। নদী পার হওয়া সম্ভব হবে কিনা। এক অজানা আশঙ্কায় পুলিশের লোকেরাও ভয় পেয়ে গিয়েছিল বন্দীকে আজ পার করে যথাস্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে কিনা।

প্রমত্ত মেঘনা পাড়ি দিয়ে অবশেষে যখন আমরা তীরে পৌঁছলাম তখন সবাই আমরা ক্লান্ত। ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিলাম ট্রেনের কমপার্টমেন্টে। ঘুম থেকে উঠতে দেরী হয়েছিল। পুলিশের ডাকাডাকিতে বুঝলাম ট্রেন ফেনীতে পৌঁছেছে। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করলাম এই ভেবে মেঘনার উপর রীতিমত আজরাইলের সাথে কোলাকুলি করে এসেছি। ফেনী রেল স্টেশনের ওয়েটিং রুমে বসে নাশতা শেষ করে পুলিশকে বললাম চলুন এবার যাওয়া যাক। জেলখানায় পৌঁছানোর পর আমাদের প্রথম দেখা করতে হল জেলারের সাথে। মহকুমার জেলখানা হিসেবে এটার আয়তন ছিল খুবই ছোট। জেলার আমাকে বললেন আপনি তো ডিভিশন প্রিজনার। আমাদের এখানে তো ডিভিশনের ব্যবস্থা নেই। আপনাকে যেতে হবে নোয়াখালীতে। পুলিশ উপায়ান্তর না দেখে আমাকে নিয়ে গেল মহকুমা পুলিশ অফিসারের বাংলোয়। ভদ্রলোক আমার সাথে খুবই সৌজন্যমূলক আচরণ করলেন। উপরন্তু তিনি বললেন ফেনী থেকে আপনি নির্বাচিত হয়েছেন। আপনি তো অবশ্যই সম্মানিত লোক। তিনি আমাকে পেট পুরে ভাত খাওয়ালেন। তারপর নিজের গাড়ী দিয়ে পুলিশদের বললেন আমাকে নোয়াখালী নিয়ে যেতে। নোয়াখালী জেলে পৌঁছেছিলাম ওই দিন বিকেল তিনটার দিকে। জেলা শহরের জেলখানা ঢাকা জেলের মত হওয়ার কথা নয়। আয়তনে ছোট। ধারণক্ষমতা পাঁচশর মত। কিন্তু এখানেও নতুন সরকার দেড় হাজারের মত অতিরিক্ত কয়েদী ঢুকিয়ে দিয়েছে। এরা অবশ্য পাকিস্তানপন্থী।

আমার ডিভিশনের ব্যবস্থা হয়েছিল একটা টিনশেড বিল্ডি- এ। নোয়াখালী জেলে তখন এরকম লম্বা লম্বা কয়েকটি টিনশেড বিল্ডিংয়ে বন্দীরা থাকত। জেলের ভিতর ঢুকে দেখি ডিভিশনে নোয়াখালীর মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামীর কয়েকজন নেতা রয়েছেন। এঁদের অনেকেই আমার পূর্ব পরিচিত। আমার আসবার

খবর তাঁরা আগেই কিভাবে পেয়ে গিয়েছিলেন। তাই তাঁরা আমাকে পেয়ে তাদেরই একজন হিসেবে কাছে টেনে নিতে মোটেই দেরী করেননি।

নোয়াখালী জেলে একটা জিনিস বিশেষ ভাবে নজরে এল। জেলে অধিকাংশ বন্দীকেই দেখলাম শশ্রুমন্ডিত, মাথায় টুপি। এঁরা সবাই আলেম, ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে এঁদের জোরালো দখল রয়েছে। রাজনীতির সাথে এঁদের সংশ্লিষ্টতা খুব একটা ছিল না। শুধুমাত্র ইসলামপন্থী হওয়ার অপরাধে এঁদেরকে জেলে আসতে হয়েছিল।

রাতে নোয়াখালী জেলের চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে যেত। প্রত্যেকটি রুম থেকে জিকিরের শব্দ আসত। মনে হত পুরো নোয়াখালী জেল দরবেশের হুজরাখানায় পরিণত হয়েছে। ডিভিশনে আমার পাশের সিটেই থাকতেন মওলানা রুহুল আমীন আতিকী। আতিকী সাহেব ছিলেন দীর্ঘদেহধারী। ৬ফুটের চেয়েও লম্বা। ইসলামের যে কোন বিষয়ের উপর দীর্ঘ সময় ধরে অনলবর্ষী বক্তৃতা দিতে পারতেন তিনি।

নোয়াখালী জেলে এসময় আটক হয়ে এসেছিলেন মওলানা মুহাম্মদ মুসা। সবাই তাঁকে পীর হিসেবে শ্রদ্ধা করতেন। তখন তাঁর বয়স ৯০ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চোখের জ্যোতি ছিল অত্যন্ত প্রখর। খালি চোখেই তিনি কোরআন শরীফ পড়তেন আর সারারাত কাটাতেন ইবাদত- বন্দেগীতে। তাঁকে নিয়ে অনেক কথা শুনেছি। তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির কথাও লোকে বলাবলি করত।

মওলানা মুসাকে প্রথম আটক করে নেয়া হয়েছিল ফেনী জেলে। এখানে এক পুলিশ তাঁর সাথে বেয়াদবী করেছিল। যার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল অদ্ভুত রকম। কিছুই দৃশ্যমান হত না অথচ কেউ যেন পুলিশটিকে থাপ্পড় মারছে। কাঁদার মধ্যে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। তাদের জিনিসপত্র উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এরকম ঘটনা ঘটতে লাগল, সেই পুলিশের তখন কাজ করাই এক বড় রকম সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

লোকের মধ্যে গুঞ্জন শোনা গেল মওলানা মুসার পোষা জ্বীনগুলোই রেগে গিয়ে এরকম ঘটনা ঘটাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ তখন অসহায় হয়ে এবং জেলের নিরাপত্তার কথা ভেবে মওলানা মুসাকে নোয়াখালী জেলে স্থানান্তর করে।

জেলের মধ্যে মুসলিম লীগ কর্মী খোকা মিয়া সব সময় আমাদের হাসি-খুশীতে রাখার চেষ্টা করতেন। তাঁর ভাই নুরুল হক ছিলেন তখন আওয়ামী লীগ এমপি। খোকা মিয়া সুন্দর গান জানতেন। সুরেলা গলায় গান গেয়ে গেয়ে তিনি পুরো জেল মাতিয়ে রাখতেন। মুজিবের নামে তিনি কতগুলো প্যারোডি তৈরী

করেছিলেন। খোকা মিয়ার প্যারোডি জেলের সেই দুর্ভাগ্যের দিনগুলোতে আমাদেরকে দারুণ উৎসাহ জোগাত।

নোয়াখালী জেলে আর যাঁদের কথা মনে পড়ছে তাঁদের মধ্যে হাকিম মোঃ ইলিয়াস, আব্দুল্লাহ রফিক আবু সুফিয়ান, এডভোকেট শামসুল হক, এডভোকেট সিদ্দিকুল্লাহ, এডভোকেট আব্দুল ওহাব ছিলেন অন্যতম। অন্য সবার মত এদেরও অপরাধ, এঁরা ছিলেন পাকিস্তানপন্থী।

আমি নোয়াখালী আসার মাস দুয়েক পর কমরেড নাসিম নামে কমিউনিস্ট পার্টির একজন তরুণ কর্মী গুলিবিদ্ধ অবস্থায় জেলে আসেন। তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির গোপন সংগঠনের একজন সক্রিয় কর্মী। আমি এতদিন পর যতটুকু মনে করতে পারছি রাজনৈতিকভাবে তিনি তোয়াহার চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। নাসিম ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন ইউনিভার্সিটির মাস্টার্স। কমিউনিস্ট পার্টির এই ধারার লোকজনরা কখনই বাংলাদেশ আন্দোলনকে সমর্থন করতেন না। তাঁরা মনে করতেন এটা হচ্ছে ভারতীয় চক্রান্তের একটা রূপ এবং এটা যথাযথভাবে রোখা প্রয়োজন। তাঁরা রাজনীতি করতেন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির ব্যানারে।

নাসিম নোয়াখালীর বিভিন্ন গ্রামে এসময় পাকিস্তানের পতাকা ওড়ান। বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদ অফিসেও তিনি একই কাজ করেন। তিনি তাঁর ক্যাডার বাহিনী নিয়ে ঘোষণা দিয়েছিলেন আমরা এই স্বাধীনতা মানি না। আরও অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন ভারতীয় আধিপত্যবাদ থেকে এদেশকে রক্ষা করতে হবে। মুজিবের শাসনামলে এটা ছিল একটা দুঃসাহসিক কাজ। একবার এক ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে তিনি পাকিস্তানী পতাকা ওড়ানোর সময় ধরা পড়েন এবং উরুতে গুলিবিদ্ধ হন। তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন ঐ ইউনিয়ন পরিষদের আওয়ামী লীগ সমর্থক চেয়ারম্যান।

নোয়াখালী জেলে যখন নাসিমকে আনা হয় তখন তাঁর উঁরুতে পচন ধরেছিল। জেলে আগে থেকেই নাসিমের সহযোদ্ধা মাস্টার মজিদ ছিলেন। তিনিই আমাদের ধরে নাসিমকে দেখাতে নিয়ে যান। গিয়ে দেখি দুর্গন্ধে নাসিমের কাছে যাওয়া যাচ্ছে না। জেল কর্তৃপক্ষ নাসিমের কোন চিকিৎসার ব্যবস্থাই করেনি। এমনকি বাইরে থেকে পাঠানো ওষুধপত্রও জেল কর্তৃপক্ষ ভিতরে নেয়ার অনুমতি দেয়নি।

এভাবেই ধুঁকে ধুঁকে বিনা চিকিৎসায় জেলের মধ্যে নাসিম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তাঁর সহযোদ্ধারা বিশেষ করে মাস্টার মজিদ এতে খুব উত্তেজিত

হয়ে ওঠেন। জেলের মধ্যেই লাশের সামনে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে তিনি বলতে থাকেন দেখবেন এর প্রতিশোধ আমি নেবই। আগামী তিনদিনের মধ্যেই আমি প্রতিশোধ নেব।

তখনকার মত মাস্টার মজিদের কথার গুরুত্ব আমি অতখানি গভীরভাবে বুঝতে পারিনি। ওইদিন রাতে দুটোর সময় হঠাৎ শুনি জেলের মধ্যে পাগলা ঘন্টা। চারিদিকে হৈ চৈ। পুলিশের চিৎকার। নিরপরাধ কয়েদীদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ। এর মধ্যে শুনতে পেলাম মাস্টার মজিদ টয়লেটের ভিতর দিয়ে কিভাবে যেন বের হয়ে গিয়ে জেলের দেয়াল টপকে পালিয়ে গিয়েছেন।

আমার জন্য আরও বিস্ময়ের বাকী ছিল। মাস্টার মজিদ পালিয়ে গিয়ে বসে থাকেননি। তিনি কমরেড নাসিমকে যে চেয়ারম্যান ধরিয়ে দিয়েছিল নিজের দলবল নিয়ে তাকে হত্যা করে কথা রেখেছিলেন। মাস্টার মজিদ তারপর সেই ইউপি চেয়ারম্যানের বুক চিরে হৃদপিন্ড বের করে সেটাকে সুন্দর করে প্যাকেট করে জেলখানায় পাঠিয়ে দেন। মজিদের কোন এক লোক কোন এক কয়েদীর নামে খাবার পাঠানোর ওসিলায় জেলের ভিতর সেই হৃদপিন্ডের প্যাকেট ঢুকিয়ে দেয়। প্যাকেট খুলে পরে দেখা গেল ইউপি চেয়ারম্যানের হৃদপিন্ড, পাশে মজিদের হাতের লেখা একটা চিরকুট, আমি প্রতিশোধ নিয়েছি।

নোয়াখালী জেলে আমি প্রায় নয় মাস ছিলাম। নিস্তরঙ্গ জেল জীবনে দিন চলে যেত সবার সাথে গল্প- গুজব করে আর নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। বাংলাদেশ হওয়ার পর সারাদেশ জুড়ে যে নারকীয় বর্বরতা শুরু হয়েছিল তা থেকে নোয়াখালীও বাদ পড়েনি। আমি এখানে এসেও সেই বর্বরতার কিছু আভাস পেয়েছিলাম।

ছাগলনাইয়া থানায় ইউপি চেয়ারম্যান ও মুসলিম লীগ নেতাকে ধরে নিয়ে শুধু নির্যাতনই করেনি, পানুয়া মাঠের মধ্যেই তাঁকে দিয়ে নিজ হাতে নিজের কবর খুঁড়িয়ে তার মধ্যে তাঁকে জোর করে নামিয়ে মাটি চাপা দিয়ে জ্যান্ত কবর দেয় আওয়ামী লীগাররা।

নজরুল ইসলাম নামে একজন মুসলিম লীগ কর্মীকে মুক্তিযোদ্ধারা প্রথমে ধরে নিয়ে সারা শরীরে খেজুরের কাঁটা ফুটিয়ে জয় বাংলা উচ্চারণ করতে বলে। নজরুল ইসলাম ছিলেন সুসাহিত্যিক এবং মনে- প্রাণে পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী। তিনি জয় বাংলা বলতে অস্বীকার করায় তাঁকেও নিজের কবর খুঁড়তে বাধ্য করা হয় এবং খেজুরের ডাল দিয়ে পিটতে পিটতে জ্যান্ত কবর দেয়া হয়। ফেনী কলেজে ইলিয়াস নামে ইসলামী ছাত্র সংঘের একজন শক্তিশালী ছাত্র নেতাকে একইভাবে

দাগন ভূইয়া কামাল আতাতুর্ক স্কুলের সামনে জনসম্মুখে গুলি করে হত্যা করে নিজেদের পৈশাচিক ক্ষুধা পূর্ণ করে আওয়ামী লীগাররা।

ইলিয়াসকে জয় বাংলা বলতে নির্দেশ দিলেও সে তা উচ্চারণ করতে অস্বীকার করে। একইভাবে গেরিলারা চৌমুহনী কলেজের বাংলার অধ্যাপককে কলেজ প্রাঙ্গণেই গুলি করে হত্যা করে।

বাংলাদেশ হওয়ার পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন নাগের নেতৃত্বে নোয়াখালীতে বহু আলেম ও মুহাদ্দিসকে ধরে নিয়ে লাইন বেধে গুলি করে হত্যা করা হয়। আমি প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে শুনেছি বহুদিন ধরে একটি খাল আলেম ওলামাদের লাশে পূর্ণ ছিল।

নোয়াখালী আসার কয়েকদিন পর জেলে ডিসি সাহেব আসলেন। এটা ছিল তাঁর রুটিন ভিজিটের অংশ। ঢাকা থেকে একজন বড় দালাল এসেছে শুনে তিনি বেশ কৌতুহলী হয়ে আমার সাথে দেখা করতে এলেন। তাঁর সাথে ছিলেন একজন হিন্দু এডভোকেট। আমাকে জিজ্ঞাসা করার আমি বললাম ফেনী থেকে আমি উপনির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলাম। সেই অপরাধে এখন জেল খাটছি। তিনি বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর যথাসম্ভব নিজেকে সহজ করে বললেন, দেশের অবস্থা কেমন মনে হচ্ছে?

আমি বললাম, আমরা দালাল হিসেবে বন্দী হয়েছি। আমাদের কথার কতটুকুই বা মূল্য আছে এখন। তবে মুসলমান হিসেবে এইটুকু বলতে পারি কোন কিছুই দুনিয়ায় স্থায়ী নয়। কোরআন শরীফে আছে, আল্লাহ ক্ষমতা দেয়ার মালিক, ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়ারও মালিক। শেখ মুজিবও একসময় জেলে ছিলেন। আমরা ক্ষমতায় ছিলাম। এখন অবস্থাটা পাল্টে গেছে। নতুন কোন বিপ্লব আবার সবকিছু মিছমার করে দেবে না একথা কেউ কি নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারেন? ডিসি বললেন জেলে বসে আপনি এসব কি বলছেন! আমি বললাম, এগুলো আমার কথা নয় ডিসি সাহেব, কোরআনের কথা।

হিন্দু এডভোকেট তখন বললেন, হ্যা, এসবতো তাঁর কথা নয়, নিজে কিছু বানিয়ে বলেননি, আপনাদের ধর্মগ্রন্থের কথাই বলেছেন। আসলে তো তাই, কেউ বলতে পারে না ভবিষ্যতে কি হবে। আমি বললাম, ডিসি সাহেব আল্লাহ নিজেই অঙ্গীকার করেছেন তাঁর মনোনীত ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করবে তিনি তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবেন।

ডিসি বোধ হয় আমার খোলামেলা কথা শুনে আর আলাপ জমাতে উৎসাহ পেলেন না। তিনি আমাকে হাসি মুখে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন।

নোয়াখালী জেলে বসেই আমি একদিন ফজলুল কাদের চৌধুরীর হত্যার কথা কাগজে পড়ি। আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছে জাতির এই একনিষ্ঠ সেবককে আওয়ামী লীগের ষড়যন্ত্রকারীরা বিষপ্রয়োগে জেলের ভিতরেই মেরে ফেলতে পারে। তাঁর সাথে আমার বহু স্মৃতি ও এক সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল। সেগুলো আমার মনের পর্দায় উজ্জ্বল হয়ে ভেসে উঠতে শুরু করল।

২১

১৯৭৩ সালের ২৬ নভেম্বর আমি জেল থেকে মুক্তি পাই। মুক্তি পাওয়ার আগে আমাকে কোর্টে নেয়া হয়। আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তা আইনের দৃষ্টিতে ছিল নিতান্তই ঠুনকো। জিপি ইসমাইল ছিলেন আমার বিশেষ বন্ধু। কোর্টে তিনি আমাকে দেখে একেবারেই অবাক। এজলাসে তিনি আমাকে সবার সামনে বুকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন দোস্ত এখানে কেন? আমি বললাম, তোমার কোর্টে আজ আসামী হিসেবে হাজির হয়েছি। উপনির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলাম সেই অপরাধে সরকার আমাকে অভিযুক্ত করেছে। ইসমাইল আমার কেসের নথিপত্র পড়েছিলেন কিনা জানিনা। তিনি বললেন, তোর আবার কি হবে! তোর বিরুদ্ধে কোন ক্রিমিন্যাল কেস নেই। এসব রাজনৈতিক অভিযোগ ধোপে টেকে না।

জিপি ইসমাইলের সাথে আমার মাখামাখি কোর্ট ভর্তি লোক চেয়ে দেখছিল। জজ ছিলেন হিন্দু। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন কেন? আমি বললাম আমি একটা আদর্শে বিশ্বাস করি। তরুণ বয়স থেকেই আমি এই আদর্শের পক্ষে কাজ করে আসছি। সে আদর্শ রক্ষার জন্যই আমি নির্বাচন করেছি।

আমার বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ যেসব সাক্ষী ঠিক করেছিল তারা আমার পক্ষেই সাক্ষী দেয়। আওয়ামী লীগ এমপি সাংবাদিক এবিএম মূসা আমার পক্ষে জোরালো বক্তব্য দেন। আমি কোন Criminal Offence করিনি। রাজনৈতিক কারণেই বন্দী হয়েছি।

এভাবেই আমার বিরুদ্ধে মুজিব সরকারের রুজুকৃত মামলা- নাটকের পরিসমাপ্তি হয়। সেই সাথে আমার জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়েরও যবনিকাপাত ঘটে।

জেল থেকে বের হয়ে আমরা এককালে যা আশঙ্কা করেছিলাম, দেশ জুড়ে তারই রূঢ় প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলাম। দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতিতে দেশের মানুষ দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। দু'আনা চাল চার আনা ঘির প্রতিশ্রুতি পালন দূরে থাক দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন যোগাড় করা মানুষের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থার পরিণতি গিয়ে দাঁড়ায় '৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে। এ দুর্ভিক্ষে প্রায় ১০ লাখ বনি আদম প্রাণ হারায়। এ দুর্ভিক্ষ ছিল সম্পুর্ণভাবে আওয়ামী লীগ সৃষ্ট।

বাংলাদেশ হওয়ার পর প্রচুর পরিমাণে বিদেশী সাহায্য এসেছিল। নতুন দেশের পুনর্গঠনের জন্য দাতা সংস্থা ও ধনী দেশগুলো বিপুল পরিমাণ অর্থ ও খাদ্য সাহায্য দিয়েছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীরা বাংলাদেশ হওয়ার পর শুধু পাকিস্তানপন্থীদের অর্থ ও সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়নি, জনগণকে দেয়া এই বিপুল সাহায্যও সম্পূর্ণরূপে লোপাট করে নিয়েছিল। যার ফলে জাতীয় অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে। চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ ছিল এর স্বাভাবিক পরিণতি।

অথচ পাকিস্তান আমলে কি নির্জলা মিথ্যাই না বলা হত পূর্ব পাকিস্তানের পাটের টাকায় পশ্চিম পাকিস্তানকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করা হচ্ছে। এখানকার কাগজ নিয়ে সীল মেরে এখানে পুনরায় চড়া দামে বিক্রি করা হচ্ছে। এসব তো এখন বন্ধ হয়েছে। পাঞ্জাবীরাও আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের পাটকলগুলো এখন বছরে কোটি কোটি টাকা লোকসান দেয়। কেন এশিয়ার বৃহত্তম আদমজী জুট মিলই বা বন্ধ করতে হল কেন?

কাগজে এক সময় পূর্ব পাকিস্তান ছিল সারপ্লাস। কর্ণফুলী কাগজ কল এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ কাগজের কারখানা। এটা এখন সরকারের জন্য এক শ্বেত- হস্তী। এক সময়ের লাভজনক প্রতিষ্ঠানটি সমাজতন্ত্রের দোহাই দিয়ে জাতীয়করণের ফল দিতে শুরু করেছে। কাগজ কলের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। ইন্ডিয়া বাংলাদেশের কাগজের বাজার দখল করে নিয়েছে।

এরকম উদাহরণ দেয়া যেতে পারে ভুরি ভুরি। বাংলাদেশের বাজার আজ ইন্ডিয়ার ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের দখলে। দেশীয় শিল্প- কারখানা শেষ হওয়ার পথে। যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে গলাবাজি করেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার নামে জান কোরবান করে দেন, তারা কিন্তু এসব নিয়ে মোটেও উৎকন্ঠিত নন।

আসলে এসব তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধারা কখনই বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায়নি। তারা চেয়েছিল ভারতীয় অধিপত্য। পাকিস্তানকে ভাঙ্গার জন্য তারা স্বাধীনতার দোহাই পেড়েছিল মাত্র।

ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দী হচ্ছে মুসলমানদের জন্য এক ক্রান্তিকাল। ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মুসলমান দেশগুলোতে হ্রাস পেলেও ইসলামের দুশমনদের চক্রান্ত থেমে থাকেনি। এ শতাব্দীর প্রথম দিকে আমরা দেখেছি পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টান দেশগুলোর সম্মিলিত চক্রান্তে মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক তুর্কী খেলাফতও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। এটা

অবশ্য সত্য, মুসলমান নেতৃত্বের বহুমাত্রিক দুর্বলতা পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টান চক্রকে উৎসাহিত করেছে।

তথাকথিত স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে কিছু স্থানীয় তল্পীবাহক ও বরকন্দাজ সৃষ্টি করে পুরো মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে বিভিন্ন নামে স্বাধীন রাজ্য সৃষ্টি করে তুর্কী খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উসকে দেয়া হয়।

এসবের ফলশ্রুতি হল মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন নামে স্বাধীন অনুঘটক হিসেবে কাজ করছিল বিখ্যাত লরেন্স অফ অ্যারাবিয়া। এসব দুর্বলতার সুযোগে পাশ্চাত্য শক্তিগুলো জন্ম দেয় অবৈধ ইহুদী রাষ্ট্রের।

ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ফসল ছিল পাকিস্তান। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদ ও হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ জোটবদ্ধভাবে চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানদের ইস্পাত কঠিন ঐক্যের কারণেই ইঙ্গ- হিন্দু চক্রান্ত সফল হতে পারেনি। তারা জানত মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ উসকে দিয়েই তাদের উদ্দেশ্য কেবল সফল করা সম্ভব। ১৯৭১ সালে সেই ঘটনাই ঘটেছিল। শেখ মুজিব ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর ক্ষমতার লড়াইকে শত্রুরা কাজে লাগিয়েছিল পাকিস্তানকে ভাঙ্গার মোক্ষম সুযোগ হিসেবে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান। এই চেতনাই বাংলাদেশকে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলে, এ ভূ- খন্ড কখনই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হত না এবং পরবর্তীতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকতে পারত না। একমাত্র ইসলামই এদেশের স্বতন্ত্র মর্যাদা নিশ্চিত করেছে। আমাদের সবার এখন পবিত্র দায়িত্ব ভারতীয় আধিপত্যবাদের হিংস্র থাবা থেকে বাংলাদেশকে হেফাজত করা।

সমাপ্ত